গদ্য-শিল্পী রবীন্দ্রনাথ

সুখরঞ্জন মুখোপাধ্যায়

গদ্য-শিল্পী রবীন্দ্রনাথ

সুখরঞ্জন মুখোপাধ্যায়

BIRCHANDRA PUBLIC LIBRARY
35750
Dt. 16.9.62

সুপ্রকাশ প্রাইভেট লিমিটেড
কলকাতা ১২

প্রথম প্রকাশ :
২৫ বৈশাখ ১৩৬৬

বর্ণলিপি : ধ্রুব রায়

প্রকাশক : কৃষ্ণলাল ঘোষ
সুপ্রকাশ প্রাইভেট লিমিটেড
৯ রায়বাগান স্ট্রীট
কলিকাতা-৬

মুদ্রক : কালীপদ নাথ
নাথ ব্রাদার্স প্রিন্টিং ওয়ার্কস
৬ চালতাবাগান লেন
কলিকাতা-৬

প্রচ্ছদ মুদ্রণ : রয়াল হাফটোন

বাঁধাই : নিউ ইণ্ডিয়া বাইণ্ডার্স

দাম সাড়ে চার টাকা

শিক্ষাগুরু

ডক্টর শ্রীযুক্ত শশিভূষণ দাশগুপ্ত

শ্রদ্ধাস্পদেষু

রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধসাহিত্যের ওপর একটি সংক্ষিপ্ত অথচ বিজ্ঞানানুগ আলোচনা-গ্রন্থের প্রয়োজন ছিল। সেই প্রয়োজন মেটানো এই গ্রন্থের উদ্দেশ্য। গ্রন্থটি বি-এ অনর্স এবং এম-এ'র ছাত্রছাত্রীদের বিশেষরূপে কাজে লাগবে। অধিকন্তু এ-রকম একটি ছোট বই থেকে পাঠক সাধারণ অল্প আয়াসে রবীন্দ্র-প্রবন্ধগুলির সঙ্গে আরও ঘনিষ্ঠ হতে পারবেন লেখকের এই ধারণা।

বন্ধুবর শ্রীলালমোহন মুখোপাধ্যায়ের উদ্যোগ, সুমিত্র শ্রীপরমেশ মজুমদার-এর নিরন্তর মনোযোগ, আর ছাত্রী কল্যাণীয়া শ্রীমতী অণিমা নাগ (রায়চৌধুরী)-এর রুচির বর্ণমালায় পাণ্ডুলিপির অনুলিখন গ্রন্থটি প্রকাশে আমাকে খুবই সাহায্য করেছে। এদের সঙ্গে আমার সম্পর্কের মধ্যে কৃতজ্ঞতা স্বীকারের অবকাশ নেই।

হাওড়া গার্লস্ কলেজের উপাধ্যক্ষ সুপণ্ডিত শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্র চক্রবর্তীর সঙ্গে আলোচনা করে গ্রন্থের দু'একটি প্রসঙ্গে উপকৃত হয়েছি। আমার অন্যতম পূজনীয় শিক্ষক কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডক্টর শ্রীযুক্ত রথীন্দ্রনাথ রায়-এর প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ দান এ-গ্রন্থের সর্বত্র ছড়ানো রয়েছে। আর একজন ভক্তিভাজন শিক্ষাগুরু কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডক্টর শ্রীযুক্ত অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়-এর স্নেহ এ-গ্রন্থরচনায় আমাকে সাহসী করেছে। সবশেষে উল্লেখ্য, যে-দুজন এ-গ্রন্থ হাতে পেয়ে এর হাজার ত্রুটি সত্ত্বেও সর্বাধিক খুশি হবেন, সেই আমার পিতৃদেব ও মাতৃদেবীর অনুক্ষণ প্রেরণা। এঁদের সকলকে এই সুযোগে প্রণাম করি।

প্রুফ্-দেখার অপটুতা হেতু কিছু বর্ণাশুদ্ধি থেকে গেছে। এজন্য মার্জনা চাইছি।

রবীন্দ্র-জয়ন্তী,
হাওড়া গার্লস্ কলেজ

গ্রন্থকার

সূচীপত্র

প্রথম উদ্যোগ

॥ নান্দীমুখ ॥

শিল্পের সংজ্ঞা ও প্রকার ১ ॥ গদ্যের সংজ্ঞা ও শিল্পত্ব ৪ ॥ বাংলা গদ্যসাহিত্যের ত্রয়ী ৭ ॥ রবীন্দ্রনাথের গদ্য রচনা ১২ ॥

দ্বিতীয় উদ্যোগ

॥ প্রবন্ধ-শিল্পী রবীন্দ্রনাথ ॥

প্রবন্ধের সংজ্ঞা ও প্রকার ১৬ ॥ রবীন্দ্র-প্রতিভার বাহন : প্রবন্ধ ১৮ ॥ রবীন্দ্র-প্রবন্ধের শ্রেণী ২১ ॥ 'কালান্তর' গ্রন্থের প্রবন্ধগুলির আলোচনা ২২-৩৪ ॥ রবীন্দ্রনাথের রাষ্ট্রাদর্শ ৩৪ ॥ শিক্ষাদর্শ ৪১ ॥ ধর্মাদর্শ ৪২ ॥

তৃতীয় উদ্যোগ

॥ সমালোচনা-শিল্পী রবীন্দ্রনাথ ॥

সমালোচনার সংজ্ঞা ৪৫ ॥ 'প্রাচীন সাহিত্যে'র প্রবন্ধগুলির আলোচনা ৪৭-৫৬ ॥ 'আধুনিক সাহিত্যে'র প্রবন্ধগুলির আলোচনা ৫৭-৬৪ ॥ রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য-তত্ত্বের মর্মবাণী ৬৫ ॥ রবীন্দ্র-প্রবন্ধ ও সমালোচনার ত্রুটি ৬৭ ॥

চতুর্থ উদ্যোগ

॥ রচনা-শিল্পী রবীন্দ্রনাথ ॥

রচনার সংজ্ঞা ও প্রকার ৭২ ॥ রবীন্দ্ররচনার শ্রেণী ৭৪ ॥ ছিন্নপত্র ৭৫ ॥ বিচিত্র প্রবন্ধ ৯৩ ॥ পথের সঞ্চয় ১১১ ॥ জীবনস্মৃতি ১২৮ ॥

পঞ্চম উদ্যোগ

॥ গদ্য-শিল্পী রবীন্দ্রনাথ

শৈলীর সংজ্ঞা ১৪২ ॥ শৈলী ও প্রকরণ ১৪৪ ॥ শৈলী ও শিল্পী ১৪৫ ॥ গদ্যের প্রকার ও শৈলী ১৪৬ ॥ গদ্যছন্দ ১৪৮ ॥ রবীন্দ্রনাথের গদ্যরচনার ছন্দ ও শৈলী : বিচিত্র প্রবন্ধ ১৫০ ॥ লিপিকা ১৫৩ ॥ প্রাচীন সাহিত্য ১৫৫ ॥ পঞ্চভূত ১৫৭ ॥ ফলশ্রুতি ১৬১ ॥

প্রথম উদ্যোগ

নান্দীমুখ

শিল্প-রচনার উৎস হয় হৃদয়, নয় মস্তিষ্ক। হৃদয় দিয়ে করি অনুভব, মস্তিষ্ক দিয়ে করি উপলব্ধি। হৃদয়ে থাকে অন্তর্দৃষ্টি, মেধায় থাকে স্মৃতিশক্তি; হৃদয় থেকে আসে কল্পনা, মেধা থেকে আসে বোধি। যাবতীয় রচনার মূলে রয়েছে স্মৃতি, বেদনা, অন্তর্দৃষ্টি, কল্পনা ও বোধি। এই অ-বস্তুজাত উপকরণগুলিকে দুটি মূল শ্রেণীতে পৃথক করে রচনাসমূহেরও দ্বিবিধ শ্রেণীনির্ণয় করা চলে: (ক) হৃদয়গত রচনা এবং (খ) মেধাগত রচনা; নামান্তরে ভাবাশ্রয়ী এবং চিন্তাশ্রয়ী রচনা। যে-রচনায় স্রষ্টার আত্মগত হৃদয়ানুভূতি, কল্পনা, স্বপ্ন, আদর্শ, স্মৃতি ও বেদনা প্রাধান্য পায় তাকে ভাবাশ্রয়ী এবং যে-রচনায় বস্তু-নির্ভর মেধা, বুদ্ধি, চিন্তা ও নিরাবেগ সংহত যুক্তিশৃঙ্খলা প্রকাশ পায় তাকে চিন্তাশ্রয়ী রচনা বলা যেতে পারে। ভাবাশ্রয়ী রচনা সুর ও ছন্দধর্মী এবং চিন্তাশ্রয়ী রচনা রূপ ও ভরধর্মী।

হৃদয় বা মেধা যেখান থেকেই উৎসারিত হোক, সে-উৎসারের একটি আধার এবং একটি মাধ্যম অবশ্যই চাই। আত্মা যেমন দেহের আশ্রয়, অনুভূতি যেমন প্রাণ ব্যতীত অস্তিত্বহীন, তেমনি রচনাও কোনো-না-কোনো বস্তু-দেহ আশ্রয় করবেই। ধ্বনির প্রতীক বা মাধ্যম যেমন বর্ণ, তেমনি রচনার মাধ্যম বা প্রতীক হয় ছবি, নয় গান। বস্তুত মানবহৃদয়ের বাসনালোক-উৎসারিত সমুদয় আবেগ, ভাব, স্বপ্ন, ধ্যান, জ্ঞান ও কল্পনা হয় সুরছন্দ, নয় রূপসঙ্গের মধ্য দিয়েই প্রকাশিত হয়। কোনো-কোনো জীবাণু যেমন তাদের সীমাহীন ক্ষুদ্রতার জন্য বিশেষ শক্তিসম্পন্ন অনুবীক্ষণ-যন্ত্রের চোখেও ধরা পড়ে না, তেমনি মানব-হৃদয়ে এমন সব নিরতিশয় সূক্ষ্ম অনুভূতি আছে যা কোনো মতেই কোনো সূক্ষ্মতম রূপের আধারেও ব্যক্ত হতে পারে না

—হলেই তার সৌন্দর্যহানি হয়। কারণ বাণী, রেখা বা মূর্তি, মানুষের সৃষ্ট এই তিনটি রচনাধারের মধ্যে যে-কোনোটি যত সূক্ষ্মভাবে গ্রহণ করা যাক না কেন, রূপ-নির্মিতির প্রেরণা-প্রয়াস থাকায় স্থূলত্ব একেবারে পরিহার করা যায় না। আর রূপের ক্ষুদ্রতম স্থূলতার চেয়েও সূক্ষ্মতর অনুভূতি উদ্ভূত হয় মানবহৃদয়ে। এই সূক্ষ্মতম, অ-ধরা অনুভূতি-সমূহের রচনার মাধ্যম হোল সঙ্গীত।

রচনার দ্বিতীয় মাধ্যম ছবি। মানবহৃদয় ও মেধার রূপগ্রাহ্য অনুভূতিগুলি তিনটি মাধ্যমে অভিব্যক্ত হতে পারে। অর্থাৎ রূপ বা ছবি তিন প্রকারের হতে পারে—বাণীচিত্র, রেখাচিত্র ও মূর্তিচিত্র। কথা অথবা সুস্পষ্ট অর্থবহ ধ্বনিসমূহের মাধ্যমে যা রচিত হয় তা বাণীচিত্র; রঙ্, তুলি ও পটের মাধ্যমে যে রচনা তা রেখাচিত্র; এবং মাটি-পাথর-প্লাস্টারের মাধ্যমে রচনা মূর্তিচিত্র। নামান্তরে এগুলিই হোল যথাক্রমে সাহিত্য, চিত্রকলা ও ভাস্কর্য। ব্যাপক অর্থে সাহিত্য, ভাস্কর্য প্রভৃতি সৃষ্টি বা রচনামাত্রেই শিল্প। তবে সচরাচর চিত্র ও ভাস্কর্যকে শিল্প বলা হয়। কিন্তু চিত্র ও ভাস্কর্যকে চারুশিল্প (Fine Arts) বলাই সঙ্গত। আধুনিককালে সৌন্দর্যরুচির পরিচায়ক যে-কোনো সুশৃঙ্খল প্রসাধনকলা-সৃষ্টিকেই শিল্প বলা হচ্ছে। সীবন থেকে গৃহসজ্জার প্রয়োজনীয় অথচ কিছুটা শৌখীন উপকরণ পর্যন্ত শিল্পের মর্যাদা পাচ্ছে। দৈনন্দিন জীবনযাপনের সামগ্রীর এই শিল্পায়নকে বলা যেতে পারে কারুশিল্প। যাই হোক, সঙ্কীর্ণ অর্থে রচনা দ্বিবিধ—সাহিত্য ও শিল্প।

বাণীচিত্রই সাহিত্য। সাহিত্যে বাণী এবং চিত্র দুই-ই থাকে। রঙ-তুলি-পট অথবা মাটি-পাথর-প্লাস্টারের বদলে ধ্বনি-বর্ণ এখানে করে চিত্র রচনা। সাহিত্যশিল্প রূপাশ্রয়ী সৌন্দর্য তো বটেই, রূপাতীত ও ইন্দ্রিয়াতীত জীবনভাব ও ভাবনার অভিব্যক্তিও দিয়ে থাকে। রূপাতীতের তথা অমূর্ত ও অমর্ত্যের এই অসীম ব্যঞ্জনাগুণেই সাহিত্যিক বা কবি প্রাচীন ভারতে দ্বিতীয় ব্রহ্মার তুল্য সমাদর লাভ করেছেন।

সাহিত্যের সংজ্ঞা বহু। কিন্তু বহুলতা সত্ত্বেও সাহিত্যের একটি অন্য-নিরপেক্ষ সংজ্ঞা সর্ববাদীসম্মতভাবেই লভ্য এবং সেটি 'সাহিত্য' শব্দটির ব্যুৎপত্তিগত অর্থেই অন্তর্নিহিত। 'সহিত'-এর বিশেষ্যপদ সাহিত্য। যে-বাণীরূপ সঙ্গ দান করে, সাহিত্য বলে তাকেই। সহিত-ত্ব বা সঙ্গ-ত্বই সাহিত্যের ধর্ম। অর্থাৎ সাহিত্যের ধর্ম মিলন। ভাবের সঙ্গে ভাষার, রূপের সঙ্গে সুরের, ব্যক্তির সঙ্গে ব্যক্তির, ব্যক্তির সঙ্গে সমাজ ও রাষ্ট্রের, ব্যক্তির সঙ্গে বিশ্বের, দেশের সঙ্গে দেশান্তরের, কালের সঙ্গে কালান্তরের, অতীতের সঙ্গে বর্তমানের, বর্তমানের সঙ্গে ভবিষ্যতের, অন্তরের সহিত বাহিরের, বিশ্বপ্রকৃতির সহিত বিশ্বজীবনের এবং সর্বোপরি রবীন্দ্রনাথের ভাষায় 'সীমার সহিত অসীমের মিলন' সাধনার যে-ধ্বনিময়, রসময়, আনন্দময় বাণীরূপ —সাহিত্য বলে তাকেই। বস্তুত তাকেই বলে সাহিত্য, যা খণ্ডকে সমগ্রতা ও সামান্যকে অসামান্যতা দান করে, যা ব্যক্তিগতকে সর্বগত, অপ্রত্যক্ষকে প্রত্যক্ষ, অমূর্ত ও অমর্ত্যকে মূর্ত করে তোলে এবং সর্বোপরি যা মানবমনের সুকুমার বৃত্তিগুলির উৎকর্ষ সাধন দ্বারা মানবতার মহনীয়তা আস্বাদন করায়।

সাহিত্যের শ্রেণী তিনটি। মানুষ যেমন মনুষ্যত্বের সাধারণ ধর্মে অভেদ্য, অথচ বাস্তব জীবনে কর্ম-বিভাগ অনুযায়ী জীবিকাভেদে বিভিন্ন, সাহিত্যও তেমনি সৃষ্টির উৎস ও ফলের স্বতন্ত্রতা অনুযায়ী বিভক্ত হতে পারে। সাহিত্যের উপাদান তিনটি—ভাব, রূপ আর চিন্তা। ভাবের উৎস বাসনালোক, রূপের উৎস বহিরিন্দ্রিয়গুলি আর চিন্তার উৎস মেধা বা মনীষা। প্রথম দুটি মানুষ উত্তরাধিকার-সূত্রে জন্মলগ্নেই নিয়ে আসে এবং অনুকূল আবহাওয়ার দ্বারা উৎকর্ষ প্রাপ্ত হয়ে আসাধারণ প্রবণতা অর্জন করলেই তা হয়ে ওঠে প্রতিভা। আর শেষোক্তটি ততটা অন্তর্নিহিত বা উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত নয় যতটা জ্ঞানবিজ্ঞান বা বেদ-অনুশীলনের ফল। বেদানুশীলনের ফলে অর্জিত বিদ্যাবত্তা ও পারদর্শিতাকে বলা যেতে পারে মনীষা আর উত্তরাধিকারসূত্রে মানবমনের স্বতঃনিহিত সুকুমার বৃত্তিগুলি ও

বাসনালোকের অনুভূতিসমূহ অনুকূল পরিবেশে পুষ্ট হয়ে যে-বিস্ময়কর সৃষ্টিশীলতা প্রদর্শন করে—সাধারণে বিমুগ্ধ হয়ে যাকে বলে অলৌকিক ও দিব্য—তারই সংজ্ঞা প্রতিভা। আর প্রতিভার সঙ্গে মনীষা যুক্ত হয়ে বিশ্বজীবন ও বিশ্বজগৎব্যাপী যে-ঋষিকল্প অন্তর্দৃষ্টি সৃষ্টি করে তারই নাম প্রজ্ঞা। অনুভূতি, অন্তর্দৃষ্টি ও উপলব্ধির মিশ্রণে ব্রহ্ম-রহস্যভেদী, দিব্যজ্ঞানী, প্রজ্ঞাবান সৃজনী-প্রতিভাই বিশ্বে ব্রহ্মার সমমর্যাদাসম্পন্ন মহাকবি নামে অভিহিত হন। মানব সভ্যতার হাজার ছয়-সাত বছরের মধ্যে এ-পর্যন্ত এ নামে অভিহিত হয়েছেন পাঁচ-সাতজন মহামানব—ব্যাস, বাল্মীকি, হোমর, শেক্সপীয়র, কালিদাস, গ্যয়টে, রবীন্দ্রনাথ।

মহাকবিগণের সৃষ্টি একাধারে ভাব, রূপ এবং চিন্তার সম্মিলিত রচনা। কিন্তু বেশীরভাগ ক্ষেত্রে এই তিন শ্রেণীর রচনাকে পৃথক-ভাবেই পাওয়া যায়। প্রধানত হৃদয়ানুভূতি, স্বপ্ন-কল্পনা ও আত্মগত ভাব-ভাবনামূলক রচনা ভাবাশ্রয়ী; কাহিনী-পরিবেশ-বর্ণনামূলক ও চরিত্র-চিত্রণমূলক রচনা রূপাশ্রয়ী; এবং তথ্য ও তত্ত্ব পরিবেশন বা আলোচনামূলক রচনা চিন্তাশ্রয়ী। নামান্তরে গীতিকবিতা ও খণ্ড-কবিতা প্রথমশ্রেণী, নাটক-উপন্যাস ও মহাকাব্য দ্বিতীয়শ্রেণী এবং প্রবন্ধ, রচনাশিল্প ও সমালোচনা শেষোক্তশ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত।

প্রথম শ্রেণীর ভাষা-মাধ্যম সর্বদাই পদ্য; দ্বিতীয়শ্রেণীর ভাষা গদ্য বা পদ্য দুই-ই হতে পারে। মধ্যযুগ পর্যন্ত পদ্যই ব্যবহৃত হয়েছে, আধুনিক কালে রূপাশ্রয়ী বা চরিত্র ও কাহিনীমূলক শিল্পের মধ্যে চিন্তাশীলতার প্রাধান্য আসায় পদ্য সম্পূর্ণ বর্জিত হয়ে গদ্য-ই একমাত্র মাধ্যম হয়েছে। শেষোক্তশ্রেণী উদ্ভবের সময় থেকেই একমাত্র গদ্য ভাষাকেই আশ্রয় করেছে।

গদ্যের সংজ্ঞা

'গদ' অর্থে 'বলা' ও 'গদ্য' অর্থে 'বক্তব্য'। সম্মিতিহীন-রচনায় সাধারণত বক্তব্য অর্থেরই প্রাধান্য থাকে, ধ্বনি-প্রাধান্য থাকে না;

সেই জন্যেই এর নামকরণ গদ্য। 'পদ' শব্দের প্রাচীন অর্থ পর্ব ও 'পদ্য' অর্থে 'পদ-যুক্ত'। সম্মিতি-যুক্ত রচনায় নির্দিষ্ট দৈর্ঘ্যের পদের বা পর্বের প্রাধান্য থাকে বলে এর নাম 'পদ্য'। (১)

বিশ্বের সব ভাষাতেই গদ্য-সাহিত্যের উদ্ভব পদ্য-সাহিত্যের কয়েক-শত বছর পরে হয়েছে। বাংলা গদ্যের উদ্ভব হোল তো এই সেদিন —মিশনারীদের আমলে—শ'দেড়েক বছর আগে। এর আগে পর্যন্ত সাহিত্য বলতে বোঝাত পদ্য। গদ্য ছিল মুখের কথা। অর্থাৎ গদ্য বলতে বোঝাত কথ্য ভাষা এবং প্রাত্যহিক কর্ম সম্পাদন ছাড়া তার অন্য দায় ছিল না।

গদ্য ও পদ্যের প্রাচীন প্রভেদ ছিল ব্যবহারিক, কথ্য ও লেখ্যরূপে। কিন্তু আসল প্রভেদ প্রাকরণিক। গদ্যে পদ-সম্মিতি থাকে না, পদ্যে থাকে। একাধিক পর্বের সমন্বয়ে গঠিত একটি ভাববাহী পূর্ণ ধ্বনিপ্রবাহের (পংক্তির) দীর্ঘযতি চিহ্নিত অর্থসমন্বিত খণ্ডাংশের নাম পদ। পদ্যে পূর্ণ ধ্বনিপ্রবাহগুলি অর্থাৎ পংক্তিগুলির অন্তর্গত পদসংখ্যা অর্থাৎ পদ-দৈর্ঘ্য সমান হয়। পংক্তির অন্তর্গত চরণগুলির পর্ববিন্যাসে মাত্রাসম্মিতি বা প্রতি চরণে যতি ও ছেদ নিয়ন্ত্রিত সুশৃঙ্খল সমান সংখ্যক মাত্রা থাকে। সাধারণ গদ্যে পর্ব, পদ, মাত্রা ও চরণ-দৈর্ঘ্যের কোন নিয়ন্ত্রিত সমতা থাকে না, তাই ধ্বনিপ্রবাহেও সাধারণত তেমন কোন তরঙ্গ বা সুর ও ছন্দ, তাল ও লয় থাকে না। গদ্য আটপৌরে, পদ্য পোশাকী। সাধারণভাবে গদ্য ধর্ম-কর্মের আর পদ্য নর্ম-মর্মের প্রকাশমাধ্যম।

সাহিত্যের বাহন গদ্য

সাহিত্যের বাহন হিসাবে গদ্যের প্রতিষ্ঠা পদ্যের তুলনায় সাম্প্রতিক। ইংলণ্ডে আলফ্রেডের সময় (দশ শতক) থেকে লাতিন অনুবাদ আর বৃত্তান্ত (Chronicles) রচনার মাধ্যমে গদ্য লৈখিক মর্যাদালাভ করে। কিন্তু মৌলিক সাহিত্যের ভাষা হিসাবে গদ্যের

(১) ডক্টর তারাপদ ভট্টাচার্য : ছন্দোবিজ্ঞান পৃঃ ১৪৩

প্রতিষ্ঠা ফ্রান্সিস বেকনের (১৫৬১-১৬২৬) আগে হয়নি। ষোড়শ-সপ্তদশ শতকই ইংরাজী গদ্য-সাহিত্যের পরিপূর্ণ স্বাধিকারের যুগ। লাতিন-অনুবাদ, ইতিহাস ও বৃত্তান্তসমূহ বাদ দিয়ে সাহিত্যগুণান্বিত মৌল গদ্য রিচার্ড হাকাল্যুইট (১৫৫৩-১৬১৬), রবার্ট বার্টন (১৫৭৭-১৬৪০) এবং বেকনের হাতে স্বতন্ত্র মর্যাদায় প্রতিষ্ঠা পায়।

বাংলায় চিঠিপত্র, দলিলদস্তাবেজ এবং ছদ্ম-পদ্য বৈষ্ণবী-কড়চাগুলি বাদ দিলে গদ্যের লিখিত নিদর্শন প্রথম পাওয়া গেল আঠারশতকের মাঝামাঝি সময় থেকে। দোমআন্তনিও-মাণুএলদ্য-হ্যালহেড-কেরীর পরিচর্যায় বাংলা গদ্য কেবল মৌখিক থেকে লৈখিক রূপলাভ করেছিল। উনিশ শতকের প্রথম দুই দশক পর্যন্ত বাংলা গদ্যের পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলছিল। কেরীর মুন্সী মৃত্যুঞ্জয় ও রাম বসু এবং রামমোহন ও ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় সাহিত্যের মাধ্যমরূপে গদ্যের ব্যবহার পরীক্ষা করে কৃতকার্য হচ্ছিলেন। কিন্তু তাঁদের কৃতকার্যতা পরীক্ষার সার্থকতায় সীমাবদ্ধ, যথার্থত তাঁদের হাতে বাংলা গদ্য সাহিত্য-শিল্প হয়ে ওঠার সময় পায়নি। তৃতীয় দশকের মাঝামাঝি সময়ে সাহিত্যের বাহন হওয়ার যোগ্যতা বাংলা গদ্য অর্জন করল।

গদ্যের শিল্পত্ব

গদ্যের সাহিত্যের বাহন হওয়ার অর্থ একটি শিল্পের মাধ্যম হওয়া। সৌন্দর্যরুচির উদ্বোধক আনন্দদায়ক রস-সৃষ্টির নাম শিল্প। ভাষা বা বাক্ সাহিত্য-শিল্পের রূপদেহ। সাহিত্যের শিল্পত্ব রূপশৈলী এবং ভাব-শৈলী উভয়ত। অলঙ্কার এবং ব্যঞ্জনা দুই মিলিয়ে এই শিল্পত্ব। অতএব গদ্যের শিল্পত্ব বলতে গদ্য-ভাষার এবং বিষয়ের প্রসাধন এবং সাধনবেগ, দুইএর সমন্বয়ই বুঝতে হবে। পদ-সম্মিতি ছাড়াই গদ্য-শিল্পী ভাষায় ধ্বনি ও ছন্দস্পন্দ সৃষ্টি করেন এবং কবিতার মতোই গদ্যেও নিগূঢ় ভাব ও ব্যঞ্জনা এবং সুষম অনুভূতির অনুরণন তোলেন।

গদ্যছন্দ, অলঙ্কার, ভাবব্যঞ্জনা, অনুভূতির অনুরণন, শব্দের ইঙ্গিত-ধর্মিতা, রূপশৈলীর রমণীয়তা,—রস ও সৌন্দর্যসৃষ্টির এই সাধারণ বিষয়গুলিতেই কবিতার মতো গদ্যেরও শিল্পত্ব। কিন্তু যেহেতু গদ্য ও কবিতা রচনায় ভাবপ্রেরণা ও ফলশ্রুতি স্বতন্ত্র, এবং বক্তব্য বলাটাই গদ্যের প্রধান লক্ষ্য, তাই নিরলঙ্কার সুস্পষ্টতা গদ্যের গুণ হিসাবে গণ্য। প্রসাধন-সুন্দর না হলে গদ্যের শিল্পত্ব ক্ষুণ্ণ হয় না। গদ্য পৌরুষেয়, কবিতা রমণীয়। লাবণ্যের সঙ্গে ঋজুতার সমন্বয়েই শিল্পত্ব। গদ্যের শব্দ ও পদগুলি কাটাছাঁটা, স্পষ্ট, অভিধার্থপ্রধান এবং দ্ব্যর্থকতাহীন হয়ে থাকে। কিন্তু এজন্য তার শিল্প-স্বভাবে দৈন্য ঘটে না। গদ্যের ফ্যাশন নেই, স্টাইল আছে। ফ্যাশনের সৌন্দর্য বা শিল্পত্ব বাহ্য, প্রকট এবং মোহজ; স্টাইলের সৌন্দর্য চারিত্রিক, ও অন্তর্নিহিত। গদ্যের শিল্পত্ব তাই ততটা প্রসাধনবিলাসে বা খেয়ালী-কল্পনায় নয়, যতটা ব্যক্তিত্বের ঐশ্বর্যে,—স্টাইলের অনন্যতায়।

বাংলা গদ্য-সাহিত্যের ত্রয়ী

বাংলায় গদ্য তথা প্রবন্ধ ও রচনা সাহিত্যের উদ্ভব উনিশ শতকের তৃতীয় দশক থেকে। পাশ্চাত্ত্য শিক্ষা ও সংস্কৃতির অভিঘাতে বাংলার জনজীবনে যে আলোড়ন ও আন্দোলন, আত্মবিকাশের অসীম সম্ভাবনায় আশা-আনন্দে উল্লসিত-উদ্দীপিত যে নবজাগৃতি, তারই ফলশ্রুতি আধুনিক বাংলা সাহিত্য। এবং বাংলা সাহিত্যের সেই আধুনিকতার প্রধানতম লক্ষণ যুক্তি-বুদ্ধিধর্মী মানবতন্ত্রের প্রতি ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবান নব্যপন্থীদের অসীম প্রত্যয় ও শ্রদ্ধা। য়ুরোপের রেনেশাঁসের দিনগুলির মতো বাংলায়ও উনিশ শতক যুক্তিবাদের যুগ। দৈব, ঐশী ও অতিপ্রাকৃতের রহস্যে অশ্রদ্ধা ও অবিশ্বাস এবং মানবজীবনের অপরিমেয় শক্তি ও মহিমায় বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা মানুষকে সেদিন জীবন ও সাহিত্য-জিজ্ঞাসার অভেদ্য রহস্যগুলির সন্ধান-সমাধানে ভক্তি ও সংস্কারের বদলে বিজ্ঞানবুদ্ধি প্রয়োগ করতে শিখিয়েছে। নূতন-পাওয়া এই বিজ্ঞানবুদ্ধি ও যুক্তিবোধের মানদণ্ডে

সেদিনের বাঙ্গালী মনীষীগণ ভারতীয় ধর্ম-ন্যায়-নীতিশাস্ত্র ও শিল্প সংস্কৃতির পুনর্বিচার ও নূতনভাবে মূল্যনিরূপণ করতে চেয়েছেন। তারই ফলে রামমোহন রায়, বিদ্যাসাগর, অক্ষয়কুমার দত্ত এবং মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কলম থেকে বেদ-উপনিষদ, পুরাণ-সংহিতা এবং প্রকৃতি-বিজ্ঞানের আলোচনামূলক অপূর্ব বাংলা প্রবন্ধ সমূহের সৃষ্টি হোল। এবং বলা বাহুল্য এই নবজাগৃতি-যুগের আত্মার বাণীরূপ হোল গদ্য।

বাংলা প্রবন্ধের উত্তরাধিকার এসেছে বৈষ্ণব জীবন-চরিত-কাব্যের উৎস থেকে। বিশেষত কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীর 'চৈতন্য চরিতামৃতে'র অনেকটাই পদ্যবন্ধ প্রবন্ধ। রাধা-কৃষ্ণ তত্ত্বটি তিনি যেভাবে বিশ্লেষণ করেছেন তাতে তা উৎকৃষ্ট সাহিত্যগুণান্বিত দার্শনিক প্রবন্ধ হয়ে উঠেছে। সপ্তদশ শতকে বিভিন্ন বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের মধ্যে স্ব-স্ব ধর্মমতের শ্রেষ্ঠতা প্রতিপন্নকারী ও ব্যাখ্যামূলক যে-সকল কড়চা বা প্রশ্নোত্তরের ভঙ্গিতে যে ছোট-ছোট নিবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে, তাতেও প্রবন্ধের লক্ষণ আছে। এ-ছাড়া আগমবাগীশগণের দেহ-বিজ্ঞানাশ্রয়ী তন্ত্রকোষগুলিও প্রবন্ধধর্মী।

কিন্তু গদ্য ছাড়া তো প্রবন্ধ হয় না। পদ্য ভাবাবেগের, গদ্য চিন্তার ভাষা। আর বাংলা গদ্যের উদ্ভব ঊনিশ শতকের প্রথম দশকে। বাঙালীর মননশীলতা ও মনীষার উন্মেষও এই সময় থেকে। বাঙালী মনীষীর মননপ্রকর্ষই বাংলা গদ্য তথা প্রবন্ধের জন্ম দিয়েছে। আর রামমোহন রায় আধুনিক বাংলা তথা ভারতের প্রথম মনীষী—নবযুগের উদ্গাতা। রামমোহন রায় বাংলা গদ্যকে প্রথম ব্যক্তিত্ব-প্রভাবিত এবং স্বকীয় শৈলীসমন্বিত করেন। তাঁর লেখাগুলি অবশ্য রস-সাহিত্য নয়—হয় তা উপনিষদের অনুবাদ, নয় সতীদাহ প্রথার ন্যায় সমকালীন কোন সামাজিক ও ধর্মীয় সংস্কারান্দোলনের জন্য লিখিত বিতর্কমূলক সন্দর্ভ। রামমোহনের পুস্তিকাগুলি তাই বিতর্ক ও বক্তৃতাজাতীয়। বস্তুত তাঁর উপনিষদের আলোচনা ও ব্রাহ্মসমাজের সভায় ভাষণমূলক প্রবন্ধগুলিকে প্রস্তাব ও সন্দর্ভ নাম দেওয়া চলে

এগুলি যথার্থই সন্দর্ভ—এতে সাহিত্যরস ও শিল্পগুণ কিছুমাত্র নেই। কিন্তু প্রবন্ধের প্রকৃষ্ট বা উৎকৃষ্ট বন্ধন অর্থাৎ তথ্য বা তত্ত্বের ন্যায় ও যুক্তিশৃঙ্খলা ঋজু ও বলিষ্ঠ শব্দশক্তির মধ্য দিয়ে পরিস্ফুট হয়েছে। রামমোহনের পুরুষকার তাঁর সৃষ্ট বাংলা গদ্যেও প্রস্ফুট।

তবে রামমোহনের প্রবন্ধের মধ্যে সাহিত্য সমালোচনা ছিল না। রামমোহন আর যাই হোন, সাহিত্য-রসিক ছিলেন—এমন প্রমাণ নেই। বাংলা গদ্যের ইতিহাসই বাংলা প্রবন্ধের ইতিহাস। রামমোহনের হাতে ব্যক্তিত্ব-চিহ্নিত বাংলা গদ্যের উন্মেষের মধ্যেই তাই বাংলা প্রবন্ধের ভ্রূণ এবং সম্ভাবনা পরিদৃষ্ট হয়েছিল। বাংলা গদ্য ১৮১৮ খ্রীঃ থেকে ১৮৩৩খ্রীঃ পর্যন্ত রামমোহন-ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বাধীন এবং তাঁদের সম্পাদিত 'সমাচারচন্দ্রিকা-সমাচারদর্পণ' সাময়িক পত্রিকার আশ্রয়ে বিকাশ লাভ করেছিল। সাময়িক পত্রিকা আশ্রয় করেই আধুনিক বাংলা সাহিত্য বিকাশলাভ করেছে—বিশেষত এর গদ্য শাখাটি। বাংলা গদ্যের দ্বিতীয় পর্ব তথা বাল্যকাল ঈশ্বরগুপ্তের নেতৃত্বে তৎ-সম্পাদিত 'সংবাদ প্রভাকর' পত্রিকার মাধ্যমে শুরু হয় (১৮৩১ খ্রীঃ—১৮৪২ খ্রীঃ)। ঈশ্বরগুপ্তই প্রথম সাহিত্য-সমালোচনামূলক প্রবন্ধের সূত্রপাত করেন। 'প্রভাকরে'র পাতাতেই প্রথম বাংলার কবি ও কবিতার আলোচনা আত্মপ্রকাশ করে। মধ্যযুগের শেষ কবি ভারতচন্দ্রের (১৭১২খ্রীঃ—১৭৬০খ্রীঃ) কাব্যের স্তুতিমূলক সমালোচনা প্রকাশ করেন ঈশ্বরগুপ্ত। এবং পলাশী যুদ্ধোত্তর আঠারো-ঊনিশ শতকের সন্ধিকালে বাংলার সাহিত্যাকাশে পতঙ্গের ন্যায় উৎক্ষিপ্ত কবিওয়ালাগণের কবিজীবনী এবং তাদের লুপ্তপ্রায় কবিগানসমূহ বিস্মৃতির গর্ভলীনতা থেকে তিনি সন্ধান ও উদ্ধার করেন পরম উৎসাহে। এভাবে ঈশ্বরগুপ্ত একাধারে বাংলা-সাহিত্য-সমালোচনার যেমন সূত্রপাত করেন, তেমনি আমাদের ঐতিহ্যচেতনাও জাগ্রত করার প্রয়াস পান।

বাংলা গদ্যের তৃতীয় পর্ব বা কৈশোর শুরু হয় ১৮৪৩ খ্রীঃ থেকে। এই পর্বের নেতৃত্ব ছিল অক্ষয়কুমার দত্ত এবং বিদ্যাসাগর মহাশয়ের

হাতে। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর স্থাপিত ও পৃষ্ঠপোষিত 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা' ছিল তাঁদের আশ্রয়। 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা' বাংলা গদ্য তথা প্রবন্ধ সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ ধাত্রীত্বের গৌরব দাবি করতে পারে। বিজ্ঞান-বিষয়ে বাংলা প্রবন্ধ এই পত্রিকাতেই প্রকাশ করতে থাকেন অক্ষয় কুমার। বস্তুত মহর্ষির ব্রাহ্মধর্ম-বিষয়ক দার্শনিক প্রস্তাবাদি, দত্ত-মহাশয়ের বৈজ্ঞানিক সন্দর্ভ এবং তৎসহ বিদ্যাসাগরের প্রাঞ্জল সামাজিক ব্যঙ্গ ও বিতর্কমূলক রসাত্মক গদ্যরচনা তার প্রশস্ত বক্ষে ধারণ ক'রেই 'তত্ত্ববোধিনী' সগর্বে আত্মপ্রকাশ করত সেকালে। বাংলা সাহিত্যে দার্শনিক তত্ত্বালোচনামূলক সন্দর্ভ, সাংবাদিকসুলভ রাজনৈতিক প্রস্তাব এবং সাহিত্য-সমালোচনা, বৈজ্ঞানিক নিবন্ধ আর ব্যক্তিগত রস-রচনাজাতীয় প্রবন্ধের সূত্রপাত করেন যথাক্রমে রামমোহন রায়, ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত, অক্ষয়কুমার দত্ত এবং ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। ঊনিশ শতকের মধ্যভাগের মধ্যে 'প্রভাকর' ও 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'র আশ্রয়ে বাংলা গদ্য তার কৈশোর অতিক্রম করে যৌবনের সন্ধিক্ষণে এসে পৌঁছায়। আর এই সময়কার বাংলা গদ্যও প্রবন্ধের উপযুক্ত বাহন হয়ে উঠেছে। শব্দের যে ইস্পাত-কঠিন সুনির্দিষ্ট অর্থগুণ থাকলে তা প্রবন্ধের সংজ্ঞা সমূহের পারিভাষিক ভাববহনক্ষম হতে পারে, বাংলা ভাষা ইতিমধ্যে তখন সে-শক্তি অর্জন করেছে। বিদ্যাসাগর মহাশয় বাংলা ভাষার শ্বাস-যতি ও ভাব-গতির তাল-লয়-পরিমিতি, শব্দের ধ্বনি-ব্যঞ্জনা, স্থিতিস্থাপকতা এবং অভঙ্গুর কমনীয়তাগুণ আবিষ্কার করেছেন। কমনীয়তা ও দার্ঢ্যের সমন্বয়ে বাংলা গদ্য এই সময় সাহিত্য-শিল্পের উপযুক্ত বাহন হয়ে উঠেছে। এই সময়ের বাংলা প্রবন্ধ বর্তমান সময়েও আমাদের অনুকরণীয় এবং শ্লাঘ্য আদর্শ হওয়া সঙ্গত।

বাংলা প্রবন্ধ যৌবনে পদার্পন করল ঊনিশ শতকের সপ্তম দশকে—ঐ শতকের সর্বশ্রেষ্ঠ পুরুষ বঙ্কিম-মনীষার আশ্রয়ে। বঙ্কিমচন্দ্রের 'বঙ্গদর্শন' সাময়িকীর পাতায় সব্যসাচী বঙ্কিম তাঁর অপরিসীম বৈদগ্ধ্য ও মনীষা-সৃষ্ট প্রবন্ধমালা নিয়ে আবির্ভূত হলেন। এই আবির্ভাব

বাঙালীর জীবনে ঐ শতকের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সৌভাগ্য ও আশীর্ব্বাদ। বঙ্কিমের প্রতিভা উপন্যাসে, মনীষা প্রবন্ধে। এবং মনীষা ও প্রতিভার সমন্বয় ব্যক্তিগত রচনা সাহিত্য 'কমলাকান্তের দপ্তরে' পরিস্ফুট হয়েছে। উপন্যাস একখানাও না লিখে কেবল যদি তিনি 'কমলাকান্তের দপ্তর' এবং 'বিবিধপ্রবন্ধ' রেখে যেতেন তাহলেও তাঁকে "উনিশ শতকের সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তিত্ববান মনীষা" (ডক্টর রমেশ দত্ত) বলে মেনে নিতে বাধা থাকত না। প্রাবন্ধিক বঙ্কিম স্বতন্ত্র গ্রন্থে আলোচনা সাপেক্ষ। এখানে সে চেষ্টায় বিরত থাকা গেল। কেবল বলে রাখা দরকার যে বঙ্কিমচন্দ্র বাংলা গদ্য সাহিত্যের গুরুদেব। ঈশ্বর গুপ্ত কবিগান ও ভারতচন্দ্রের সাহিত্য-কৃতিকে উদ্ধার ও আলোচনা ক'রে সমালোচনা সাহিত্যের সূত্রপাত করেন এবং বিদ্যাসাগর মহাশয়ও এই ধারায় কিছুটা আত্মনিয়োগ করেছিলেন, বিশেষত ভারতীয় ক্লাসিক সাহিত্য সম্বন্ধে তাঁর আলোচনা রসগ্রাহী এবং বিচক্ষণ। কিন্তু এই সব সমালোচনা পরিমাণে সামান্য আর খুবই সাময়িক। বঙ্কিমচন্দ্রই প্রথম সাহিত্য সমালোচনাকে ব্যাপক ও মহৎ কর্তব্যরূপে গ্রহণ করেন। সাহিত্যের স্বরূপ ও মূল্য নির্ধারণের জন্য একজন প্রতিভাবান সাহিত্যিককেই অবতীর্ণ হতে হোল, যা-ও সাহিত্যের এই খিদমদগারী অ-সাহিত্যিক সহৃদয় পণ্ডিতগণেরই শোভা পায় এবং এ তাঁদের যোগ্যও বটে। কিন্তু দেখা যায় সাহিত্য সমালোচনার ভার সাহিত্যিকগণকেই বেশি নিতে হয়েছে। অধ্যাপকগণ এ কাজে যে নামেননি তা নয়, কিন্তু তাঁদের চেয়ে সাহিত্যিকগণই সব্যসাচীর ভূমিকায় অধিক কৃতিত্ব প্রদর্শন করেছেন।

বাংলা প্রবন্ধ ও সমালোচনা সাহিত্যের উত্তরায়ণ এবং মুক্তি সূচিত হোল উনিশ শতকের শেষ দশকে রবীন্দ্রনাথ এবং 'সাধনা' পত্রিকার আবির্ভাবের দ্বারা।

রবীন্দ্রনাথের গদ্য রচনা

সার্বভৌম কবিখ্যাতির জন্য গদ্যস্রষ্টা রবীন্দ্রনাথ কোনদিন ন্যায্য সমাদর পেলেন না। কবিখ্যাতির অন্তরালে গদ্য-শিল্পী ঢাকা রইলেন। রবীন্দ্রনাথের ঊনপঞ্চাশখানি কাব্য থেকে নির্বাচিত সংকলন 'সঞ্চয়িতা'র মত গল্প উপন্যাস-নাটক বাদে অন্য বিয়াল্লিশখানি গদ্য গ্রন্থের নির্বাচিত অংশ নিয়ে যদি একখানি পূর্ণাঙ্গ গদ্য 'সঞ্চয়িতা' থাকত তাহলে তার গৌরব কবিতাসঙ্কলনখানির চেয়ে কম হত না। কবিতা ও গানের চেয়ে রবীন্দ্রনাথের গদ্যরচনা ঐশ্বর্য, মাধুর্য, প্রাচুর্য ও বৈচিত্র্য—কোনদিকেই ন্যূন নয়। কিন্তু গদ্যের চেয়ে কবিতার আবেদন বেশি, এবং গদ্যপাঠ অপেক্ষা কবিতা পাঠ কম শ্রমসাধ্য, স্বভাবতই রবীন্দ্রনাথের গদ্য রচনা বিশেষত গল্প উপন্যাস নাটক ব্যতীত অন্যান্য নিবন্ধ প্রবন্ধাদির পাঠক ও প্রচার অপ্রচুর।

অথচ রবীন্দ্রনাথ গদ্য রচনা শুরু করেছেন পনর বছর বয়স থেকে। তাঁর প্রথম গদ্য রচনা 'ভুবন মোহিনী প্রতিভা' "জ্ঞানাঙ্কুর" পত্রিকায় প্রকাশিত হয় ১৮৭৫-এ। এটি একটি গ্রন্থসমালোচনা। তাঁর দ্বিতীয় গদ্য-রচনাও সাহিত্য-সমালোচনা। ১৮৭৭-এর জুলাই মাসে "ভারতী" পত্রিকার প্রথম তিনটি সংখ্যায় তিনি লেখেন 'মেঘনাদ বধ কাব্য' সমালোচনা। তাঁর বয়স তখন ষোল। এরপর "ভারতী"র পৃষ্ঠায় একটি গল্প ('ভিখারিনী') এবং একটি উপন্যাস ('করুণা') লেখেন।

বিলাত যাত্রার পূর্ব পর্যন্ত এইটুকুই তাঁর গদ্য-রচনা। এই সময়ের মধ্যে পদ্য রচনার পরিমাণ 'বনফুল', 'ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী', 'কবি কাহিনী' এবং কিছু অনুবাদ ও দুএকটি গান।

বিলাত প্রবাসকালে তিনি পদ্য রচনা বিশেষ করেন নি। এই সময়ে 'ভারতী'র জন্য প্রধানত তিনি গদ্য রচনা করেছেন এবং তাঁর আঠার-ঊনিশ বছর বয়সের এই রচনাগুলি 'য়ুরোপ প্রবাসীর পত্র' (১৮৭৮-৮০) নামে 'ভারতী'তে প্রকাশিত হয়, গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় ১৮৮১-তে।

পনর থেকে চব্বিশ বছর বয়সের মধ্যে রচিত গদ্য রচনার

অধিকাংশই রবীন্দ্রনাথ বর্জন করেছিলেন এবং এজন্য তা রবীন্দ্র-রচনাবলীতে স্থান লাভ করেনি। অথচ ১৮৭৬-১৮৮৫ খ্রীঃ এর মধ্যে 'জ্ঞানাঙ্কুর' ও 'ভারতী' পত্রিকার পৃষ্ঠায় প্রকাশিত বিচিত্র গদ্য রচনাগুলি পরিমাণমাত্রা নয়, গুণগত বিচারেও রবীন্দ্রনাথের গদ্য-শিল্পী পরিচয়টিকে সমুজ্জ্বল করতে পারে। এই সময়ে রচিত গদ্যগ্রন্থ-গুলিকে রবীন্দ্রনাথেব গদ্য রচনার প্রথম পর্ব মনে করা যায়। প্রথম পর্বের গদ্যগ্রন্থগুলির নাম ঃ (১) বিবিধ প্রসঙ্গ (১৮৮৩); এবং (২) আলোচনা (১৮৮৫)। এই দুই গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত গদ্যসন্দর্ভগুলির নাম যথাক্রমে 'বসন্ত ও বর্ষা', 'প্রাতঃকাল ও সন্ধ্যাকাল', 'শূন্য', 'স্ত্রৈণ', 'জমাখরচ', 'দয়ালু মাংসাশী', 'আদর্শ প্রেম', 'সমাপন' এবং 'ধর্ম', 'ডুব দেওয়া, 'সৌন্দর্য ও প্রেম' 'কথাবার্তা' 'আত্মা', 'বৈষ্ণব কবির গান'। এ দুখানি ছাড়া কোন গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত না হয়েই পুনর্মুদ্রণের সৌভাগ্যবঞ্চিত এবং অচলিত সংগ্রহে কোনক্রমে আত্মগোপনকারী আরো বহু সমকালীন গদ্যরচনাশিল্পের মধ্যে 'সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়,' 'সংগীত ও ভাব' (১৮৮১ এপ্রিল), 'সঙ্গীতের উৎপত্তি ও উপযোগিতা' (হার্বার্ট স্পেন্সারের অনুবাদ), 'সঙ্গীত ও কবিতা', 'যথার্থ দোসর', 'গোলামচোর', 'একচোখা সংস্কার', 'চর্ব চোষ্য লেহ্য পেয়', 'দারোয়ান', 'নিমন্ত্রণসভা', 'জুতাব্যবস্থা' 'বাঙ্গালী কবি নয়', 'বাঙ্গালা কবি নয় কেন', 'অকারণ কষ্ট', 'কাব্যের অবস্থা পরিবর্তন', 'বসন্ত রায়', 'বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাস', 'অকালকুষ্মাণ্ড', 'হাতে কলমে' এবং 'রামমোহন রায় ও সমস্যা' (১৮৮৪) নামক প্রবন্ধ উল্লেখযোগ্য।

রবীন্দ্রনাথের উপবোক্ত অচলিত গদ্য রচনাগুলি রীতিমত আলোচনার অপেক্ষা বাখে। প্রকাশিত রবীন্দ্র-সন্দর্ভসমূহের তুলনায় এই বর্জিত রচনাগুলিব শিল্পসৌন্দর্য নগণ্য নয়। এই নাতিদীর্ঘ নিবন্ধসমূহের মধ্যে সাময়িকতাই মুখ্য এবং সমকালীন নানা তুচ্ছ উপলক্ষ্য রচনাগুলির অভিপ্রায়রূপে ক্রিয়াশীল বলেই রবীন্দ্রনাথ এদের স্থায়ী স্বীকৃতি দিতে চাননি। কিন্তু রবীন্দ্র-গদ্য-শিল্পের ক্রমবিকাশে এই প্রথম পর্বের মূল্য অনস্বীকার্য।

দ্বিতীয় পর্বের গদ্য রচনা শুরু হয় ১৮৮৬ থেকে, চলেছে ১৯০৭ পর্যন্ত। এই পর্বে 'পঞ্চভূত', 'ছিন্নপত্র', 'আধুনিক সাহিত্য', 'প্রাচীন সাহিত্য', 'বিচিত্র প্রবন্ধ', 'লোকসাহিত্য', 'সাহিত্য' প্রভৃতি রচিত। এই পর্বে রবীন্দ্রনাথের রচনা প্রকাশের বাহন ছিল প্রধানত 'ভারতী' ও 'সাধনা'। 'সাধনা' প্রকাশিত হয় ১৮৯১-এর নভেম্বর মাসে সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সম্পাদনায়। 'সাধনা' পত্রিকাখানি ছিল রবীন্দ্রনাথের শিল্প ও ভাবসাধনার মুখপত্র। কবি এই সময় পদ্মা-পারে। 'গল্পগুচ্ছের' আশ্চর্য ছোটগল্পগুলি 'সাধনা'তেই প্রকাশিত হতে আরম্ভ করে। 'বঙ্গদর্শন'-ভারতী'-'সাধনা'র যুগ (১৮৭৭-১৯০৭) রবীন্দ্র-শিল্পী জীবনের পক্ষে খুবই সুজলাসুফলা। সাহিত্যসমালোচনা এবং ব্যক্তিগত রচনা-শিল্প এই সময়ে সর্বাধিক সৃষ্টিশীল ছিল। ১৯০৮ থেকে ১৯১২ পর্যন্ত রবীন্দ্র-গদ্য রচনার তৃতীয় অধ্যায়। এই অধ্যায়ের অন্তর্গত নিবন্ধাদি প্রায়শ শিক্ষা, ধর্ম, দর্শন ও রাষ্ট্রনৈতিক চিন্তার পথে ভ্রমণ করেছে। 'রাজা ও প্রজা' (১৯০৮), 'স্বদেশ' (১৯০৮) 'সমাজ' (১৯০৮), 'শিক্ষা' (১৯০৮), 'শব্দতত্ত্ব' (১৯০৯), 'ধর্ম' (১৯০৯) 'শান্তিনিকেতন' গ্রন্থের সতেরটি প্রবন্ধ এবং 'জীবনস্মৃতি' (১৯১২) এই পর্বের রচনা। দ্বিতীয় পর্বের গদ্যরচনায় সাহিত্য-সমালোচনা এবং রসরচনা ছিল প্রধান; এই পর্বে ধর্ম, শিক্ষা, রাষ্ট্রনীতির গুরুগম্ভীর পাণ্ডিত্যপ্রধান প্রবন্ধই প্রায় সব,—একমাত্র ব্যতিক্রম 'জীবনস্মৃতি'।

'সবুজপত্র' পত্রিকার প্রকাশ ১৯১৪ খ্রীঃ-এ। এই পত্রিকার মাধ্যমে রবীন্দ্রনাথের গদ্যরচনা যেমন প্রাচুর্য পায় তেমনি রচনাশৈলীতেও পরিবর্তন দেখা দেয়। এই পর্বেও রাজনৈতিক ও শিল্পনৈতিক বিষয়ে বিতর্কমূলক প্রবন্ধাদিই বেশী লিখিত হচ্ছিল। 'সঞ্চয়', 'পরিচয়', 'সমবায়নীতি', 'কর্তার ইচ্ছায় কর্ম' প্রভৃতি এই সময়ের রচনা।

রবীন্দ্রনাথের গদ্যরচনার পঞ্চাঙ্ক বা শেষ পর্ব ধরা যায় ১৯৩১ থেকে ১৯৪১ খ্রীঃ-এর মধ্যে। এই পর্বটিকে পুরাপুরি গদ্যরচনার যুগ বলা যায়। সর্বাধিক প্রবন্ধগ্রন্থ এই কয় বছরেই রচিত হয়েছে। 'রাশিয়ার চিঠি' (১৯৩১), 'মানুষের ধর্ম' (১৯৩৩), 'ছন্দ', 'পারস্যে',

'সাহিত্যের পথে' (১৯৩৬) 'কালান্তর' (১৯৩৭), 'বিশ্বপরিচয়' (১৯৩৭) 'বাংলাভাষা পরিচয়', 'ছেলেবেলা' (১৯৪০), 'সভ্যতার সংকট' (১৯৪১) এই অন্তিম পর্বের সৃষ্টি। প্রবন্ধ ব্যতীত এই পর্বে 'তিনসঙ্গী', 'সে' 'গল্পসল্প' প্রভৃতির গল্প এবং কথিকা-সাহিত্য 'লিপিকা' লেখা হয়। তাছাড়া এই পর্বের কাব্যগুলিও পদ্য নয়। 'পুনশ্চ' (১৯৩২), 'শেষ সপ্তক' (১৯৩৫), 'শ্যামলী' (১৯৩৬), 'পত্রপুট' থেকে 'শেষ লেখা' (১৯৪১) পর্যন্ত এই সময়ের অধিকাংশই গদ্যকাব্য। এই গদ্য-কাব্যগুলিকেও একহিসাবে রবীন্দ্রনাথের গদ্য-শিল্পসৃষ্টিরই অন্তর্ভুক্ত করা সঙ্গত। কোন্ মনস্তত্ত্ব থেকে রবীন্দ্রনাথ জীবনসায়াহ্নে সুর ও ছন্দের মোহ ত্যাগ করে গদ্যের বিরস পথে যাত্রা করেছিলেন সে-গবেষণা আপাতত বাদ রেখে এটুকুই মনে রাখা যাক যে ত্রিশোত্তর কালে রবীন্দ্রনাথ নিজের সৃষ্টির বাহন হিসাবে গদ্যকেই সার্বভৌম করেছিলেন।

রবীন্দ্রনাথের গদ্য-রচনার আলোচনা তিনভাগে হওয়া উচিত। একভাগে গল্প, উপন্যাস ও নাটক, একভাগে গদ্যকাব্যগুলি এবং তৃতীয়ভাগে প্রবন্ধ-সমালোচনা ও ব্যক্তিগত রচনাশিল্পের গদ্য নিয়ে আলোচনা করাই প্রশস্ত। বর্তমান গ্রন্থে আমরা শেষোক্ত শ্রেণীর গদ্যগ্রন্থগুলি আলোচনার অন্তর্ভুক্ত করেছি। বলা বাহুল্য এ-গ্রন্থ রবীন্দ্রনাথের সুবিশাল গদ্যসৃষ্টির সমগ্র আলোচনা তো নয়ই, এমন কি তিনভাগের যে একভাগমাত্র এর পরিধির অন্তর্ভুক্ত হয়েছে সে অংশের বিচার ও মূল্যায়নও পূর্ণাঙ্গ নয় নিশ্চয়।

অসম্পূর্ণতা সত্ত্বেও অগ্রবর্তিতার ভরসা এই গ্রন্থরচনার পাথেয় হয়েছে।

দ্বিতীয় উদ্যোগ

প্রবন্ধ-শিল্পী রবীন্দ্রনাথ

প্রবন্ধের সংজ্ঞা

তথ্য বা তত্ত্ব বিশ্লেষণ ও বিচারমূলক মননধর্মী গদ্যরচনার নাম প্রবন্ধ। বিস্তারিত করে বলা যায়—বিষয়-বিশেষের আস্বাদন এবং স্বরূপ নির্ধারণের জন্য বুদ্ধি ও যুক্তিমার্গী যে বিচার, বিতর্ক, ব্যাখ্যা বা মীমাংসা অথবা যে নিছক রস ও সৌন্দর্য-সম্ভোগ, প্রবন্ধ তারই সুনিয়মিত ও সুশৃঙ্খলিত বাণীরূপ। রূপরস ও সৌন্দর্য সৃষ্টির আবেগ নয়, বিজ্ঞান-বুদ্ধি ও বৈদগ্ধ্যই প্রবন্ধ রচনার প্রেরণা। প্রবন্ধ রচনার জন্য মৌল শিল্পপ্রতিভার প্রয়োজন হয় না।

কিন্তু অনেক প্রতিভাবান কবি ও শিল্পীই প্রবন্ধ লিখেছেন। অবশ্য ক্লাসিক মহাকবিদের কেউই প্রাবন্ধিক অথবা সমালোচক ছিলেন না। সাহিত্য-শিল্পের স্রষ্টা আর সেই সৃষ্টির সহৃদয় বিচারক প্রাবন্ধিক সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র দুটি শ্রেণী ছিলেন। নিজেদের সৃষ্টির সীমা অতিক্রম করে কবি কখন প্রাবন্ধিক অথবা প্রাবন্ধিক কবি হওয়ার প্রয়াস পান নি। কিন্তু একালে সমাজের মতো সংস্কৃতি চর্চায়ও বর্ণাশ্রম প্রথা অচল হয়ে গেছে। কবি বা ঔপন্যাসিকের একালে প্রাবন্ধিক বা সমালোচক হতে বাধা নেই।

বাধা লুপ্ত হয়েছে বলে প্রবন্ধও তার স্বভাব বদলিয়েছে। তাই প্রবন্ধের যে সংজ্ঞা অর্থাৎ স্বভাব আধুনিক কালে তা প্রায় ভিত্তিহীন হয়ে উঠেছে। গল্প-কথা ছাড়া একালে যা কিছুই গদ্যে লেখা হয় তাই প্রবন্ধ নামে চলে যাচ্ছে।

সাধারণত প্রবন্ধ দুজাতের: নিবন্ধ ও রচনাশিল্প। জ্ঞানমূলক আলোচনা নিবন্ধ এবং ধ্যান ও অনুভূতিমূলক আলোচনা রচনাশিল্প।

খাঁটি প্রবন্ধের ইংরাজী প্রতিশব্দ Treatise, কিন্তু প্রবন্ধের

প্রচলিত ইংরাজী প্রতিশব্দ Essay। Essay-র যথার্থ বাংলা প্রতিশব্দ 'রচনা'। Essay ও Treatise বা রচনা ও প্রবন্ধে গরমিলই বেশি। প্রবন্ধ বিজ্ঞান আর রচনা শিল্প। (রচ্ ধাতু নিষ্পন্ন রচনার দ্যোতনা সৃজন আর বন্ধ ধাতু নিষ্পন্ন প্রবন্ধের ব্যঞ্জনা প্রকৃষ্টরূপ বন্ধন।) রচনা (Essay) রসসৃষ্টি, তাই তা আর্ট; আর প্রবন্ধ জ্ঞানালোচনা, তাই তা বিজ্ঞান। প্রবন্ধের মূল্য বিষয়বস্তুর গৌরবে এবং যুক্তিনিষ্ঠার দার্ঢ্যে; আর রচনার মূল্য রস-সম্ভোগে, রূপসৃষ্টির লাবণ্যে।

প্রবন্ধের প্রকার

প্রসঙ্গত প্রবন্ধের জাতি নির্ণয় করা যেতে পারে। আধুনিক অর্থে প্রবন্ধ য়ুরোপে উদ্ভূত। সংস্কৃতে প্রবন্ধের দৃষ্টান্ত আছে ঋগ্বেদ থেকেই। বাংলা ভাষায়ও ষোড়শ ও সপ্তদশ শতকের চরিতকাব্য-গুলির মধ্যে পদ্যবন্ধ প্রবন্ধের সাক্ষাৎ মেলে। কিন্তু ভারতীয় ও য়ুরোপীয় প্রবন্ধের স্বভাবে মৌল প্রভেদ। ভারতীয় প্রবন্ধ—সন্দর্ভ, টীকা, সিদ্ধান্ত, নিবন্ধ, প্রস্তাব, কড়চা প্রভৃতি বহু নামে প্রচলিত। সংস্কৃত ভাষায় দর্শন, শাস্ত্র, ব্যাকরণ, সাহিত্যতত্ত্ব প্রভৃতি জ্ঞান-বিজ্ঞানের বহুশাখায় আলোচনামূলক যে গদ্য গ্রন্থ আছে তা হয় ভাষ্যমূলক নয় ন্যায়তর্কমূলক। এই ভাষ্য, ন্যায় ও মীমাংসার নানা ধরন আছে এবং এক একটি প্রকরণের এক একটি অভিধা। জ্ঞানমূলক কোন সূত্র বা সুক্ত বা পংক্তির অর্থব্যাখ্যামূলক প্রবন্ধকে বলা হবে টীকা; কোন বিতর্কমূলক ন্যায়কূটের ব্যাখ্যা ও প্রমাণ-মীমাংসামূলক প্রবন্ধকে সিদ্ধান্ত, কোন একটি তত্ত্ব বিষয়ে মোটামুটি একটি অমীমাংসিত নাতিবৃহৎ আলোচনাকে কড়চা কোন বিষয়ে সমগ্রতার বদলে বিশেষ কোন দিকের প্রতি সিদ্ধান্তহীন স্বল্পপরিসর আলোকপাত করাকে নিবন্ধ, শুধুমাত্র কিছু তথ্য পরিবেশন দ্বারা নিজস্ব মতামত সুধীজনের অনুমোদনের জন্য পেশ করা হলে প্রস্তাব এবং তথ্য সংকলনমূলক প্রবন্ধকে সন্দর্ভ বলা হয়েছে।

রবীন্দ্র-প্রতিভার বাহন : প্রবন্ধ

রবীন্দ্রনাথের হল গানের প্রতিভা। তাঁর প্রতিভার যথার্থতম বাহন গীতি-কবিতা। বিশ্ব-প্রকৃতি আর বিশ্বজীবনের নিভৃততম আর সূক্ষ্মতম সুর-ছন্দটিও তাঁর অনুভবে ধরা পড়ে; কিন্তু সুর ও ছন্দের সেই অণুপরমাণুগুলিকে প্রত্যক্ষ করানোর মতো বাণীরূপ অসম্ভব বলে কবি স্বতঃই সংগীতের অমূর্ততায় সেই অমর্ত্য অনুভূতিগুলিকে অসীম ব্যঞ্জনায় আনন্দময় অভিব্যক্তি দেন। রবীন্দ্রনাথের সমগ্র অস্তিত্বটিই যেন একটি অন্তহীন সংগীত; সুর আর সৌন্দর্য জমে জমে গড়া তাঁর দেহকান্তির কোথাও যেন রক্তমাংসের স্থূলতা ছিল না।

রবীন্দ্র-প্রতিভার দ্বিতীয় সার্থকতম বাহন তাঁর গীতি-কবিতারই দোসর গদ্য-কবিতাধর্মী তাঁর অনবদ্য ছোটোগল্পগুলি এবং তাঁর প্রতিভার তৃতীয় যোগ্যতম বাহন সংকেত, বাস্তব ও রূপকের সংমিশ্রণে স্ব-উদ্ভাবিত ভাবাদর্শমূলক এক শ্রেণীর সাংকেতিক ও সাংগীতিক নাটক।

দীর্ঘ আখ্যানমূলক রচনা অর্থাৎ মহাকাব্য বা কথা-সাহিত্য রবীন্দ্রপ্রতিভার অনুকূল নয়। অভিজ্ঞতালব্ধ তথ্যগত সত্যের চেয়ে উপলব্ধিজাত ভাবগত সত্যের প্রতি গভীরতর প্রত্যয়ের জন্য তিনি নিছক সমকালীন এবং জৈবিক জীবনকে অপেক্ষাকৃত কম স্বীকৃতি দিয়েছেন। দীর্ঘস্থায়ী জটিল মানবিক জীবন-সংকট,—যে জীবনে বস্তুত প্রত্যক্ষভাবে কোথাও কণিকামাত্র সৌন্দর্য্য ও আনন্দের কল্পনাও সম্ভব নয়—তাঁর ঔপনিষদিক আনন্দবাদী কবি-প্রাণকে অনতি-বিলম্বে ভারাক্রান্ত ও অবসন্ন করে ফেলত;—জীবনধারণের জন্য যে-সংগ্রাম ও দুঃখভোগের মধ্য দিয়ে মানুষকে প্রতিনিয়ত কালাতিপাত করতে হয় এবং নিতান্ত জৈবিক ক্ষুধার জন্য মানুষের প্রবৃত্তিগুলির কার্যকলাপে যে নিষ্ঠুরতা ও গ্লানি—বিশুদ্ধ সৌন্দর্য, প্রেম ও আনন্দবাদী রবীন্দ্রনাথের পক্ষে তা সহ্য করা সহজ ছিল না। অথচ কথা-সাহিত্যিকের পক্ষে এই প্রবৃত্তিগুলির বিচিত্র ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া এবং জটিল যন্ত্রণাই হল সবচেয়ে মূল্যবান সৃষ্টি-উপকরণ।

রবীন্দ্রনাথের প্রতিভা উপন্যাস, সামাজিক নাটক বা প্রবন্ধ রচনায় স্বতঃস্ফূর্ত ছিল না। সার্থক উপন্যাস তিনি লিখেছেন; কিন্তু 'গোরা' বাদ দিয়ে বাকিগুলির ঔপন্যাসিক মূল্যবিচার উপন্যাসের সংজ্ঞা আর প্রকরণ মিলিয়ে করা চলবে না। রবীন্দ্রনাটকের বিচার যেমন ভরতের নাট্যসূত্র বা 'পোয়েটিকস্'-এর ধারা ধরে করা চলে না, তাঁর কথা-সাহিত্য এবং প্রবন্ধ সমূহের ক্ষেত্রেও তেমনি প্রতিষ্ঠিত সাহিত্যতত্ত্ব অচল। রবীন্দ্র-প্রতিভা এমনই অসাধারণ ছিল যে শিল্প-সাহিত্যের কোন ক্ষেত্রেই তা গতানুগতিক রীতিনীতি মেনে চলেনি। সীমা ও অসীমের মিলন সাধনই নাকি তাঁর কাব্যসাধনার পালা। ভাবমাত্র নয়, এ উক্তি কবির রূপশৈলীর ক্ষেত্রেও যথার্থ। প্রবন্ধের বস্তুতন্ত্র আর কথা-সাহিত্যের জীবন-যন্ত্র যদি হয় সীমা, তবে তিনি দুয়েরই সঙ্গে তাঁর সার্বভৌম কবিত্বের অসীমত্ব মিলিয়ে-মিশিয়ে কথা-সাহিত্য তো বটেই, প্রবন্ধকেও রোমান্টিক করে তুলেছেন।

রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধ ততটা মনীষাগত নয়, যতটা অনুভূতি বা হৃদয়গত। অর্থাৎ এও তাঁর মানস রচনা—কবিতার মতোই তাঁর সাধের সাধনা। বঙ্কিমচন্দ্রের ব্যক্তিত্ব ছিল রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিত্বের বিপরীত। বঙ্কিমের ব্যক্তিত্বই যথার্থ প্রাবন্ধিক চরিত্রের উপযোগী। বঙ্কিমের মত বৈদগ্ধ্য, নিরাবেগ, নৈর্ব্যক্তিক পুরুষকার থাকলে তবেই ভালো প্রাবন্ধিক হওয়া যায়। বঙ্কিমের মধ্যেও প্রচ্ছন্নভাবে ভাবাবেগ ছিল, কিন্তু আপনার পৌরুষ ও ওজঃগুণ দিয়ে তিনি যে সংযমগুণ অর্জন করেছিলেন, তারই দরুন একমাত্র 'কমলাকান্তের দপ্তর' ছাড়া অন্যত্র সেই ভাবাবেগ নিরুদ্ধ ছিল। তারই ফলে 'বিবিধ প্রবন্ধ'—দুটি খণ্ডের নিরেট প্রবন্ধগুলি পাওয়া গেছে। রবীন্দ্রনাথের কাছ থেকে অক্ষয় কুমার দত্ত, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী এবং বঙ্কিমচন্দ্রের প্রবন্ধের মতো যথার্থ সন্দর্ভ ক্বচিৎ মিলেছে।

রবীন্দ্রনাথের সত্তায় ছিল রমণীয়তা। রবীন্দ্র-ব্যক্তিত্বের দীপ্তি ছিল অসাধারণ, কিন্তু সে দীপ্তি জ্বালাহীন; মধ্যাহ্নসূর্যের রৌদ্র-দীপ্তি নয়, বুদ্ধপূর্ণিমার জ্যোৎস্নালোকের দীপ্তি ছিল তাঁর স্বভাবে। এখানে

তাঁর নামের সঙ্গে স্বভাবের অমিলটাই দেখা যায়। প্রবন্ধ জিনিষটা খর দীপ্তি বা তর্কাতর্কির রৌদ্ররসেই জমে ভালো।

রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধজাতীয় রচনাগুলি রমনীসুলভ কমনীয়তায় মধুর, কিন্তু যুক্তি শৃঙ্খলার ঐশ্বর্যে ততটা বীর্যবান নয়। বঙ্কিমচন্দ্র বা রামেন্দ্রসুন্দরের প্রবন্ধের আভিজাত্য তাঁর নেই। যথার্থ প্রবন্ধের ধর্মানুযায়ী তা পাঠকের বিজ্ঞানবুদ্ধিকে খুশী করতে পারে না, কিন্তু তার রূপরসলুব্ধ মনটিকে মুগ্ধ করে। রবীন্দ্রনাথ রসবাদী প্রাবন্ধিক।

রবীন্দ্রনাথের কৃতিত্ব খাঁটি প্রবন্ধ রচনায় নয়; প্রবন্ধকে শিল্প করে তোলার কৃতিত্বেই তিনি বাংলা সাহিত্যে এই ক্ষেত্রেও গুরুদেব। তিনিই প্রবন্ধকে সাহিত্য করে তুলেছেন।

প্রবন্ধ সাহিত্য হলে তার নাম হয় রচনা-শিল্প (Essay)। প্রবন্ধ সাহিত্য কিনা এ নিয়ে তিনি বিতর্কের অবকাশ রাখেন নি। হৃদয় ও মস্তিষ্ক, অনুভূতি ও উপলব্ধি, কল্পনার ভাবসত্য আর বিজ্ঞানের প্রয়োগসত্যে কোথাও বিরোধ নেই। সকল বিরোধের সমন্বয় হয়েছে রবীন্দ্র-জীবনবোধের অসীমলোকে। ভারতীয় ঐক্যসাধনার পরমতম অভিব্যক্তি পুরুষোত্তম রবীন্দ্রনাথের মনীষাসৃষ্ট গদ্য-নিবন্ধগুলি তাঁর কবিতা, নাটক ও ছোটোগল্পের ভাব ও রূপের সঙ্গে অন্বিষ্ট। রবীন্দ্রনাথের মধ্যে মহৎশিল্পী এবং মনীষার সমন্বয় হয়েছে।

এই সিদ্ধি সম্ভব হয়েছে রবীন্দ্রপ্রতিভার অন্তহীন প্রসারতার জন্য। রবীন্দ্রভাবাকাশে সকল বস্তু-তথ্যই অবলীলায় তারা হয়ে ফুটেছে। ফলে বস্তুর তথ্য-ত্ব হানি না হয়েও তা কমবেশী অমূর্ততা পেয়েছে। রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধ তথ্য ও বস্তুমূল্যে বা বিষয়গৌরবে ঘাটতি না গিয়েও অনুভূতি ও আবেগের বিরাটত্বে—আর রস ও সৌন্দর্যবোধের অনিবার্য পরিপ্রেক্ষিতে কিভাবে যেন মাধ্যাকর্ষণহীন হয়ে ভারমুক্ত মাত্রে পর্যবেশিত হয়েছে, এবং মৃত্তিকার মালিন্য হারিয়েছে।

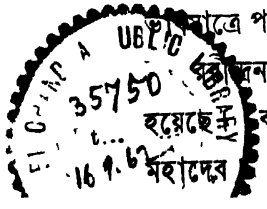

রবীন্দ্রনাথের পৌরোহিত্যে বাংলা প্রবন্ধ-সাহিত্যের পরিণয় সাধিত হয়েছে। বঙ্কিমচন্দ্র-রামেন্দ্রসুন্দরের হাতে বাংলা প্রবন্ধ ছিল নীলকণ্ঠ মহাদেব, রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধ পার্বতী। আবার তিনিই হরপার্বতীর

মিলন ঘটিয়েছেন। চিন্তা-পুরুষের সঙ্গে ভাব-বধূর প্রণয়ের পূর্বরাগ দেখা দিয়েছিল বঙ্কিমচন্দ্রের রচনায়—'কমলাকান্তের দপ্তরে'—রবীন্দ্রনাথের হাতে বাংলা প্রবন্ধের ক্রমবিকাশে পূর্বরাগের পালা শেষ হয়ে অভিসারের যুগ শুরু হয়েছে। জ্ঞান ও যুক্তি-শৃঙ্খলার সঙ্গে ভাব ও আবেগের মিলনেই রবীন্দ্র-প্রবন্ধ। এই মিলনধর্মিতার গুণেই রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধ বিজ্ঞান না হয়ে হয়েছে শিল্প।

রবীন্দ্র প্রবন্ধের শ্রেণী

প্রবন্ধ-শিল্পের নামান্তর ব্যক্তিগত রচনা। রবীন্দ্রনাথের মননমূলক গদ্যরচনা সাধারণ ও সমগ্রভাবে রচনাসাহিত্য। তথাপি বস্তু-তথ্য ও যুক্তিনিষ্ঠার মাত্রাগত পরিমাণ অনুযায়ী রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধ-শিল্পকেও আমরা দুভাগ করে নিলাম ঃ রচনা শিল্প (Essay) এবং নিবন্ধ-সন্দর্ভ (Treatise)। যে লেখাগুলিতে ব্যক্তিগত ভাবাদর্শ, আমেজ ও আবেগ, খেয়ালী-কল্পনা এবং ভাষায় আলঙ্কারিকতার সর্বময় বিস্তার সেই ব্যক্তিগত নিবন্ধগুলিকে রচনাশিল্প এবং যেগুলিতে অপেক্ষাকৃত জ্ঞান ও মনীষার প্রাধান্য, বস্তু ও তথ্যনিষ্ঠাও বেশি এবং ভাষায় রয়েছে ঋজুতা ও স্পষ্টতা, সেগুলিকে নিবন্ধ-সন্দর্ভ বলা যেতে পারে।

নীচের গ্রন্থগুলিকে কবির রচনাশিল্প বা ব্যক্তিগত রচনার অন্তর্ভুক্ত করা চলে ঃ

(ক) পথের সঞ্চয়, জাপান যাত্রী, পারস্যে, য়ুরোপ প্রবাসীর পত্র, য়ুরোপযাত্রীর ডায়ারী এবং যাত্রী (ভ্রমণ সাহিত্য)।

(খ) ছিন্নপত্র, পথে ও পথের প্রান্তে, ভানুসিংহের পত্রাবলী প্রভৃতি (পত্র-সাহিত্য)।

(গ) বিচিত্র প্রবন্ধ, লিপিকা (ব্যক্তিগত রচনা এবং কথিকা-সাহিত্য)।

(ঘ) জীবনস্মৃতি, ছেলেবেলা (স্মৃতি-সাহিত্য)।

নিবন্ধ-সন্দর্ভগুলিকেও বিষয়ানুযায়ী ছয়টি শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায় ঃ

(ক) রাষ্ট্রাদর্শ	(খ) শিক্ষাদর্শ	(গ) চরিতাদর্শ
* কালান্তর	* শিক্ষা	* আত্মপরিচয়
		* খৃষ্ট
		* বুদ্ধদেব
* স্বদেশ	* বিশ্বভারতী	* মহাত্মা গান্ধী
* ইতিহাস	* শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্যাশ্রম	* ভারত পথিক রামমোহন রায়
* রাশিয়ার চিঠি	* আশ্রমের রূপ ও বিকাশ	* বিদ্যাসাগর চরিত
* সমবায় নীতি		* চারিত্র পূজা
(ঘ) বিজ্ঞান	(ঙ) ধর্মাদর্শ	(চ) শিল্পাদর্শ
* বিশ্বপরিচয়	* ধর্ম	* সাহিত্য
	* মানুষের ধর্ম	* সাহিত্যের স্বরূপ
	* সঞ্চয়	* সাহিত্যের পথে
	* শান্তিনিকেতন	* লোক সাহিত্য
		* প্রাচীন সাহিত্য
		* পঞ্চভূত

রাষ্ট্র, শিক্ষা, চরিত, বিজ্ঞান, ধর্ম—এই পাঁচটি বিষয়ের রচনাগুলি প্রবন্ধ-শিল্প এবং শিল্প-সাহিত্য সংক্রান্ত রচনাগুলি সমালোচনা শিল্পের অন্তর্ভুক্ত বিবেচনা করে দুটি উদ্যোগে আমরা এই দুই দিকে রবীন্দ্রনাথের মতামত সংক্ষেপে পর্যালোচনা করব।

কালান্তর

প্রধানত 'কালান্তরে'র প্রবন্ধগুলিতে রবীন্দ্রনাথের রাষ্ট্রাদর্শ প্রকাশিত হয়েছে। এই গ্রন্থের গুটিকয় প্রধান প্রবন্ধের সারাংশ নিয়ে এ বিষয়ে আলোচনা করা যেতে পারে।

এর প্রথম প্রবন্ধ 'কালান্তরে' কবি বলছেন : ভারতবর্ষ সনাতন

দেশ। কিন্তু এই সনাতনত্বের ফল জড়তা আর স্থবিরতা। ভারত-বাসীর বিশ্বজগৎ ছিল চণ্ডীমণ্ডপে সীমাবদ্ধ। কবিগান-কথকতা-পাঁচালীতেই তার রসপিপাসা তৃপ্ত হয়েছে। তার কূপমণ্ডুক গড্ডলিকাবাহী জীবনে সংবেদনশীলতার বালাই ছিল না।

মুসলমান শক্তি যখন এদেশকে জয় করল, অনড় অচলায়তনে আঘাত করল প্রচণ্ড, তাতে ভারতবাসীর দেহে ব্যথা লাগলেও মনের জড়তা কাটল না। বরঞ্চ সে আরও কূর্মবৃত্তি নিল। ভারতীয় মনে বা সংস্কৃতিতে ইস্‌লামী প্রভাব প্রায় শূন্য।

আঠার শতকে য়ুরোপের চিত্ত-প্রতীক হয়ে এল ইংরেজ। তারা এসে মুসলমানের মতো কেবল সংখ্যাগত সমস্যা সৃষ্টি করল না। তারা দেশবাসীর চিন্তাধারা ও চৈতন্য জুড়ে বসল।

ইংরেজ য়ুরোপীয় জঙ্গমশক্তি, কর্মশক্তি ও বিজ্ঞানবুদ্ধি নিয়ে ভারতীয়গণের মনে আঘাত করে বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মতো তাকে জাগ্রত করল।

য়ুরোপের বর্তমান সমৃদ্ধির পশ্চাতে ওদের শ্রমশীলতা, অধ্যবসায়, সত্য সন্ধানের সততা এবং কষ্টসহিষ্ণুতা প্রভৃতি গুণাবলী রয়েছে। প্রতীচ্যই জন্ম দিয়েছে আধুনিক সভ্যতার। কিন্তু সে স্ব-উদ্ভাবিত জ্ঞান-বিজ্ঞান আত্মসর্বস্ব কৃপণের মতো একচেটিয়া করে রাখেনি, ভারতকেও তার আশীর্বাদ দিয়েছে।

ভারতবর্ষ ছিল তার ঐতিহ্য নিয়ে আত্মতৃপ্ত। বুদ্ধির আলস্য, কল্পনার কুহক, আপাত প্রতীয়মান সাদৃশ্যে প্রাচীন পাণ্ডিত্যের অনুবর্তনায় সে আপনাকে ভুলিয়ে রাখতে চেয়েছিল, কেবলই আচার-ধর্মের গোঁড়ামি দিয়ে প্রাণের সৃষ্টিধর্মকে অবরুদ্ধ করে রেখেছে। য়ুরোপ জ্ঞানের বিশ্বরূপ দেখিয়ে ভারতের এই তামসিক মোহভাব কাটাতে চেষ্টা করেছে। অন্ধ শাস্ত্র-শাসন ও আপ্ত-বাক্যের দাসত্ব থেকে সে এদেশকে উদ্ধার করেছে। সর্বোপরি ইংরেজ পাশ্চাত্য সভ্যতার শ্রেষ্ঠ দান মনুষ্যত্ব ও ন্যায়ের বিধান প্রতিষ্ঠা করেছে। 'দিল্লীশ্বরো বা জগদীশ্বরো বা' অর্থাৎ জোর যার মুল্লুক তার—এই

ইসলামী মাৎস্যন্যায় ও অনাচার থেকে ন্যায়বিধানের ও নিরপেক্ষ বিচারের আদর্শ স্থাপন করেছিল।

আমলাতান্ত্রিক শাসক ইংরেজ নয়, বিশেষ করে সংস্কৃতিবান মহৎপ্রাণ ইংরেজের সত্যরূপ তার সাহিত্যের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশ প্রথম লাভ করেছিল।

ইংরেজী সাহিত্য থেকে কেবল রসের আনন্দ নয়, মনুষ্যত্বের তথা যথার্থ সভ্যতার আদর্শটির সন্ধানও আমরা পেয়েছিলাম। মানুষের প্রতি মানুষের অন্যায় দূর করার আবেগ এবং স্বাধীনতা, সাম্য, শান্তি ও সৌভ্রাত্র—আত্মশক্তি, মনুষ্যত্ব ও ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য, এককথায় 'মানবতন্ত্রের মহিমাবোধটি লাভ করেছিলাম। য়ুরোপে 'রিফর্মেশন' আন্দোলন, ফরাসী বিপ্লব, আমেরিকায় দাসপ্রথা উচ্ছেদের সংগ্রাম. ইটালিতে ম্যাটসিনি-গ্যারিবল্ডির গৌরবময় ঐক্যসাধনের জন্য লড়াই আমাদের চিত্তে য়ুরোপকে মুক্ত 'মহৎ' মহিমময় আরাধ্যরূপে প্রতিষ্ঠিত করেছিল।

য়ুরোপের এই সভ্যতার দানেই ভারত সেদিন স্বদেশের স্বাধীনতার স্বপ্ন দেখতে ভরসা পেয়েছিল। ইংরেজের বিরুদ্ধে উনিশ শতকে এদেশে যে সংগ্রাম শুরু হোল তার প্রেরণা কেবল ইংরেজের বিরুদ্ধে ঘৃণা ও বিদ্বেষই ছিল না,—ইংরেজের মহত্ত্বে ও শ্রেয়ত্বে শ্রদ্ধা ও বিশ্বাসও তার শক্তি জুগিয়েছিল।

তাইতো আচরণে পদে পদে প্রতিবাদ করেও আমরা ধীরে ধীরে মনে মনে য়ুরোপের প্রভাবকে আত্মসাৎ করেছি। উনিশ শতক বস্তুত য়ুরোপ ও ইংরেজের সঙ্গে ভারতের সহযোগিতারই যুগ। এই সহযোগিতা, শ্রদ্ধা ও আত্মীয়করণের দ্বারাই ভারতবর্ষে নবযুগের উজ্জীবন হোল। ইতিহাস চলল এগিয়ে। জাপান পাশ্চাত্যের সংস্রবে য়ুরোপীয় জ্ঞান-বিজ্ঞান ও যন্ত্র-সভ্যতাকে দ্রুত আত্মসাৎ করে নিয়ে বিশ্বজাতিসংঘে দেখতে দেখতে সসম্মান ঠাঁই করে নিলে।

কিন্তু ক্রমে ক্রমে দেখা গেল, য়ুরোপ তার নিজের সীমানার বাইরে অনাত্মীয়মণ্ডলে আপন সভ্যতার মশালটি আলো দেখাবার জন্য

নয়,—আগুন জ্বালাবার জন্য বহন করে এনেছে। সর্বজনীন ন্যায়ধর্ম, সৌভ্রাত্র, মানবতাবোধ,—সব আদর্শের বুলি ভাঁওতা মাত্র ; মূল উদ্দেশ্য সাম্রাজ্যবিস্তার ; ঔপনিবেশিক স্বার্থরক্ষা, শাসনের নামে পাশবিক শোষণ। য়ুরোপের এই শয়তানী প্রথম প্রকাশ হয়ে পড়ল চীনে, আমেরিকায় মায়া সভ্যতার বিনাশে আর পারস্যে। য়ুরোপের 'সর্দার-পোড়ো' জাপান গুরুমারা চেলার মতো অনুরূপ বর্বরতা দেখাল চীনে ও কোরিয়ায়। তারপর মহাযুদ্ধ এসে অকস্মাৎ পাশ্চাত্য ইতিহাসের পর্দা তুলে দিলে। যেন কোন মাতালের আব্রু গেল খুলে। দেখা গেল য়ুরোপের যে-সভ্যতাকে আমরা এমন সরল বিশ্বাসে নিবিড় শ্রদ্ধায় মহনীয় ভেবেছি, সব তার মিথ্যা, সব তার বীভৎস, সব তার প্রবঞ্চনা।

য়ুরোপের শুভবুদ্ধি গিয়েছে। আজ সে স্পর্ধা করে কল্যাণের আদর্শকে উপহাস করে। আপনাকে ভদ্র প্রমাণ করার জন্য সভ্যতার দায়িত্ববোধ চলে যাচ্ছে।

আয়ার্লণ্ডে, জালিয়ানওয়ালাবাগে, আমেরিকায় সর্বত্র য়ুরোপীয় শক্তিগুলির কণ্ঠরোধ ও নিপীড়ন অমানুষিক হয়ে উঠল। ফ্যাশিজমের নির্বিকার নিদারুণতা য়ুরোপকে গ্রাস করল।

যুদ্ধপরবর্তী য়ুরোপের বর্বর নির্দয়তা আরো ভয়ঙ্কর। এই নির্লজ্জ প্রতিকারহীন বীভৎসতা দেখে মনুষ্যত্বের পরে বিশ্বাস রাখা কঠিন হয়ে উঠেছে। কিন্তু তথাপি রাখতে হবে—অন্তত এই বর্বরতার প্রতিবাদ করার মতো মনোবল ও আকাঙ্ক্ষা যেন থাকে—অন্তত য়ুরোপীয় পাশবিকতাকে ধিক্কার দেবার অধিকার ও বল যেন আমরা না হারাই। আর যদি এই নগ্ন কুশ্রীতাকে ধিক্কার দেবার ভরসাও আমাদের না থাকে তাহলে বুঝতে হবে সত্যই মানব-সভ্যতা দেউলিয়া হয়ে গেছে। তাহলে বুঝতে হবে বর্তমান সভ্যতার এইখানেই সমাধি—কল্পান্তের আর বিলম্ব নেই।

সভ্যতার সঙ্কট

ভারতবর্ষ একদিন ইংরেজকে মানবহিতৈষী এবং মানবমৈত্রীর হোতারূপে গভীর শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস করেছিল। এই বিশ্বাসের সৃষ্টি হয়েছে ইংরেজের রাষ্ট্রনীতি থেকে নয়, ইংরাজী সাহিত্য ও সংস্কৃতি থেকে। এই আস্থার দরুনই ভারতবাসী সেদিন ভাবতে পেরেছিল যে ভারত তার স্বাধীনতা ইংরেজের দাক্ষিণ্যের দ্বারাই লাভ করতে পারবে। মনু প্রবর্তিত ব্রহ্মাবর্তের পরিসরে নিবদ্ধ লোকাচারভিত্তিক সদাচার অভিহিত কতকগুলি সামাজিক জীবনাচরণ ছিল ভারতবর্ষের সভ্যতার পরিচায়ক। মনুসংহিতার সদাচারের বদলে সভ্যতার আদর্শ আমরা ইংরেজ জাতির চরিত্রের সঙ্গে মিলিয়ে গ্রহণ করলাম।

য়ুরোপ ও ইংরেজের স্বভাবগত সভ্যতার প্রতি সেই দুর্লভ দৃঢ়মূল বিশ্বাস কেমন করে হারানো গেল তারই ইতিহাস আলোচ্যমান প্রবন্ধটি।

ইংরেজ ভারতবর্ষকে জ্ঞানবিজ্ঞান ও যন্ত্রশক্তির আশীর্বাদ থেকে বঞ্চিত রেখে এসেছে। অথচ জাপান সেই যন্ত্রচালনায় নিপুণ হয়ে উঠে য়ুরোপের সমান সমৃদ্ধ হয়ে উঠল। রাশিয়া কত অল্প সময়ে কি বিস্ময়কর উন্নতিই না করল; পারস্যও এই জ্ঞানবিজ্ঞান ও যন্ত্র সভ্যতার দানে সমৃদ্ধ হোল। জাপান, রাশিয়া, পারস্য সবাই যখন সভ্যতার আশীর্বাদে প্রগতির পথে চলেছে তখন কেবল ভারতবর্ষ ইংরেজের সভ্যশাসনের জগদ্দল পাথর বুকে তলিয়ে পড়ে রইল নিরুপায় নিশ্চলতার মধ্যে; কেবল ভারত নয়, ইংরেজ যেখানেই গিয়েছে সেখানেই মনুষ্যত্বের এই মৃত্যু ঘটিয়েছে সে। যেমন চীনে, যেমন স্পেনে। চীনকে অহিফেনের বিষে জর্জরিত করে, স্পেনের প্রজাতন্ত্রের তলায় ডিপ্লোম্যাসির কৌশল চালিয়ে কি সর্বনাশই সে করলে। ইংরেজ ভারতবর্ষের এই অশেষ দুর্গতি সাধন করে বিনিময়ে দিয়েছে কেবল Law and Order—দারোয়ানগিরি।

তাই পাশ্চাত্যজাতির সভ্যতা-অভিমানের প্রতি শ্রদ্ধা রাখা অসাধ্য হয়েছে। সে তার শক্তিরূপ দেখিয়েছে, মুক্তিরূপ দেখাতে পারেনি।

মানবপীড়নের মহামারী সৃষ্টিই পশ্চিমী সভ্যতার মজ্জাগত। মানবাত্মার অপমান করাই তার সভ্যতার ইতিহাস।

অথচ ব্যক্তিগত সৌভাগ্যক্রমে দীনবন্ধু এনড্রুজের মতো মহাপ্রাণ ইংরেজের পরিচয়ও কবি পেয়েছেন। এঁরাই য়ুরোপের চিত্ত-দূত। এঁরাই ইংরেজ জাতির উপর প্রথম যুগের শ্রদ্ধাকে নিঃশেষিত হতে দিতে চান না

কিন্তু এঁরাও শেষ পর্যন্ত ইংরাজ ও পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রতি কবির মুমূর্ষু বিশ্বাসের শেষরক্ষা করতে পারলেন না—যখন দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে য়ুরোপ তার কুৎসিততম বিভীষিকারূপ নিয়ে আত্মপ্রকাশ করল।

ইংরেজকে ভারত সাম্রাজ্য ত্যাগ করে একদিন যেতেই হবে। কিন্তু যাবার দিনে সে এক লক্ষ্মীছাড়া কঙ্কালসার দীনতার আবর্জনাকে রেখে যাবে। জীবনের শুরুতে পরিপূর্ণ হৃদয় দিয়ে যে বর্তমান সভ্যতাকে য়ুরোপের অন্তরের সম্পদ ও অবদান বলে কবি বিশ্বাস করেছিলেন বিদায়ের দিনে সে বিশ্বাস একেবারে দেউলিয়া হয়ে গেল। মানবজাতির কোন এক পরিত্রাণকর্তার আসন্ন আবির্ভাবের প্রত্যাশাই এখন কবির একমাত্র অবলম্বন।

মানুষের প্রতি বিশ্বাস হারানো পাপ। সে বিশ্বাস শেষ পর্যন্ত রক্ষা করতে হবে। মনুষ্যত্বের অন্তহীন প্রতিকারহীন পরাভবকে চরম বলে বিশ্বাস করাকে কবি অপরাধ বলে মনে করেন।

তাই কবি আশ্বাস দিয়েছেন সভ্যতার বর্তমান সংকট ভারতেরই দারিদ্র্য-লাঞ্ছিত কুটীরে কোন মহামানবের আবির্ভাবের দ্বারা অপসৃত হবে।

'বাতায়নিকের পত্র'

'বাতায়নিকের পত্র' ৩৪ পৃষ্ঠাব্যাপী অপরিমিত দীর্ঘ প্রবন্ধ। এর যথাসম্ভব সংক্ষিপ্ত সারাংশ নিম্নরূপ ঃ

জীবনের অস্তিত্ব বা সত্তা কিসের অহঙ্কারে টিকে আছে? এই

জগৎ ও প্রকৃতির মধ্যে জীবনচক্রের এই যে অহরহ গতি, কিসের টানে আর তাগিদে তা চিরন্তন ? —শক্তি অথবা প্রেম কোন্ ইচ্ছায় জীবনের অনন্ত পরিক্রমণ ?

য়ুরোপ মনে করে—শক্তি ও বীর্যেই এই সত্তার অস্তিত্ব—Survival of the fittest। জীবন অনবরত বিরোধ ও সংঘাতের মধ্য দিয়ে লড়াই করতে করতে এগিয়ে চলেছে ; অধিকার ও ভোগ করতে করতেই বেঁচে আছে—Struggle for existence—এই তার প্রত্যয়। তাই য়ুরোপে এত পলিটিক্স, এত ডিপ্লোম্যাসি, তাই সে এমন হিংস্র, এমন সাম্রাজ্যবাদী।

মধ্যযুগের বাংলায় একবার এই শক্তিপূজা দেখা দিয়েছিল। একালে আবার আমাদের মধ্যে শক্তির প্রতি সেই শ্রদ্ধা ফিরে আসছে। শক্তি নয়, প্রেমেই যে জীবনের গতি ও স্থিতি, আনন্দময়ের আনন্দেই যে মানবসত্তার পরমমূল্য, এই সত্য দম্ভভরে অস্বীকার করা হচ্ছে। কিন্তু জীবনের কৃতার্থতা কখনো শক্তিসাধনায় হতে পারে না। শিবের বা অমৃতের উপাসনাতেই রয়েছে যথার্থ শান্তি ও সত্য।

শক্তিই যদি জীবনসত্তার সত্য পরিচয়, তাহলে শক্তিমান য়ুরোপের শান্তি নেই কেন ? ভারতবর্ষ না হয় দুর্বলতার জন্য হাহাকার করে। য়ুরোপে কেন এত আতঙ্ক ? য়ুরোপ কেন ঘটা করে শান্তিসম্মেলন করে ?

শক্তিমানের মনস্তত্ত্বের মূল হোল লোভ। লোভ-ই য়ুরোপের আদি রিপু। দুর্বল ব্যথা পাবে বলে ভীরু, সবল বাধা পাবে ভেবে সদা উদ্বিগ্ন। য়ুরোপের ভীরুতা এজন্য, তাই জাপানকে তার ভয়—তাই সে পীতাতঙ্কগ্রস্ত।

য়ুরোপের পলিটিক্সের গোড়ার কথা লোভ। ভারতবর্ষ কখনো ঐ রিপুতোষণের পথে স্বরাজ পাবে না। দুঃখজয় করাই ভারতের বর্তমান সাধনা।

য়ুরোপে এক হাস্যকর শান্তিবৈঠক চলছে। যে নির্লোভ তার

পক্ষেই শান্তিকামিতা শোভন। ভোগী ও লোভী য়ুরোপে শান্তি স্থাপনের নামে পিষ্টকবণ্টনকারী বানরের ভূমিকা নিয়েছে।

হাতির পক্ষে চোরাবালির মতো দুর্বলই সবলের সর্বনাশ ঘনিয়ে তোলে। তাই এশিয়া ও আফ্রিকার মতো দুর্বলেরাই সবল য়ুরোপের অশান্তি ও উদ্বেগের কেন্দ্র।

য়ুরোপের পলিটিক্স ভারতের পক্ষে ত্যাজ্য। কিন্তু ঐ পলিটিক্সের নেশায় এদেশের বহুলোক মজেছে এবং মজতে চাইছে। কিন্তু পলিটিক্স করে এদেশের কিছু হবে না। দুঃখ ও আঘাত দ্বারাই হবে এজাতির আত্মশক্তির উদ্বোধন।

মঙ্গলকাব্যের যুগে যেমন আমরা ধর্মবুদ্ধির নিদারুণ অপমৃত্যু ঘটিয়ে তখনকার রাষ্ট্রব্যবস্থার অনুকরণে পৌরুষ ও বীর্যচর্চার প্রত্যক্ষতা বাদ দিয়ে স্বপ্নে শক্তিপূজার মন্ত্রণা পেতাম, তেমনি বর্তমান কালেও শক্তিপূজার নামে আমরা কেবল 'মা মা' করে আর্তনাদ করছি। ইংরাজশাসক আমাদের উপর যে বর্বর পীড়ন করছে পাল্টা শক্তিমত্তা দেখিয়ে নয়, মার খেয়ে পরোয়া না করার বীর্য দেখিয়েই তার প্রতিবাদ করতে হবে। ঐ পশুশক্তিকে আমরা ঘৃণা করব; কিন্তু অনুসরণ করে খেলো হব না।

য়ুরোপীয় শক্তির বীভৎসতার জন্য বিশ্বজোড়া যে সভ্যতার সঙ্কট দেখা দিয়েছে, দুর্বল জাতি হলেও ভারতবর্ষেরও এর জন্য কর্তব্য আছে। অপরের বিরুদ্ধে কেবল নালিশ জানানো অক্ষমতার পরিচায়ক বলেই লজ্জাকর। ভারতবর্ষের নিজেরও প্রচুর দায়িত্ব আছে। আগে তার ঘর সামলান দরকার। আমাদের স্ব-সমাজে পদে পদে অসাম্য ও দাসত্ব বজায় রেখে বিদেশী শাসকের কাছে কোন মুখে আমরা সাম্য ও স্বাধীনতার দাবী করতে পারি ভেবে দেখতে হবে। হিন্দু-মুসলমানের সাম্প্রদায়িকতা, জাতিভেদ ও বর্ণভেদ প্রথায় এদেশ জর্জরিত। এর থেকে তাকে আগে মুক্ত হতে হবে। এদেশে মানুষ যেদিন হীনম্মন্যতা ত্যাগ করে ধর্ম ও কর্মবুদ্ধিতে একত্রিত এবং আধ্যাত্মিক শক্তিতে সঞ্জীবিত হবে, সেদিন রাজনৈতিক

স্বাধীনতাও আসবে। আপাতত ভারতবর্ষকে আত্মশুদ্ধির জন্য দুঃখভোগ করতেই হবে। সেই হবে তার সাধনা।

বিবেচনা ও অবিবেচনা

ভারতবর্ষে যুবশক্তির অপচয়ই এজাতির দুর্গতির কারণ। স্বদেশী আন্দোলনের যুগে বাংলায় যথার্থই যুবশক্তির উদ্দীপনা আত্মপ্রকাশ করেছিল, কিন্তু সে প্রাণ-গঙ্গা অনতিবিলম্বে হেজেমজে গেছে। এর কারণ—স্থবিরতা ও জরাই ভারতের প্রকৃতি। ভারতবর্ষ বিবেচকদের অর্থাৎ প্রবীণদের দেশ। নিষেধ করা এবং জীর্ণজরাগ্রস্ত পুরাতনকে সনাতন নাম দিয়ে মান্য করতে বাধ্য করাই প্রবীণ বিবেচকগণের কর্ম। আবার এই স্থবিরতা, অকর্মন্যতা ও তামসিক অলসতা নিয়েই তার দেমাক। প্রবীণ এর নাম দেন আধ্যাত্মিকতা। আত্মা নিয়ে শ্লাঘা করা এবং য়ুরোপকে দেহবাদী, ভোগসর্বস্ব, স্থূলের উপাসক বলে গালি দেওয়া ও তাচ্ছিল্য করা ভারতীয় প্রাচীনপন্থী প্রবীণদের মজ্জাগত অভ্যাসে দাঁড়িয়েছে।

য়ুরোপ এ নিন্দাবাদে ভ্রূক্ষেপ করে না, কেননা তার প্রকৃতিতে নৈরাশ্য ও অবসাদ নেই। নৈরাশ্যের কথাটা তাঁদের প্রিয় খেলার সামগ্রী।

ভারতের সমাজে অনন্ত আকাশভরা নিষেধ। কেবল সংহিতা, শাস্ত্র আর আচারের খাঁচায় গোটা জাতির প্রাণ বাঁধা। বিধাতার দেওয়া প্রাণের বেগ ও কর্মশক্তিকে ট্রাডিশন আর ভক্তির দোহাই দিয়ে সে ডুবিয়ে দেয়।

অথচ এই অকর্মন্যতা ও কূর্মবৃত্তি চিরকালের নয়। ইতিহাস সাক্ষী—এককালে ভারতে কি বিরাট কর্মযজ্ঞ হয়েছে—দ্বীপময় ভারত, সিংহল, ম্যাসিডোনিয়া, আরব, চীন, রোমের সঙ্গে পণ্য ও সংস্কৃতির বিনিময়ে কি নিবিড় নাড়ীর যোগই না ভারতের ছিল। মহাভারতও সাক্ষ্য দেবে যে ভারতীয় সমাজ কত সজীব, কত প্রবল, কত কৌতূহলী ও কত দুঃসাহসিক ছিল।

সভ্যতা মাত্রই দুঃসাহসের সৃষ্টি। শক্তি, বুদ্ধি, আকাঙ্ক্ষার দুঃসাহস। দুঃসাহসের মধ্যে একটা প্রবল অবিবেচনা আছে। কিন্তু এ অবিবেচনাটুকু না থাকলে কোন দুর্লভই দুর্গম জগত থেকে আহৃত হত না।

যৌবন অবিবেচক দুঃসাহসিক কর্মশক্তির আধার। ভারতে এই যৌবনকে নিশ্চেষ্ট ও নিষ্পিষ্ট রাখা হয়, অবিবেচনার ভয়ে তারুণ্যকে প্রাণধর্ম থেকে নিরস্ত রাখা হয়—তাকে প্রচণ্ড প্রবল কর্মকাণ্ডে ঝাঁপ দিতে দেওয়া হয় না। ফলে যৌবনের অবরুদ্ধ সৃষ্টির আবেগ দুষ্কর্মে, উচ্ছৃঙ্খলতা বা সন্ত্রাসবাদী কর্মের গোপন সুড়ঙ্গ পথে আত্মপ্রকাশ করতে চায়।

যৌবনের অপঘাত মৃত্যুর এই শোচনীয় দশা ঘটেছে ভারতবর্ষে। কিন্তু আর এই তারুণ্যকে নিশ্চেষ্ট রাখা যাবে না। অবিবেচনার বেগেরই আজ প্রয়োজন। বিবেচনার সংযমও অবশ্য চাই, কিন্তু যৌবনকে নির্বাসিত রাখা চলবে না। কর্মোদ্দীপনায়, বিচিত্র সৃষ্টিকর্মের অজস্র চরিতার্থতায় তারুণ্যের ও নব যৌবনের জয় হোক।

লোকহিত

লোকহিত করারও অধিকারী ভেদ থাকা চাই। অনুগ্রহের বদলে ভালবাসা থাকলেই লোকসেবার অধিকার বর্তায়। 'ভদ্র' লোকদের 'ছোট'লোকদের দয়া করাই এদেশে জনসেবা হয়ে দাঁড়িয়েছে। যথার্থ লোকহিত করা হবে যদি ছোট বড়র ভেদ-বোধটিই লুপ্ত করা যায়;—যদি সর্বশ্রেণীর মানুষেব সঙ্গে উচ্চশ্রেণীর ভাগ্যবানদের সামাজিক আত্মীয়তা স্থাপন করতে দ্বিধা না আসে। এই শ্রেণীহীন আত্মীয়তা সৃষ্টি হবে সেদিন যখন লোক-সাধারণ এদেশে আর কৃপাপাত্র থাকবে না, তারাও যেদিন শক্তিমান ও মর্যাদাবান হবে। লোক-সাধারণকে আত্মমর্যাদাসম্পন্ন ও আত্মশক্তি-বোধে উদ্বুদ্ধ করে তুলতে হোলে সর্বাগ্রে তাদের শিক্ষিত করতে হবে। অতএব লেখাপড়া শেখানই বর্তমানে যথার্থ লোকহিত; নতুবা খয়রাতী

বদান্যতা দেখিয়ে, উপর থেকে উপকার করার আত্মাভিমান নিয়ে কিছু হবে না।

সত্যের আহ্বান

আত্মশক্তির উদ্‌বোধনই যথার্থ স্বরাজ-সাধনা। অন্তঃকরণের সাধনাহীন অধিকার ভিক্ষা তথা আবেদন নিবেদনের ডালি নিয়ে দুর্বলের সবলের দ্বারে কাঙ্গালপনা অথবা সন্ত্রাসবাদ সৃষ্টি করে দুর্বলের কৃত্রিম শক্তিপূজা অথবা নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধের নামে অসহযোগ, বিদেশী মাল বর্জন, বিদ্যালয় ত্যাগ ইত্যাদি গান্ধীবাদী পন্থা—কোনটাই স্বাধীনতা অর্জনের সত্যপথ নয়।

কেবল বিদেশীর প্রতি ক্রোধ পুঁজি করে দেশপ্রেম সৃষ্টি হয় না। সে তো নাস্তিকতা। লোভ, ক্রোধ, ঈর্ষা, ভয় এসব প্রবৃত্তি উস্কে দেশপ্রেম জাগান ফলহীন।

দেশকে জানলেই দেশকে ভালবাসতে মন চায়। আপনার মধ্যে দেশের ধর্ম, ভাষা, ঐতিহ্য ও সত্যকে আস্তিক্যভাবে অনুভব করতে হয়। দেশ কেবল জন্মাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত ভূমিখণ্ড নয়, দেশ আত্মার আধার। যে দেশকে মানুষ আপনার জ্ঞানে, বুদ্ধিতে, প্রেমে, কর্মে সৃষ্টি করে নেয়, সেই দেশই তার স্বদেশ।

বঙ্গ-বিভাগের উত্তেজনার দিনে যে যুবকদল রাষ্ট্রবিপ্লব ঘটাতে চেয়েছিল তাদের স্বাদেশিকতা সংশয়হীন; তবু তা ভ্রান্ত। কেননা ঐ পন্থার সঙ্গে দেশবাসীর সহানুভূতি ছিল না; আবার জাতিকে আত্মনির্ভরশীল ও উৎপাদনক্ষম করে না তুলেই বিদেশী মাল বর্জনের গান্ধীবাদও ভ্রান্ত। ধর্মের দোহাই দিয়ে এই কাজ করা আরো জঘন্য। রাষ্ট্রনীতির সঙ্গে ধর্মকে মিশিয়ে দেওয়া বা রাজনীতির স্বার্থে মানুষের ধর্ম-সংস্কারের আবেগকে কাজে লাগানর গান্ধীনীতি বর্জনীয়।

যেন তেন প্রকারে স্বরাজলাভের আগ্রহও একটি দেশপ্রেমের আদর্শমোড়া লোভরূপ রিপু। মহাত্মাজী এই রিপুকে প্রশ্রয়

দিয়েছেন। কাপড় পোড়ানোর মতো ধ্বংসাত্মক নেতিবাদী বা চরকা কাটলেই স্বরাজলাভ, এমনি সঙ্কীর্ণ অস্তিবাদী পন্থায় দেশের মুক্তি হতে পারে না।

আসলে ভারতের মুক্তি আসবে পরপরায়ণ পলিটিক্সকে বর্জন করে। সঙ্কীর্ণতা, প্রথা ও নিষেধের সনাতন অচলায়তন ভেঙ্গে ফেলে এবং য়ুরোপের বড়োপ্রাণ মানুষগুলির সংস্পর্শে এসে শুভবুদ্ধির দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে সকল ভেদবোধ বিসর্জন দিতে পারলে—পরমেশ্বরের আহ্বানে প্রাচ্য ও প্রতীচ্য নিশ্চয় মিলিত হবে, আর স্বরাজও তখন অবলীলায় মিলবে।

ছোট ও বড়

'ছোট' ও 'বড়'র ভেদ-জ্ঞানই যত অকল্যাণ ও অনাচারের মূল। ইংরাজের বিরুদ্ধে আমাদের বিতৃষ্ণার হেতু থাকলেও সব ইংরাজই মন্দ নয়। ইংরাজের মধ্যেও 'বড়' প্রাণ আছে। আমলাতান্ত্রিক 'সিবিলিয়ন' ইংরাজরা ছোট বা হীনমনা ইংরাজদের প্রতিনিধি। অপরপক্ষে ভারতের জাতিভেদ প্রথাও নানা ছোট ও বড় শ্রেণী সৃষ্টি করেছে। এই শ্রেণীবিদ্বেষই সর্বনাশের মূল।

আমাদের স্বরাজ-সাধনায় যেন জাতিবৈরভাব দেখা না দেয়। সন্ত্রাসবাদ পরিত্যাজ্য, যেহেতু তা মানবতাবিরোধী। ইংরাজ বলেই ইংরাজের বিরুদ্ধে অশ্রদ্ধা ঠিক নয়। স্বদেশী উন্মাদনায় আমরা যেন এই সঙ্কীর্ণ 'ন্যাশনালিজম'কে প্রশ্রয় না দেই। জাতিবৈরিতা নয়—স্ব-সমাজে ছোট ও বড়-র বিভেদ ভুলে শক্তি অর্জন ও শান্তি স্থাপন করতে পারলে, তবেই স্বরাজ সাধনা সার্থক হবে।

বৃহত্তর ভারত

হিন্দু বৌদ্ধযুগে ভারতবর্ষ আপন ভৌগোলিক পরিধিতে আবদ্ধ ছিল না, তার আধ্যাত্মিক সম্পদ সে দ্বীপময় ভারত তথা চীন, জাপান,

সিংহলে উদারভাবে ছড়িয়ে দিয়েছিল। ভারতকে আজ নিজের আত্মার আদর্শ সন্ধান করতে যেতে হবে ঐ বৃহত্তর ভারতে—কিন্তু কোন অহমিকা নিয়ে নয়। আত্মানুসন্ধানের এই তীর্থ-যাত্রায় ভারত তার যথার্থ স্বরূপ যখন দেখতে পাবে, তখন বুঝবে যে—

'যস্তু সর্বানি ভূতানি আত্মন্যেবানুপশ্যতি
সর্বভূতেষু চাত্মানাং ন ততো বিজুগুপস্তে"

এই উপনিষদীয় বাণীমন্ত্রই তার শাশ্বত সাধনা।

রবীন্দ্রনাথের রাষ্ট্রাদর্শ

যে ক'টি প্রবন্ধের সারাংশ দেওয়া হয়েছে তা থেকে রবীন্দ্রনাথের রাষ্ট্রনৈতিক আদর্শের যে পরিচয় পাওয়া গেছে তা এই রকম: বিশ্বমানবতার ধারণা বা ঐক্যবোধই মনুষ্যত্বের সাধ ও সাধনা এবং আন্তর্জাতিকতাবোধের উজ্জীবন দ্বারাই কেবল এই সাধনার সিদ্ধি সম্ভব। একটি মাত্র মনুষ্যজাতি গঠনের দিকে চলেছে মানব সভ্যতার প্রগতি ও পরিণাম। জাতিয়তাবাদ বা নেশন-থিয়রী এই জাতিসংঘ গঠনের পরিপন্থী। তাই তা মানবতার প্রতি পাপ। বিশেষত জাতিয়তাবোধই জাতিবৈরভাব এনে যুদ্ধ সৃষ্টি করছে। পুঁজিবাদ ও অতিরিক্ত যন্ত্র-নির্ভরতা জন্ম দিচ্ছে স্বৈরতন্ত্রের। বিজ্ঞানের ও যন্ত্র-সভ্যতার প্রগতি যদি বর্তমান সীমায় সংযত না হয়, তাহলে পুঁজিবাদ ও সাম্যবাদের সংঘাতে কয়েক সহস্র বৎসরের সাধনায় গড়ে ওঠা বর্তমান মানব সংস্কৃতি ও মানব জাতির বিনাশ আসন্ন হয়ে আসবে। বিগত দু'টি মহাযুদ্ধের অমানুষিক বর্বরতায় ক্ষুব্ধ কবিচিত্ত বিশ্বমানবের এই ট্রাজিক পরিণতির সম্ভাবনায় বেদনার্ত হয়ে উঠেছে এবং 'কালান্তর'ও 'সভ্যতার সংকট' প্রবন্ধ দুটিতে বিশ্বমানবের এই ভয়াবহ দুর্যোগের, এই মহতী বিনষ্টির আশঙ্কায় উদ্বেল হয়ে সতর্কবাণী ধ্বনিত করেছে। অবশ্য রবীন্দ্রনাথ ঔপনিষদিক কবি, তিনি মানুষকে জেনেছেন অমৃতের পুত্ররূপে, তাই তিনি শেষ পর্যন্ত—মানবজাতি

এই. আত্মঘাতী, পুঁজিবাদী, যুদ্ধবাজ রাষ্ট্রনীতির শয়তানী থেকে মুক্তি পাবে, কোন না কোন মহামানবের আবির্ভাবের মধ্য দিয়ে মানব-জাতি তার পরিত্রাণ ও নবজন্ম লাভ করবে, এই মহান আশার বাণী শুনিয়েছেন। আধুনিক বিজ্ঞান-নির্ভর রাষ্ট্রনীতি মানুষকে করেছে অমিত বিক্রমশালী। কিন্তু এই অমিতবীর্য যদি মানব-কল্যাণে অমৃতবীর্যশীলা না হয়, তাহলে এই এত হাজার বছরে গড়ে তোলা মানব সভ্যতার পরিণতি আত্মনাশ বই নয়। অমিতবীর্যশালী প্রতীচ্য অমৃতবীর্যশালী প্রাচ্যের সঙ্গে মিলিত হোক।

বিশ্ব রাজনীতি ব্যতীত ভারতের নিজস্ব রাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রেও কবি একইরূপ আদর্শ অনুসরণ করেছেন। ভারতবর্ষকেই তিনি বিশ্বভ্রাতৃত্ব ও সর্বজাতি সমন্বয়ের আদর্শ স্থাপনের যোগ্যতম ক্ষেত্র মনে করেছেন। নিশ্চিত বিনাশের পথে ক্রমাগ্রসরমান যুযুৎসু পাশ্চাত্যজাতিগুলিকে হিংসা, জিগীষা ও জিঘাংসা বৃত্তি থেকে শান্তির পথ ভারতবর্ষই প্রদর্শন করতে পারবে, এই ছিল তাঁর প্রত্যয়। কিন্তু ভারতবর্ষ বিশ্বকে তার ঐতিহ্যলোক থেকে যেমন এই শান্তি দিতে পারবে, তেমনি তৎপূর্বে তাকে পাশ্চাত্যলোক থেকে সমৃদ্ধি অর্জন করে নিতে হবে, কেননা পাশ্চাত্যের সঙ্গে সমান ঐশ্বর্যবান না হোলে দীনের কাছ থেকে ধনী কখনো দান গ্রহণ করবে না। আর ভারতবর্ষকে যদি য়ুরোপের সমান সমৃদ্ধ হতে হয়, তাহলে প্রথমেই তাকে গ্রহণ করতে হবে য়ুরোপের বিজ্ঞান আর যন্ত্র সভ্যতাকে, তার কারিগরী আর অর্থকরী বিদ্যাকে করতে হবে আত্মসাৎ। য়ুরোপের পক্ষে যে বিজ্ঞান ও যন্ত্ররাজের আরো অগ্রগতি বিশ্বসভ্যতার পক্ষে ফ্রাঙ্কেনস্টাইনের মতো ভয়ঙ্কর ও আত্মঘাতী হয়ে উঠেছে, ভারতের পক্ষে তারই প্রয়োজন এখন সর্বাগ্রে। সনাতন ভারতের জরাজীর্ণ শাস্ত্রাচার, সংস্কারের বেড়াজাল, এবং অবিদ্যা থেকে বেরিয়ে এসে ভারতবর্ষকে অসঙ্কোচে এবং দ্রুতবেগে কারিগরী ও বিজ্ঞান-বিদ্যায়

দক্ষতা অর্জন করে জাতীয় সম্পদের পূর্ণ ব্যবহার দ্বারা আর্থিক সংকট থেকে মুক্ত হতে হবে।

দ্বিতীয়ত, ইংরাজকে বিতাড়নের জন্য বিদেশী মাল বর্জন, অসহযোগ, সত্যাগ্রহ প্রভৃতি অহিংস এবং অনুশীলনবাদীদের সন্ত্রাসবাদ, কোনটাই বাঞ্ছনীয় নয়। চরকা-সত্যাগ্রহ-অসহযোগ অথবা সশস্ত্র বিপ্লব, কোনটাই ভারতের মুক্তিসাধনের পক্ষে যথেষ্ট ও সঙ্গত পথ নয়; এবং নির্বিচারে ইংরাজ জাতির বিরুদ্ধে ঘৃণার ভাব পোষণও স্বরাজলাভের সহায়ক নয়। আমলাতান্ত্রিক ইংরাজদের বাদ দিয়ে মহৎপ্রাণ ও সংস্কৃতিবান একদল ইংরাজও আছেন। তাঁদের কাছ থেকে যা গ্রহণযোগ্য, তা নিতে হবে। ব্যাপক জনশিক্ষা বিস্তার দ্বারা জাতিকে আত্মশক্তিতে উদ্বুদ্ধ করতে পারলে, পাশ্চাত্য ও প্রাচ্য শিক্ষাদর্শের মিলনে একটি পূর্ণ শিক্ষা ব্যবস্থায় ভারতবাসীগণ যখন আত্মনির্ভরশীল, হীনম্মন্যতামুক্ত ও সম্পদ সৃষ্টিতে পরিশ্রমী ও কুশলী হয়ে উঠবে, তখন সেই নবজাগ্রত আত্মশক্তি-উদ্বুদ্ধ জাতির বীর্যকে আমলাতান্ত্রিক বিদেশী রাজশক্তি কোনক্রমেই পরাধীন করে রাখতে পারবে না। জাতির শিক্ষা, সাহিত্য, শিল্প এবং সম্পদের একইকালে সমৃদ্ধি না ঘঠলে অর্থাৎ জাতির অশিক্ষা ও দারিদ্র্য না ঘুচলে, গান্ধীজীর অহিংস বা নেতাজীর সহিংস,—কোন পথেই ভারতের স্বরাজ-সাধনা সার্থক হবে না এবং যদিও ইংরাজের দয়ার দান হিসাবে সেই পঙ্গু স্বরাজ আমরা পাই, তার যথার্থ আশীর্বাদ ও আনন্দ থেকে দেশবাসী বঞ্চিত থেকে যাবে; এই ছিল রবীন্দ্রনাথের প্রত্যয়। 'কালান্তর', 'স্বদেশ', 'ইতিহাস', 'পরিচয়', 'রাশিয়ার চিঠি' প্রভৃতির প্রবন্ধাবলীতে নানাভাবে এই বিশ্বাসই তিনি ব্যক্ত করেছেন।

'কালান্তরে'র তাৎপর্য

'কালান্তর' এবং 'সভ্যতার সংকট' প্রবন্ধ দু'টি আট বৎসরের ব্যবধানে রচিত। সত্তর বৎসর এবং আশি বৎসরের জন্মদিনে যথাক্রমে ১৯৩৩ এর জুলাই এবং ১৯৪১ এর মে মাসে প্রদত্ত এই অভিভাষণ দুটির

ভাবাবেগ এবং বক্তব্য সম্পূর্ণ এক, এমন কি স্থানে স্থানে ভাব পর্যন্ত এক। 'কালান্তর' গ্রন্থের শুরু ও সারার রচনা দুটির এই সর্বাঙ্গীন সাদৃশ্যই গ্রন্থখানির সংহতি। কি করে ইংরেজ য়ুরোপের চিত্তদূত বা চিত্ত-প্রতীকরূপে এসে আমাদের হৃদয়ের দেবতা হয়ে বসল এবং কি ভাবেই বা এক শতাব্দীর ব্যবধানে সে আমাদের হৃদয়-সিংহাসন থেকে ধূলায় নিক্ষিপ্ত হোল—তারই ইতিহাস আশ্চর্য সংযত অথচ সঙ্গত ভাবে বলা হয়েছে। উনিশ শতকে ইংরাজ সভ্যতা ও সংস্কৃতি, জ্ঞান ও বিজ্ঞান, সত্য ও ন্যায়ের প্রতিনিধি রূপে আমাদের চিত্ত জয় করল আর বিশ শতকে প্রথম মহাযুদ্ধের সময় থেকে সে তার আসল দাঁতাল রূপ প্রদর্শন করে বিচ্ছেদ নিয়ে এল—পাশ্চাত্য সভ্যতার মোহ ভাঙ্গার এই কাহিনী এই দুই প্রবন্ধে। 'কালান্তর' আর 'সভ্যতার সংকট'-এর নামগত তাৎপর্যও এক। 'কালান্তর' হোল উনিশ থেকে বিশ শতকে কালের বিবর্তন এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে সভ্যতার রূপ-বদল, নির্মোক উন্মোচন। উনিশ শতকে যে সভ্যতার সত্য, সৌন্দর্য ও মধুর মূর্তি দেখে আমরা আনন্দে, উল্লাসে মুগ্ধ ও অনুপ্রাণিত হয়েছি, বিশ শতকে সেই সভ্যতার ব্যাভিচারিক, কুৎসিত ও ব্যাধিগ্রস্ত দেহের উন্মোচনে ঘৃণায় শিহরিত হচ্ছি। এই যে কৃতান্ত-রূপ, কালান্তরে সভ্যতার এই যে সংকট, এই যে মুমূর্ষুতা—এরই ট্রাজেডি ও আয়রনি, এই অপমৃত্যু ও ভীতিবিহ্বল শোচনীয়তার বাণীরূপ এই প্রবন্ধ দুটি। অবশ্য অভয় এই, কবি এই সভ্যতার আত্মঘাতী মৃত্যুর পর, কোন এক পরিত্রাতার আবির্ভাবের মধ্য দিয়ে মানবসভ্যতার নব অভ্যুদয়ের আশ্বাসও দিয়েছেন। কিন্তু সে আশ্বাসে যুক্তির ভরসা কিছু নেই, আছে কেবল আবেগ, আছে আধ্যাত্মিক প্রত্যয়ের শক্তি।

কত অল্প কথায় কবি এই দুটি প্রবন্ধে উনিশ থেকে বিশ শতক পর্যন্ত একটি শতাব্দীর ইতিহাস বিবৃত করেছেন, ভাবলে বিস্মিত হতে হয়। ইংরেজের ও য়ুরোপের প্রতি আমাদের মনোভাবের ক্রমবিকাশের প্রতিটি পর্ব কি সূক্ষ্মভাবেই না অভিব্যক্ত হয়েছে।

পাশ্চাত্য সভ্যতার সংস্পর্শে ভারতের নবজাগরণ এবং পশ্চিমের প্রতি বিপুল বিস্ময় ও মুগ্ধ আত্মনিবেদন কেমন করে কত দ্বিধা ও সংশয়ের মধ্য দিয়ে সম্পূর্ণত মোহমুক্ত হোল—তার মনস্তত্ত্ব, তার গভীরতম ইতিবৃত্ত এই দুটি রচনায় যেভাবে প্রাবন্ধিক রবীন্দ্রনাথ বর্ণনা করেছেন, সেটুকু বর্ণনা করতে বাংলার কত লেখক মহাভারতোপম গ্রন্থ প্রকাশ করেছেন।

তাছাড়া রবীন্দ্রনাথের সত্যসন্ধতা বিস্ময়কর। অপরিসীম আত্মশক্তি থাকলেই এমন সত্যসন্ধ হওয়া যায়। যে যুগে ভারতের আকাশ-মাটি ইংরেজ বিদ্বেষে ও জাতিবৈরভাবে জর্জরিত, যখন স্বাধীনতার জন্য ভারতবর্ষ উন্মাদ-প্রায়, যখন সভ্যতা, মানবধর্ম, ন্যায় ও সত্যের বাণী শোনার মতো মানসিক স্থৈর্য ও শিক্ষা একজন ভারতবাসীরও ছিল না, তখনও রবীন্দ্রনাথ বলিষ্ঠভাবে আপনার অন্তরের বাণী সোচ্চারে ঘোষণা করে গেছেন। রবীন্দ্রনাথের রাষ্ট্র-নৈতিক মতবাদমূলক নিবন্ধগুলির প্রায় কোনটিতে য়ুরোপ ও ইংরেজ শাসকের প্রতি ঘৃণা ও বিদ্বেষ প্রচারিত হয়নি—অথচ ধিক্কার ও প্রতিবাদ প্রতিধ্বনিত হয়েছে প্রতি ছত্রে—কিন্তু তার চেয়েও বেশি হয়েছে আত্মবিচার ও আত্মবিশ্লেষণ। ভারতবর্ষের বর্তমান গ্লানি, দুর্গতি ও অবমাননার জন্য বিদেশীদের চেয়ে আমরাই যে বেশি দায়ী, সেই অপ্রিয় কথাটা তিনি পদে পদে স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন। ভারতবর্ষের স্থবিরতা, জরা, অশিক্ষা, দারিদ্র্য ও সংকীর্ণতাই বিদেশীকে এখানে ডেকে এনেছে, আদরে লালন করেছে। গুপ্তযুগের পর থেকেই ভারতে কূর্মবৃত্তি বা আত্মসংকোচের স্বভাব আত্মপ্রকাশ করে। সভ্যতার বদলে তখন মনু প্রভৃতি শাস্ত্রকারগণের কতগুলি সদাচার এখানে যুগ যুগ ধরে অনুবৃত্ত হতে শুরু করে। তারপরও সংহিতার বিশ্বস্ত অনুসরণের ফলে হাজারটা বর্ণ, জাতি ও শ্রেণীভেদের সৃষ্টি হয়; আর সেই ভেদাভেদের ডামাডোলে মনুষ্যত্বের ন্যূনতম আদর্শ-টুকুও এখান থেকে বিদায় নেয়। অকর্মণ্যতা, তামসিকতা, আলস্য ও রুচিহীন চরিত্রহীনতায় গোটা দেশ ছেয়ে যায়। এই অবস্থায় বিদেশী

বণিকের মানদণ্ড রাজদণ্ডে রূপান্তরিত হয়ে থাকলে, সে দায়িত্ব আমাদেরই।

অতঃপর স্বদেশী আন্দোলনের যুগে আমরা আমাদের জাতীয় চরিত্রের অধোগতি রোধ না করে কতগুলি বাহ্যিক পন্থায় স্বাধীনতা-লাভের চেষ্টা করলাম। একদল সন্ত্রাসবাদ, অন্যদল সত্যাগ্রহবাদে গেলেন। কিন্তু ঘর না সামলে পরকে যে ঘরের বার করা যাবে না, কেউ তা বুঝতে চাইলেন না। দারিদ্র্য ও অশিক্ষা পল্লী-সংগঠনের দ্বারা দূর না করলে, য়ুরোপীয় জ্ঞান-বিজ্ঞান, কারিগরী ও যন্ত্রবিদ্যা বিপুল উদ্যম ও আগ্রহে শিক্ষা না করলে, য়ুরোপের মতো নবযৌবনের তেজ ও বীর্য নিয়ে কর্মযজ্ঞে ঝাঁপিয়ে না পড়লে, কিছুটা অবিবেচক ও দুঃসাহসিক না হোলে এবং সর্বোপরি প্রাচীন ভারতীয় মানবধর্ম বা মনুষ্যত্বের ঐক্যবোধ অর্থাৎ আধ্যাত্মিক শক্তিতে উদ্বোধিত না হোলে, স্বরাজ চরিতার্থ হতে পারে না—এই কথাই রবীন্দ্রনাথ জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত ঘোষণা করেছেন। রবীন্দ্রনাথের আত্মবিশ্লেষণ অর্থাৎ স্বজাতির চরিত্র সমালোচনামূলক এ প্রবন্ধগুলি, রচনার সময়ে ভারত বাসীর আদৌ ভালো লাগেনি। তাই সেদিন রবীন্দ্রনাথকে 'প্রতিক্রিয়াশীল', 'ইংরাজানুরক্ত', 'স্বদেশী আন্দোলন থেকে পলাতক' ইত্যাদি বহু কঠোর সমালোচনা সহ্য করতে হয়েছে। কিন্তু তিনি 'পলিটিসিয়ান' ছিলেন না; পলিটিক্সকে নোংরামি জানতেন—জনপ্রিয়তার কণিকামাত্র আকাঙ্ক্ষাও তাঁর ছিল না। সে জন্যই অপ্রিয় সত্য বলতে তিনি দুঃসাহসিক। রবীন্দ্রনাথের পৌরুষ ছিল প্রচণ্ড—কেবল ললিত-কোমল লাবণ্য নয়, দীপ্ত জ্যোতির্ময় পুরুষ ছিলেন তিনি—আপনার বক্তব্যকে তিনি জেনেছেন সত্যের আহ্বান। প্রত্যক্ষ রাষ্ট্রনীতির উত্তেজনা থেকে দূরে, শান্তিনিকেতনের নিভৃতে বসে তিনি প্রশান্ত প্রজ্ঞায় এই সত্যকে উপলব্ধি করেছেন। নিজেকে বলেছেন বাতায়নিক। বাতায়নে বসে তিনি ধীর ও স্থির ভাবে দেশ ও জাতির যথার্থ অবস্থাটি দেখেছেন এবং প্রকাশ করেছেন।

রবীন্দ্রনাথের রাষ্ট্রাদর্শে তথ্য ও তত্ত্বগত ভ্রান্তি ঢের থাকতে পারে;

তিনি মার্ক্সীয় বস্তুমূলক দ্বন্দ্ববাদ এবং অর্থনীতি নিয়ন্ত্রিত রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ছাত্র বা দেশনায়ক নন। একমাত্র মানব-কল্যাণের আবেগ দিয়েই তিনি রাষ্ট্রনীতির বিচার করেছেন; পলিটিক্সকে তিনি বলেছেন অসৎশাস্ত্র। দেশপ্রেমের নামে ন্যাশনালিজমকে বলেছেন রিপু ও পাপ। ভারতের য়ুরোপীয় ন্যাশনালিজমের প্রতি অনুরক্তি তাঁর মতে পরাসক্তি এবং ভারতের মুক্তিসংগ্রামের আদর্শ-বিরোধী। রবীন্দ্রনাথের মতো বিশ্ববিখ্যাত মনীষীর কাছে ভারতীয় স্বরাজ-সাধনা-পন্থার এমন তীব্র সমালোচনায় ভারতীয় নেতৃবর্গ ও জনসাধারণ যে কত বিব্রত ও কোন-ঠাসা বোধ করবে, কবি তা অবহিত থেকেও সত্যবাচন থেকে বিরত থাকেননি। মহৎ সত্যের জন্য তিনি সমকালীন জাতীয় ভাবপ্রবণতার স্রোতে গা ভাসাতে রাজী হননি। আশু প্রয়োজন সিদ্ধির লোভ-রিপুর থেকে তিনি সতর্ক করেছেন নেতৃবর্গকে। চিরন্তন মনুষ্যত্ব-সিদ্ধির জন্য দুঃখ-বেদনা সহ্য করার সাধনায় ভারতবাসীকে প্রবুদ্ধ করার দুরূহ সাধে তিনি তাঁর লেখনী নিয়োগ করেছেন। 'কালান্তরের' প্রবন্ধে তারই স্বাক্ষর। জাতিবাদ নয়—সর্বমানবতাবাদই তাঁর লক্ষ্য। মনুষ্যত্বের সাধারণ ধর্মের উপর ভিত্তি করে দেশেকালের সব মানুষই একটি আত্মিক সমাজ বন্ধনে নিবদ্ধ হওয়ার প্রেরণা বোধ করবে—যে শিক্ষা মানুষকে সেই ঐক্যবোধের চেতনা দেবে—তাই হোল মানবধর্ম, তাই হোল সভ্যতার পরিণতি।

রবীন্দ্রনাথ বস্তুত ধর্মাদর্শ দিয়েই রাষ্ট্রাদর্শের বিচার করেছেন। সুতরাং রাষ্ট্রবিজ্ঞানী রবীন্দ্রনাথের রাজনৈতিক মতামতের তেমন গুরুত্ব দেবেন না। রবীন্দ্রনাথের রাজনৈতিক বোধে অর্থনৈতিক চেতনা তেমন প্রখর ছিল না এবং ইতিহাসবোধও তথ্য ও বস্তুনিষ্ঠ নয়। মূলত তিনি কবি এবং মানবপ্রেমিক মহামানব—মানবকল্যাণের আদর্শ তিনি আধ্যাত্মিকভাবেই উপলব্ধি করেছেন, যার সঙ্গে রাষ্ট্র-নীতির নগ্ন বস্তুতন্ত্রের সংহতি হতে পারে না। বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে বিচার করলে রবীন্দ্রনাথের রাষ্ট্রাদর্শে বিস্তর ভ্রান্তি, অস্পষ্টতা, অসঙ্গতি এবং অসংহতি দেখা যাবে। তথাপি এও দেখা যাবে যে,

রবীন্দ্রনাথের দার্শনিক দৃষ্টিতে দেখা রাষ্ট্রাদর্শের মূল মর্মটি আশ্চর্যভাবে সত্য প্রমাণিত হচ্ছে।

রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাদর্শ, ধর্মাদর্শ এবং রাষ্ট্রাদর্শ এমন নিবিড়ভাবে সম্পৃক্ত যে একটি থেকে অন্যটি কোনক্রমেই পৃথক করা যায় না। 'কালান্তরে'র রাষ্ট্রাদর্শমূলক প্রবন্ধগুলির মধ্যে তাই 'শিক্ষার মিলন' নামক প্রবন্ধ সঙ্গত ভাবেই স্থান লাভ করেছে। প্রাচ্য ও প্রতীচ্য শিক্ষা ব্যবস্থার কোনটাই পরিপূর্ণ নয়। য়ুরোপের বিজ্ঞান ও কারিগরী বা আধিভৌতিক শিক্ষার সঙ্গে ভারতের আধ্যাত্মিক বিদ্যার মিলনেই বিশ্বমানবের মহতী কল্যাণ নিহিত। এই মিলন ইম্পিরিয়ালিজমের আত্মসাৎ নয়। এই সাংস্কৃতিক আত্মীকরণ বা স্বাঙ্গীকরণের উপযুক্ত ক্ষেত্র রূপে আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলিকে গঠন করতে হবে। আর এই শিক্ষার মিলনের মধ্য দিয়েই মানবধর্ম তথা সর্বমানবতাবাদের চেতনা সঞ্চারিত হবে। বিশ্বভারতী তিনি এরই দৃষ্টান্ত রূপে গড়ে তোলেন।

মানবতার ঐক্যবোধ অর্থাৎ মানবধর্ম হোল মানব সভ্যতার লক্ষ্য, শিক্ষার মিলন হোল এর পথ। আর, এই পথ ধরে ঐ লক্ষ্যে পৌঁছিয়ে দেওয়া হোল রবীন্দ্রনাথের রাষ্ট্রনীতি। এবং শিক্ষানীতিও বটে।

শিক্ষাদর্শ

রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাবিষয়ক প্রবন্ধগুলির কতগুলিতে তিনি প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থার কঠোর ও শ্লেষাত্মক সমালোচনা করেছেন। এগুলি নঞর্থক। কতগুলিতে তিনি সদর্থক ভাবে শিক্ষাব্যবস্থাটি কেমন হওয়া উচিত, তারই প্রাঞ্জল আদর্শটি দেখিয়েছেন। কবির আদর্শটি অল্প কথায় এই রকম: শিক্ষা আর বিদ্যা একার্থক নয়। অনিচ্ছুক ভাবে, অন্যের আগ্রহে বা আদেশে, নিতান্ত জীবিকা বা ফ্যাসনের জন্য পরীক্ষাপাসের ডিগ্রি-চিহ্ন দেওয়া যে জ্ঞানার্জন, তার বদলে ছাত্রছাত্রীর প্রাণের চাহিদা আর রুচির প্রবণতা অনুযায়ী স্বাধীন ও স্বাঙ্গীকৃত শিক্ষালাভ চাই। শেষোক্তটিরই নাম বিদ্যা। একদিকে

আধুনিক বিজ্ঞান ও কারিগরী-শিক্ষা, অপরদিকে প্রাচীন ভারতীয় শাস্ত্র ও মানববিদ্যা, দুয়েরই সমান আত্মীকরণ প্রয়োজন। বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গে বিদ্যা-ব্যবস্থার থাকবে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। বিদ্যালয় ভবনের বদলে থাকবে আকাশ-আঙ্গিনা মুক্তাঙ্গন, প্রকৃতির নিবিড় সঙ্গ ও আবেষ্টন; পেশাদার শিক্ষকের বদলে আদর্শবান শিক্ষাব্রতী গুরুদেব; বিদেশী ভাষার বদলে সর্বোচ্চ স্তর পর্যন্ত একমাত্র মাতৃভাষায় শিক্ষার মাধ্যম; পাঠ্যবিষয় নির্বাচনে স্বাধীনতা, পরীক্ষাপ্রথার অবসান এবং ছাত্রছাত্রীর প্রচ্ছন্ন প্রতিভা বা পারদর্শিতার আত্মবিকাশের সম্ভাব্য সর্বপ্রকার সুযোগ ও অবকাশ সৃষ্টি হবে শিক্ষাদর্শ। মনুষ্যত্বের বিকাশ; হৃদয়ের রস ও সৌন্দর্য বোধের উন্মেষ; নিজেকে পরিপূর্ণ মহিমময় মানুষ রূপে উপলব্ধি এবং বিশ্বজীবন ও বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গে ব্যক্তিগত ঐক্যবোধ—রবীন্দ্রনাথের ভাষায় এই 'বিশ্ববোধ' জাগ্রত করাই শিক্ষার লক্ষ্য হবে।

ধর্মাদর্শ

রবীন্দ্রনাথের ধর্ম ও দর্শনের ভাবমর্মটিও তাঁর রাষ্ট্রনীতি ও শিক্ষাদর্শের সঙ্গে অন্বিত। রবীন্দ্র-দর্শন অবশ্য প্রবন্ধ অপেক্ষা কবিতাতেই অধিকতর প্রতিধ্বনিত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের ধর্মবোধ কোন কালেই কোন প্রচলিত ধর্মমতকে অনুসরণ বা সমর্থন করেনি। তিনি হিন্দু নন, ব্রাহ্মও নন। হিন্দুধর্মের পৌত্তলিকতা, পূজা-হোম, যাগ-যজ্ঞ প্রভৃতি কর্মকাণ্ড এবং হিন্দু সমাজজীবনের বহু লোকাচার ও অভিচারকে তিনি ঘৃণা করতেন এবং তীক্ষ্ণ ভাষায় তিনি এ সকলের বিরুদ্ধাচরণ করেছেন। অপরপক্ষে, প্রথম যৌবনে তাঁকে ব্রাহ্মধর্মের পক্ষে প্রচুর অশোভন বিতর্কেও নামতে দেখা গেছে। কিন্তু বস্তুত তিনি আদৌ ব্রাহ্ম ছিলেন না। বরঞ্চ তাঁর মধ্যে বৌদ্ধভাব অনেকখানি দেখা গেছে। খৃষ্টের প্রতিও তাঁর গভীর শ্রদ্ধা ছিল। খ্রীষ্টের ও বুদ্ধদেবের প্রতি তাঁর শ্রদ্ধার সাক্ষ্য হয়ে আছে বিশেষভাবে তাঁর চরিত প্রবন্ধ দুটি। রামমোহনের চরিতকথাটিও জনৈক ধর্মদর্শনের প্রবক্তার

প্রতিই উদ্দিষ্ট। এই তিনটি চরিতকথা জাতীয় প্রবন্ধ রবীন্দ্রনাথের ধর্ম ও দর্শন বিষয়ক প্রবন্ধগুলিরই পরিপূরক। সব মিলিয়ে এই প্রবন্ধগুলি এই পরিচয়ই দেবে যে রবীন্দ্রনাথ কোন বিশেষ ধর্মাবলম্বী ছিলেন না। তিনি ধর্মকে ইংরাজী Religion-এর সমার্থক মানেন নি। Religion হোল তন্ত্র (Cult)। ধর্মকে রবীন্দ্রনাথ দুভাগে দেখেছেন, আচারধর্ম বা লোকধর্ম আর মানবধর্ম। আচার ধর্মই সাধারণ্যে ধর্ম নামে চলে। হিন্দু, বৌদ্ধ, জৈন, খৃস্ট, ইসলাম প্রভৃতি আসলে এক একটি আচারধর্ম মাত্র এবং ধর্মে ধর্মে যত ভেদ ও বিবাদ, তা এই আচার সংক্রান্ত বিভ্রান্তির ফল। নতুবা, বিশ্বমানবের মৌল-ধর্মে কোথাও বিন্দুমাত্র ভেদ নেই···মানুষের ধর্ম দেশে দেশে, কালে কালে অপরিবর্তনীয়, অবিভাজ্য ও অপৌরুষেয়। যা মানুষকে ধারণ করে অর্থাৎ রক্ষা করে বা কল্যাণ করে, তাই মানুষের ধর্ম। শাস্ত্র মানুষকে করে শাসন। কাম, ক্রোধ, হিংসা আদি রিপু বা প্রবৃত্তিগুলিকে সংযত করাই শাস্ত্র তথা আচারধর্ম অর্থাৎ আচরণ-তন্ত্র-গুলির লক্ষ্য। আর মানুষের ধর্ম হোল মনুষ্যত্বের উপলব্ধি বা মানুষের অন্তর্নিহিত অমৃতত্বের সন্ধানলাভ। 'শান্তিনিকেতন', 'ধর্ম', এবং 'মানুষের ধর্ম' গ্রন্থত্রয়ের দার্শনিক প্রবন্ধগুলিতে শাস্ত্র, তন্ত্র ও আচরণ-যন্ত্র নির্বিশেষে বিশ্ব-মানবের সঙ্গে বিশ্ব-দেবতার ও বিশ্ব-প্রকৃতির মিলনের ঐকান্তিক উপলব্ধি তথা সর্বানুভূতি ও বিশ্ব-বোধের বাণী উদ্‌গীত হয়েছে। সর্বানুভূতির অভিজ্ঞতা প্রাণে তখনই আসবে, যখন মানুষ আপনার 'অহম্'কারকে ত্যাগ করতে পারবে। 'অহম্' বা আত্ম-স্বাতন্ত্র্যবোধই বিশ্ববোধের প্রতিকূল শক্তি। অহম্-মুক্তি, বৃহৎ প্রাণের সহানুভূতি ও বিশ্বমানবতাবোধই রবীন্দ্রনাথের কাছে মানুষের ধর্ম।

বিজ্ঞান

বিজ্ঞান বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের একখানি প্রবন্ধ গ্রন্থ আছে—'বিশ্বপরিচয়'। প্রবন্ধগুলি কিশোরদের জন্য লেখা এবং প্রধানত জ্যোতির্বিজ্ঞান ও পদার্থবিজ্ঞান প্রবন্ধ কয়টির আলোচ্য। বাংলাভাষায় কিশোরদের

জন্য বিজ্ঞানের বই লেখার মহৎ উদ্দেশ্য এই গ্রন্থ রচনার আদর্শ ছিল। অত্যন্ত সহজ বাংলায় অনেকটা গল্পচ্ছলে জ্যোতির্বিজ্ঞান ও পদার্থ-বিজ্ঞানের তথ্যগুলি কিশোরদের কাছে উপস্থাপিত করেছেন। এই গ্রন্থখানিতে প্রবন্ধের গুণগুলি প্রায় সবই উপস্থিত, কেবল কিশোরদের জন্য উদ্দিষ্ট বলে বলার ভঙ্গীটি গুরুগম্ভীর না হয়ে অমায়িক, খোসমেজাজী ও কথিকামূলক হয়েছে। নক্ষত্রলোকের অনেক সংবাদ, যেমন পৃথিবী থেকে তার প্রতিবাসী গ্রহ-উপগ্রহগুলির দূরত্ব, আলোর গতি, বর্ণালী তথ্য, বিভিন্ন ঋতুতে নক্ষত্র পরিচয়, আপেক্ষিকতাবাদ, মাধ্যাকর্ষণ, চুম্বকশক্তি প্রভৃতি নানা বিষয় তিনি নিরলঙ্কার বৈঠকী ভাষায় বুঝিয়ে দিয়েছেন। ভাষাটি ছোটদের বোঝার পক্ষে বেশ অনুকূল—শিক্ষকতাসুলভ। ছেলেবেলায় পিতার কাছে ডালহৌসি পাহাড়ে রবীন্দ্রনাথ নক্ষত্র পরিচয় লাভ করেছিলেন। তাছাড়া বাড়ীতে নরকঙ্কাল ঝুলিয়ে দেহ-বিজ্ঞান সম্বন্ধে পড়াশোনা করেছিলেন। তারই স্বাক্ষর আছে 'বিশ্বপরিচয়ে'।

তৃতীয় উদ্যোগ

সমালোচনা-শিল্পী রবীন্দ্রনাথ

সমালোচনার সংজ্ঞা

সাহিত্য ও শিল্পবিষয়ক প্রবন্ধের বিকল্প নাম সমালোচনা। ন্যায়ত প্রবন্ধমাত্রেই সমালোচনা এবং বিজ্ঞানের আপেক্ষিকতাবাদ যে প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয়, যেহেতু তা মহাকাল ও মহাজাগতিক ব্যাপারে প্রতিষ্ঠিত নিউটনবাদের খণ্ডন এবং একটি নূতন সিদ্ধান্ত স্থাপন, অতএব সেও একটি খাঁটি সমালোচনা। তবে সাধারণত শিল্প ও সাহিত্য সংক্রান্ত আলোচনা সমালোচনা অভিধা পেয়ে আসছে।

সম রূপে আলোচনা অর্থাৎ সম্যক ও সত্য রূপে দর্শনের বাণীবদ্ধ প্রকরণের নাম সমালোচনা। সমালোচনার দুটি কর্ম : মণ্ডন ও খণ্ডন। বিষয় বিশেষের দোষত্রুটি, দুর্বলতা অসম্পূর্ণতা ইত্যাদি প্রদর্শন অর্থাৎ নেতিবাচক বিচারের দিকটা খণ্ডন এবং তার সৌন্দর্য, গুণ ও তাৎপর্য অনুধাবন অর্থাৎ ইতিবাচক উপভোগের দিকটি মণ্ডন। যে আলোচনায় মণ্ডন ও খণ্ডন, বিচারও উপভোগ সম্যক ও সমান ভাবে থাকে, যথার্থত তেমন রচনারই নাম সমালোচনা।

সমালোচকগণ সর্বদা সমদর্শিতার পরিচয় দিতে সক্ষম হন না, খণ্ডন ও মণ্ডন উভয় দায়িত্ব সমভাবে বহন করেন না। অনেকেই মণ্ডন অপেক্ষা খণ্ডনের প্রতি অধিক আগ্রহ প্রদর্শন করেন এবং এজন্যই সমালোচনার প্রচলিত অভিধার্থ হয়ে দাঁড়িয়েছে নিন্দাবাদ। সমালোচকের ব্যক্তিগত স্বভাব ও শিক্ষার উপর তিনি মণ্ডন বা খণ্ডনবাদী, অথবা সমদর্শী সমালোচক হবেন, তা নির্ভর করছে।

রবীন্দ্রনাথের সমালোচনায় কিন্তু খণ্ডন নেই, প্রায় সবটাই মণ্ডন-কলা। তাই আমরা তাঁকে মণ্ডনকলাবাদী সমালোচক বলতে পারি।

য়ুরোপীয় অভিধায় যাঁদের বলা হয় Impressionist বা aesthetic critic, মণ্ডনবাদী সমালোচক বলছি তাঁদেরই। ব্যক্তিগত ভাল লাগার উপভোগ এবং ব্যক্তিগত সৌন্দর্য ও আদর্শবাদ দ্বারা অনুপ্রাণিত সমালোচনাগুলি প্রায়শ এক একটি স্বতন্ত্র রসসৃষ্টি বা প্রায় নূতন একটি শিল্পকর্ম হয়ে উঠে। রবীন্দ্রনাথের সমালোচনা এই জাতের। Creative Criticism বস্তুত পূর্ণাঙ্গ সমালোচনা নয়—চরিত্রবিচারে তা সমালোচনা-শিল্প। রবীন্দ্রনাথ তাই যেমন প্রবন্ধ-শিল্পী, তেমনি সমালোচনা-শিল্পী। বঙ্কিমচন্দ্রের প্রবন্ধের পাশে রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধ রাখলে যেমন দু'জাতের এবং দুজনের চরিত্রের মৌল প্রভেদ ধরা পড়ে, তেমনি মোহিতলালের সাহিত্য-সমালোচনার পাশে রবীন্দ্রনাথের সমালোচনা-সাহিত্য রেখে দেখলে পরিষ্কারভাবে উভয়ের জাতিগত প্রভেদ বোঝা যাবে। মোহিতলাল খণ্ডনকে প্রাধান্য দিলেও মোটামুটি সমদর্শী সমালোচক। তিনি আধুনিকও বটে। বাংলাভাষায় মোহিতলালই সমালোচনা-বিজ্ঞানের আদি স্রষ্টা। রচয়িতার ব্যক্তিচরিত্র, জীবনপঞ্জী এবং তাঁর দেশকাল ও পরিবারের পরিপ্রেক্ষিতে তাঁর সৃষ্টির রহস্য উদ্ঘাটন, স্রষ্টার মনোবিশ্লেষণ দ্বারা সৃষ্টির জটিলতা, ধ্যানধারণা ও অনুভাবনার ব্যাখ্যা; বিদেশী ক্লাসিকের মানদণ্ডে সাম্প্রতিক সাহিত্যের তুল্যায়ণ; সৃষ্টিকর্মের মধ্যে স্রষ্টার ধর্মের ও মর্মের সন্ধান এবং জাতীয় জীবনের সঙ্গে তার সম্পর্ক প্রভৃতির বিচার বিশ্লেষণ, তথ্যপরিবেশন, এবং যুক্তি ও মননিষ্ঠ অনুশীলন দ্বারা আস্বাদন ও মূল্যায়ণের যে আধুনিকতম যথার্থ সমালোচনা পদ্ধতি, মোহিতলালে তা পাওয়া যায়, কিন্তু রবীন্দ্রনাথের কবি-স্বভাবের পক্ষে এ জাতীয় পরিশ্রমসাধ্য, অনুশীলন-সিদ্ধ সাহিত্যের খিদ্‌মদগারী ছিল অসম্ভব। তিনি স্বীয় চিত্ত ও রসবোধকেই সাহিত্যসমালোচনার নিরিখ করেছেন। 'প্রাচীন সাহিত্য' ও 'আধুনিক সাহিত্য' থেকে কয়েকটি সমালোচনার সারাংশ দৃষ্টান্ত হিসাবে নেওয়া যাক।

প্রাচীন সাহিত্য

'প্রাচীন সাহিত্যে' রবীন্দ্রনাথ ভারতীয় ক্লাসিকগুলির আলোচনা করেছেন। রামায়ণ, শকুন্তলা, কুমারসম্ভব, কাদম্বরী, এই চারখানি সংস্কৃত ক্লাসিক কাব্য এবং বৌদ্ধ গীতি-কবিতা ও ধম্মপদ নিয়ে ছয় সাতটি সমালোচনা এ-গ্রন্থে সংকলিত হয়েছে।

'রামায়ণ' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ প্রথমে মহাকাব্যের সংজ্ঞা দিয়েছেন এবং পরে রামায়ণের মর্মবাণী প্রকাশ করেছেন। কবির ব্যক্তিগত ভাবাবেগের বদলে যে কাব্যে কোন বৃহৎ সম্প্রদায়ের কথা একটি মহৎ আদর্শের সঙ্গে বর্ণনা করা হয়, তারই নাম মহাকাব্য। অথবা, যে রচনায় একটি সমগ্র জাতি একটি যুগব্যাপী আপনার জীবনাচরণ ও জীবনানুধ্যান পরিপূর্ণরূপে অভিব্যক্ত করে এবং তাকে একাধারে স্বজাতির চিরকালের ইতিহাস, ধর্ম ও কাব্য রূপে স্থাপন করে যায়, মহাকাব্য বলা যায় তাকেই।

রামায়ণ বিশুদ্ধ মহাকাব্য। রামায়ণকে ভারতবর্ষের ইতিহাসও বলা যায়। রাজনৈতিক ইতিহাস নয়, মানবজীবনেতিহাস। রামায়ণ রামের চরিত্রেরই কাব্যরূপ। রামচন্দ্রকে দেবতা না করে দেবোপম মানবরূপেই বাল্মীকি রূপ দিয়েছেন। এই মানব মহিমাই রামায়ণের শ্রেষ্ঠ গৌরব। এখানে দেবতা নর হয়নি, নরই আপন চরিত্রবলে নারায়ণত্ব লাভ করেছেন। রামের এই পুরুষকার বা পরিপূর্ণ মনুষ্যত্বই তাকে দেবত্বে উন্নীত করেছে।

সাধারণে বীররসাত্মক কাব্যকে বলে মহাকাব্য। কিন্তু রামায়ণে বিস্তর যুদ্ধবিগ্রহ সত্ত্বেও করুণরসই স্থায়ী। করুণরসের প্রাধান্যের কারণ রামায়ণ যুদ্ধকাব্য নয়—গৃহাশ্রমের কাব্য। পারিবারিক জীবনের পরম আদর্শ স্থাপনই এই মহাকাব্যের উদ্দেশ্য। সৌভ্রাত্র, পাতিব্রাত্য, সত্যপরায়ণতা, প্রজানুগত্য, বন্ধুত্ব প্রভৃতি গার্হস্থ্যজীবনাচরণের শ্রেষ্ঠ গুণগুলির পরাকাষ্ঠা প্রদর্শিত হয়েছে রামায়ণে।

ভারতের আকাঙ্ক্ষা, ধ্যানধারণা, সাধনা, আরাধনা, সংকল্প অর্থাৎ

ভারতবর্ষের যে পরিপূর্ণতার আদর্শ, তাই রামচন্দ্রের চরিত্রে মূর্ত হয়েছে। মনুষ্যত্বের পূর্ণতম বিকাশ পুরুষোত্তম রামচন্দ্র—তাঁরই মধ্যে ভারতের অমৃতত্বলাভের সাধনা বিগ্রহলাভ করেছে। রাবণ শুধুই অমিত বিক্রমশালী আর অমিত শক্তিধর; রামচন্দ্র অমৃত শক্তির বিগ্রহ। অমৃতের পুত্র রামচন্দ্রের চরিত্র আদৌ অলৌকিকও নয়। ভারতবাসী যুগ যুগ ধরে রামায়ণ পাঠ করে আসছে, কখনো তাদের কাছে রামচন্দ্রকে অতিপ্রাকৃত মনে হয়নি। রামচন্দ্র যে কত সত্য ও কত ধ্রুব, এটাই তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

রবীন্দ্রনাথ এই প্রবন্ধের এক জায়গায় সমালোচনার স্বরূপ সম্বন্ধে প্রসঙ্গত মন্তব্য করেছেন: (যথার্থ সমালোচনা পূজা; সমালোচক পূজারী পুরোহিত, তিনি নিজের অথবা সর্বসাধারণের ভক্তিবিগলিত বিস্ময়কে ব্যক্ত করেন মাত্র।)

রবীন্দ্রনাথের এই মতটি মেনে নেওয়া যায় না। সমালোচনা সাহিত্যের বিজ্ঞান। সমালোচনা যদি পূজা বা ভক্তির বিগলিত বিস্ময় হয়, তাহলে সে জাত খুইয়ে নিজেই একটি স্বতন্ত্র সৃষ্টি অর্থাৎ সাহিত্য হয়ে উঠে। তখন তারই আবার ব্যাখ্যা, বিচার ও মূল্য নিরূপণ অর্থাৎ সমালোচনার দরকার হয়।

সমালোচনা একটি অর্জিত বিদ্যা এবং তা শিক্ষা ও অনুশীলন সাপেক্ষ। ভক্তি ও পূজায় সকলেই সমান অধিকারী—সব পাঠকেরই ভালো লাগার কথাটা বলার আবেগ ও অধিকার আছে। কিন্তু তাকেই যদি সমালোচনা বলতে হয়, তাহলে তা সাহিত্যের পক্ষেই শোচনীয় দুর্ভাগ্য বলতে হবে।

রবীন্দ্রনাথের অধিকাংশ সমালোচনাই কিন্তু পূজা; ভক্তি-বিগলিত বিস্ময়কে ব্যক্ত করেই তা পরিতৃপ্ত। পুরোহিত দেবতার মন্ত্র আবৃত্তি করে ভক্তি ও অর্ঘ নিবেদন করেন। তাতে বিস্তর কবিত্ব থাকে। কিন্তু দেবতার চরিত্র ও স্বরূপ তার দ্বারা ক্বচিৎ যথার্থত ব্যক্ত হয়। তাছাড়া ভক্তি ও স্তুতি হৃদয়োৎসারিত বলে সর্বদাই তা একজাতীয় হয়ে থাকে। এক দেবতার স্তুতি থেকে আর এক দেবতার

স্তুতির মন্ত্রে যেমন সামান্য প্রভেদ, তেমনি এক কবির সঙ্গে অপর কবির পার্থক্যও এই পূজাপদ্ধতির সমালোচনায় মিলবে না। সর্বোপরি ভক্তি সর্বদাই অতিশয়োক্তি, যুক্তির বালাই তাতে থাকে না। রবীন্দ্রনাথের অধিকাংশ সমালোচনায় যুক্তির বদলে ভক্তি অধিক এবং তিনি তাঁর ব্যক্তিগত মনীষা, কবিপ্রতিভা ও আদর্শবাদের আরোপ দ্বারা সমালোচ্য গ্রন্থকারকে অসাধারণ মূল্য দান করেন।

মেঘদূত

ধরা যাক কালিদাসের কথা। রবীন্দ্রনাথের উপর কালিদাসের প্রভাব গভীর ও ব্যাপক। "প্রাচীন সাহিত্যের" 'শকুন্তলা', 'কুমারসম্ভব ও শকুন্তলা', 'মেঘদূত' প্রভৃতি প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ কালিদাসের কাব্যের সমালোচনা করেছেন। বলা বাহুল্য, এ আলোচনা নিছক অর্ঘ্য রচনা। 'মেঘদূত' বস্তুত ব্যক্তিগত রচনা এবং কোনমতেই সমালোচনা আখ্যা পেতে পারে না। কালিদাসের কালের সৌন্দর্য-জগৎ থেকে বর্তমান কালের মানুষ নির্বাসিত, তাই পৃথিবীর সব মানুষই যক্ষ, সকলেই চিরসৌন্দর্যের নিকেতন অলকাপুরী আর চিরপ্রেমের প্রেয়সী যক্ষিণীর বিরহে কাতর। চিরন্তন প্রেম ও সৌন্দর্যের একটি স্বতন্ত্র বিশ্ব কবিকল্পনায় আছে এবং সেই সৌন্দর্যজগতের জন্য কবিপ্রাণ যক্ষের মতো বেদনায়-বিরহে বিমথিত হয়। কবির কাব্য তো সেই বিরহেরই মেঘদূত, সেই অমূর্ত আদর্শায়িত প্রেম ও সৌন্দর্য-জগতের উদ্দেশ্যে রচিত ও প্রেরিত।

'মেঘদূতে'র মধ্যে এমনি একটি প্রতীকী তাৎপর্য আরোপ করেছেন রবীন্দ্রনাথ। যক্ষ, যক্ষপ্রিয়া, অলকাপুরী, রামগিরি পর্বত, উজ্জয়িনী, যক্ষপ্রভুর অভিশাপ, নির্বাসন, পূর্বমেঘ, উত্তরমেঘ প্রভৃতি মেঘদূতের সমস্ত চরিত্র ও চিত্রেরই একটি প্রতীকী ব্যঞ্জনা দিয়েছেন কবি। এর দ্বারা 'মেঘদূতে'র অসাধারণত্ব বৃদ্ধি পেয়েছে। কিন্তু এই প্রতীকী তাৎপর্য আমাদের কবিরই স্বকীয় সৃষ্টি, কালিদাসের কল্পনায় এমন কোন অপরিসীম ব্যঞ্জনা ছিল বলে মনে হয় না। কালিদাসের

'মেঘদূত' কাব্যে যে-সকল আশ্চর্য সুন্দর চিত্রকল্প আছে—কেতকীর বেড়াঘেরা উপবন; গ্রামচৈত্যে গৃহবলিভুক পাখির নীড় নির্মানের ব্যস্ততা; গ্রামপ্রান্তে মেঘের মতো কালো হয়ে-উঠা-পরিপক্ক জম্বুবন, উদয়নকথাকোবিদ গ্রামবৃদ্ধগণ; সিপ্রাতটবর্তিনী উজ্জয়িনী; হর্ম্য-বাতায়নবর্তিনী প্রসাধননিরতা চকিতপ্রেক্ষণা পুরাঙ্গনাগণের কেশসংস্কারধূপের সুগন্ধ; অন্ধকার রাত্রে পারাবতকূজনহীন রুদ্ধদ্বার সুপ্তসৌধ রাজধানীর পরিত্যক্ত রাজপথে কম্পিতহৃদয়া ব্যাকুলচরণা বারাঙ্গনার অভিসার; —এই সব চলচ্চিত্র একালের কবিকে কালিদাসের প্রাচীন ভারতে নিয়ে গিয়েছে এবং কবি এর রোমান্টিকতায় সম্মোহিত হয়ে গেছেন। বিরহীর চেতন-অচেতন ভেদজ্ঞান থাকে না। কবির কাছেও তেমনি সত্য ও কল্পনায় প্রভেদ নেই। মেঘদূতের সৌন্দর্য-জগৎ কবির কাছে কল্পনাসৃষ্ট হয়েও পরম সত্য। সেই সত্য ও সুন্দর থেকে নির্বাসিত বিরহী রবীন্দ্রনাথ কালিদাসের রোমান্টিক কালের চিত্র কল্পনায় পুনর্সৃষ্টি করেছেন তাঁর এই প্রবন্ধে। ফলে 'মেঘদূত' আর একখানি নূতন গদ্য খণ্ড-কবিতা হয়েছে, সমালোচনা হয়নি।

কুমারসম্ভব ও শকুন্তলা

'কুমারসম্ভব ও শকুন্তলা' এবং 'শকুন্তলা' প্রায় সমভাবার্থক; একটি প্রবন্ধই যেন দুবার লেখা। এদুটি প্রবন্ধও নাম মাত্র সমালোচনা; আসলে দুটিই মৌল রচনা। কালিদাস সম্বন্ধে কিছু আলোচনা আছে এবং তার চুম্বক বাণীটি হোল এই যে, কালিদাস কেবল সৌন্দর্যসম্ভোগের কবি নন; তিনি ভোগবিরতির কবিও বটে। অর্থাৎ কালিদাস সাধনবেগেরই কবি। প্রসাধন কলার যে-সৌন্দর্য তাঁর কাব্যে দৃষ্ট হয়, তা কেবল ঐ সাধনবেগকেই বৈপরীত্য দ্বারা নিবিড়তর করার জন্য। কালিদাস সম্বন্ধে এমন নূতন কথা শোনানোর যুক্তি কবি দিয়েছেন কুমারসম্ভব এবং শকুন্তলার অন্তর্নিহিত তাৎপর্য ব্যাখ্যা করে। 'কেহ যদি তরুণ বৎসরের ফুল ও পরিণত বৎসরের ফল, কেহ যদি মর্ত ও

স্বর্গ একত্র দেখিতে চায়, শকুন্তলায় তাহা পাইবে—' গ্যেটের এই উক্তিটিই রবীন্দ্রনাথ কালিদাসের কাব্যবিচারের ধ্রুব মান করেছেন এবং 'কুমারসম্ভব' ও 'মেঘদূতে'ও এই মতটি প্রতীকরূপে ব্যবহার করেছেন। প্রথম প্রবন্ধ কুমারসম্ভব ও শকুন্তলার অন্তর্নিহিত ভাব-ঐক্য তুলনা করে দেখিয়েছে। 'কুমারসম্ভবে' পার্বতীর ধূর্জটিকে রতি-পতির সাহায্যে অকাল বসন্তের বোধন করে রূপ-কামনায় ভোলানো, শকুন্তলার দুষ্মন্তের সঙ্গে তপোবনে গোপন প্রণয় ও মিলনের অনুরূপ। উভয় কাব্যেই তপোবনের সুনিবিড় পবিত্র সুন্দর পটভূমি রয়েছে; উভয়ের এই গোপনচারী প্রেম একটি অবৈধ ও অপবিত্র কামনার চক্রান্ত। তাই উভয়েরই তপোবনের শ্রী ও পবিত্রতা বিনাশকারী এই অবৈধ প্রণয়ে প্রেম অভিশপ্ত হয়েছে; 'কুমারসম্ভবে'-র মদনভস্ম 'শকুন্তলা'র দুর্বাসার অভিশাপেরই অনুরূপ। যৌবনমদিরারসের এই বিহ্বলতা ও অবিবেচনার পর, উভয় কাব্যেই জীবনের দ্বিতীয় পর্ব শুরু হয়েছে। পর্যাপ্তযৌবনপুষ্পে অবনমিতা উমা সঞ্চারিণী পল্লবিনী লতার ন্যায় একদিন ধূর্জটির পদপ্রান্তে লুণ্ঠিত হয়েছিলেন। কিন্তু তার সেই যৌবন ও রূপ যোগীকে বিচলিত করতে পারেনি। ললিত যৌবনের সৌন্দর্য প্রত্যাখ্যানে অপমানিতা হয়ে তিনি কেবল লজ্জার স্তূপ নিয়ে গৃহে ফিরে এসেছিলেন। তেমনি শকুন্তলাও দুষ্মন্তের রাজসভা থেকে প্রত্যাখ্যাতা হয়ে, মর্মান্তিক লজ্জাভার বয়ে গৃহে ফিরে-ছিলেন; তারপর উমা এবং শকুন্তলা, দুজনেরই মহাশ্বেতার ন্যায় কঠোর তপস্যার শুরু। প্রসাধন ও যৌবনের মদিরতা ত্যাগ করে, কঠোর কৃচ্ছ্রসাধন ও সাধনার মধ্য দিয়ে পার্বতী মহেশ্বরকে এবং শকুন্তলা স্বর্গে দুষ্মন্তের সঙ্গে মিলিত হলেন। উমা এবং শকুন্তলার এই দুই অবস্থাকেই কবি তরুণ বৎসরের ফুল ও পরিণত বৎসরের ফল, নামান্তরে পূর্বমেঘ ও উত্তরমেঘ, মর্ত ও স্বর্গ বলেছেন। কবির 'চিত্রাঙ্গদা' নাটকেও নারীর এই দ্বৈত রূপের মিলনের ভাবটি পরিস্ফুট। কবির মতে কাম ও রূপমোহ বর্জিত যে-মিলনের মধ্যে আত্মসর্বস্ব ভোগের বদলে সমষ্টি ও সমাজের কল্যাণের উদ্দেশ্য নিহিত, তারই নাম প্রেম। বিবাহ একটি

সামাজিক কর্তব্য, একটি জাতিগত মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান। কিন্তু যখন ব্যক্তিগত রূপমোহজাত কাম ও ভোগের জন্য তরুণ তরুণীগণ মিলিত হন, তখন তা বিবাহের বৃহত্তর ও মহত্তর উদ্দেশ্য থেকে চ্যুত হয় বলেই দুর্বাসা বা ধূর্জটি-রূপ ভর্তৃশাপের দ্বারা খণ্ডিত ও অভিশপ্ত হয়। সেই অবিবেচনা প্রসূত রূপমোহজাত প্রেমের ফলশ্রুতি বিচ্ছেদ, অপমান ও লাঞ্ছনা।) কালিদাস তাঁর কাব্যে সৌন্দর্যসম্ভোগসম্ভব প্রেমের এই পরিণতির চিত্র এঁকেছেন। তাঁর কাব্যে ভোগ ও কামনায় সৌন্দর্যেরও বিপুল সমারোহ আছে, কিন্তু ঐ সৌন্দর্যসম্ভোগই তাঁর ফলশ্রুতি নয়। মদনভস্মের এবং শকুন্তলার প্রত্যাখ্যানের পর, উভয় কাব্যের যে উত্তরখণ্ড বা পরিণতি-পর্ব, সেখানে যে কৃচ্ছ্রসাধন, ত্যাগ ও সাধনা রয়েছে, সেই ভোগবিরতিই এর পরিণাম। আদিরসের পরিণতি হয়েছে করুণ ও শান্তরসে, মহাভারতে যেমন বীররসের পরিণতি মহাপ্রস্থানের পথের নির্বেদভাবে,—শান্তরসে। শান্তির মধ্যেই সৌন্দর্যের পূর্ণতা। কালিদাসের কাব্যে সৌন্দর্যের পরিণাম হয়েছে শান্তি ও কল্যাণে।

রবীন্দ্রনাথের সৌন্দর্যবোধ এবং সৌন্দর্য-দর্শনে সব সময় সঙ্গতি ছিল না। সৌন্দর্য উপভোগ করে যখন তিনি কিছু রচনা করেছেন, তখন সৌন্দর্যের যে রূপ ফুটেছে, তারই সঙ্গে সৌন্দর্যের দর্শন চিন্তা করে যখন কিছু লিখেছেন, তখন যে-রূপ আভাসিত হয়েছে, তার যেন ঠিক মিল হয়নি। এবং উপভোগ ও তত্ত্বগত চিন্তা—সৌন্দর্যের এই উভয় দিক নিয়ে রচিত 'উর্বশী' কবিতায় তাই সঙ্গতির অভাব। 'বিজয়িনী' কবিতায় সৌন্দর্যের যে রূপমোহ ও কামনাবর্জিত পূজারিণী রূপ, তার সঙ্গে 'সোনার তরী', 'চিত্রা', 'মহুয়া'র প্রসাধনকলামূলক বহু কবিতার কোন সঙ্গতি পাওয়া যায় না। যাই হোক, রবীন্দ্রনাথের সৌন্দর্যতত্ত্ব বা সৌন্দর্যদর্শনে সত্যম্ এবং সুন্দরমের সঙ্গে শিবমের অদ্বৈতসিদ্ধি রয়েছে। কীট্‌স্ নিরপেক্ষ সৌন্দর্যের ভোগবাদী কবি ছিলেন। কিন্তু এক জায়গায় হঠাৎ Beauty is truth, truth beauty বলে ফেলে সুন্দরের মধ্যে সত্যের অনুপ্রবেশ ঘটিয়ে কিছুটা তাত্ত্বিক

হয়ে পড়েছিলেন। কিন্তু তবু লক্ষণীয় এই যে, কীট্‌স্ কেবল, যা সত্য তাই সুন্দর, এ-পর্যন্তই এগিয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথ তার সঙ্গে আবার কল্যাণকেও যুক্ত করলেন। এই তিনের অদ্বৈত সিদ্ধির ফলে সুন্দরের যে রূপান্তর হোল, তাতে বস্তুত কল্যাণ বা শিবম্-ই সবটুকু ঠাঁই জুড়ে বসেছে, সুন্দর আছে কি নেই, সংশয় জাগে। সে যাই হোক, এখন কল্যাণই যদি সুন্দরের নিরিখ হয়, তাহলে কল্যাণের স্বরূপটি কেমন, এ প্রশ্ন জাগে। রবীন্দ্রনাথ কালিদাসের কাব্য-আলোচনায় এই কল্যাণের যে পরিচয় দিয়েছেন তা হোল, ব্যক্তির অহঙ্কারের মধ্যে যা সীমাবদ্ধ নয়, সমষ্টি ও সমাজের হিতের জন্য আত্মেন্দ্রিয় প্রীতিইচ্ছাহীন যে সেবাব্রত ও আত্মনিবেদন, তার নাম কল্যাণ।

কালিদাসের কাব্যে ঠিক এই সাধনতত্ত্ব আছে কিনা, সে সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের দ্বিধাহীন প্রত্যয় সত্ত্বেও আমাদের অবিশ্বাস আছে। সমাজ-সংসার-ছাড়া, গোপনচারী আত্মেন্দ্রিয় প্রীতিইচ্ছাসম্ভূত প্রথম যৌবনের যে প্রগল্‌ভ রূপমোহ, তার ফল যে ব্যক্তির পরিণত জীবনের পক্ষে বিষময় হয়ে থাকে, এ-সত্য চিরন্তন এবং উমা ও শকুন্তলার পরিণতি সেদিক থেকে মনস্তত্ত্বসম্মতভাবে বাস্তবও বটে; এবং কালিদাসের কাব্যে এই বাস্তব ও সঙ্গত সত্যটি যে যথাযথ চিত্রিত হয়েছে, তাতে তাঁর মহাকবি পরিচয়ই সার্থক হয়েছে। কিন্তু কাহিনীর পরিণতি তিনি যেভাবে করেছেন, তাতে দেবচরিত্রের পৌরাণিক ভাবটি রক্ষিত হোলেও ঠিক পার্থিব মানবজীবনের স্বাভাবিক পরিণতি প্রদর্শিত হয়নি। শকুন্তলাকে স্বর্গে দুষ্মন্তের সঙ্গে আকস্মিকভাবে মিলিত করিয়ে দিয়ে যে শান্তরসের সৃষ্টি করা হয়েছে, তা শিল্প-বিচারে কৃত্রিম। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ কোন কাব্যকে যত না শিল্প রূপে বিচার করেন, তার চেয়ে বেশি বিচার করেন আদর্শ রূপে। অথবা বলা যায়, শিবমের আদর্শ পরিমাপ করে কাব্য বিচারের দিকেই তাঁর ঝোঁক ছিল, যদিও তিনি বহু ক্ষেত্রে কাব্যে নীতি সন্ধানের নিন্দা করেছেন। তাঁর মনোভাব হোল এই যে, কবি নীতি-প্রতিষ্ঠাকে তাঁর কাব্যে ঘুণাক্ষরেও

লক্ষ্য করবেন না, কিন্তু তথাপি মহৎ কাব্যে কবির অজ্ঞাতে তাঁর শিল্পবোধের ধ্রুবত্ব থেকেই নীতি ও কল্যাণ স্বতঃই উৎসারিত হবে।

শকুন্তলা

'শকুন্তলা' প্রবন্ধে কালিদাসের কাব্যে উপরিউক্ত নীতি বা কল্যাণের আদর্শ প্রতিষ্ঠা ব্যতীত প্রসঙ্গত 'টেম্পেস্ট' নাটকের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ এর তুলনা করেছেন এবং দেখিয়েছেন যে উভয় নাটকে অমিলটাই প্রায় সব। 'টেম্পেস্টে' পীড়ন, শাসন, দমন, 'শকুন্তলায়' প্রীতি, শান্তি, সদ্ভাব। 'টেম্পেস্টে' প্রকৃতি মানুষের হয় অবাধ্য ভৃত্য, নয় অনিচ্ছুক সখা; মানুষ তার প্রমত্ত যাদুকরী শক্তি দিয়ে তাকে অনুগত করেছে, কিন্তু তার হৃদয় জয় করেনি। আর 'শকুন্তলা'য় প্রকৃতি মানুষের প্রিয়সখা, ঐকান্তিক অন্তরঙ্গতায় মানুষের মতো সংবেদনশীল। চেতন-অচেতনে কোন ভেদ 'শকুন্তলা'য় নেই। 'টেম্পেস্টে' বিরোধটাই প্রধান।

'শকুন্তলায়' কবি যে সাংসারিক সত্যের নকল করেননি, এজন্য রবীন্দ্রনাথ কালিদাসের প্রশংসায় মুখর হয়েছেন। সাংসারিক সত্যের প্রতি রবীন্দ্রনাথের বিরূপতা সর্বজনবিদিত। কাব্যে-সাহিত্যে সাংসারিক ও প্রাত্যহিক জীবনাচরণের যথার্থতা তাঁর কাছে অবাঞ্ছিত মনে হয়েছে। য়ুরোপীয় সাহিত্যে বস্তুতন্ত্রই মুখ্য। সংস্কৃত সাহিত্যে অতিপ্রাকৃত, অলৌকিক, দৈব প্রভৃতি অমিতচারী কবি-কল্পনা বা রোমান্টিকতাই অধিক। রবীন্দ্রনাথ একেই কাব্যসত্য নাম দিয়ে বস্তু-সত্যের চেয়ে পরিপূর্ণ বলে মনে করেছেন।

তাছাড়া রবীন্দ্রনাথ সর্বত্র শান্তিবাদী। শক্তি তার সহ্য হয় না। শক্তিপূজার তিনি ঘোর বিরোধী। টেম্পেস্টে শক্তি, শকুন্তলায় শান্তি। য়ুরোপীয় সাহিত্যে শক্তি ও বিরোধ-সংঘাতের যে প্রচণ্ড, প্রখর, রূঢ় ও অসহনীয় জ্বালা-যন্ত্রণা এবং সান্ত্বনাহীন Pity and Awe, ভারতীয় কল্যাণ ও শান্তিবাদী কবি রবীন্দ্রনাথের স্বভাবতই তা সমর্থন

তাঁর মহৎ সৃষ্টির দ্বারা সেই দৃষ্টান্ত স্থাপন করে গেছেন। বঙ্কিমচন্দ্র বাংলা সাহিত্যের সর্বশ্রেষ্ঠ মনীষী-প্রতিভা।

'বিহারীলাল'

'বিহারীলাল' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ কিভাবে ছেলেবেলায় তাঁদের পরিবারের এই বন্ধু-কবির দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন, সেকথা বর্ণনা করে নিজেকে বিহারীলালের শিষ্য ঘোষণা করেছেন,। বিহারীলালকে তিনি বলেছেন বাংলা গীতিকবিতার 'ভোরের পাখী' অর্থাৎ বিহারীলালই আধুনিক বাংলা গীতিকবিতার প্রথম কবি; তিনিই বর্তমান বাংলা লিরিকের উদ্‌গাতা। বিহারীলালের 'সারদামঙ্গল' কবির ব্যক্তিগত সৌন্দর্য সম্ভোগের কাব্য। 'সারদামঙ্গলে' বিহারীলাল আপনার কল্পনার ব্যাপ্তিতে দেহী ও বিদেহী সৌন্দর্যের সাযুজ্যানুভব করেছেন। বিহারীলাল নির্জনতার কবি, একাকীত্বের কবি। এমন নির্জন, একক, স্বগত কবি বাংলা কাব্যে এই প্রথম। আধুনিক বঙ্গ-সাহিত্যে এই প্রথম কবির নিজের কথা। যে শতকে রঙ্গলাল, মধুসূদন, হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্রাদি, দেশের কথা, দশের কথা, পুরাণ কথা, ও ইতিকথায় বাংলা কাব্যের আসর সরগরম রাখছেন, তখন নিভৃতচারী বিহারীলালের কাব্য-গুঞ্জন রবীন্দ্রনাথের মতো স্বভাব-সংগীতধর্মী কবি ছাড়া অন্য কাউকে তেমন মুগ্ধ করতে পারেনি। বিহারীলালের কবি-স্বভাব বিশুদ্ধ গীতি কবির। অবশ্য তাঁর 'সারদামঙ্গল' শৈলীর দিক দিয়ে মধ্যযুগের মঙ্গল কাব্যের কিছু সামান্য লক্ষণবাহী, কিন্তু আসলে এটি অসংলগ্ন ও স্বয়ং সম্পূর্ণ কতগুলি গীতিকবিতার সংকলন বই নয়। এর কবির উচ্ছ্বাস অসংযত ও আবেগ অপরিমিত ছিল, কাব্যশিল্পের অনুশীলন বা শিক্ষাও বিশেষ ছিলনা; তাই কলাকৌশলের ত্রুটি আছে বিস্তর, কিন্তু তথাপি প্রকৃতির সৌন্দর্য এবং নারীর প্রেমের সংগীত এরূপ সহস্রধার প্রবাহের মতো বিহারীলালের পূর্বে আর উৎসারিত হয়নি। বাংলা বিশুদ্ধ আধুনিক গীতিকবিতার প্রথম সার্থক কবি হিসাবে বিহারীলালের স্থান বাংলা কাব্যে অবিস্মরণীয়।

'সঞ্জীবচন্দ্র'

'সঞ্জীবচন্দ্র' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ প্রধানত 'পালামৌ' গ্রন্থখানির পরিপ্রেক্ষিতে গ্রন্থকারের সাহিত্য কৃতির বিচার করেছেন। 'পালামৌ' সঞ্জীবের রচিত একটি রমণীয় ভ্রমণবৃত্তান্ত; কিন্তু এর মধ্যে লেখকের অযত্ন, আলস্য ও উদাসীনতার পরিচয় রয়েছে।

সঞ্জীবের প্রতিভা ছিল, কিন্তু গৃহিণীপনা ছিল না। অর্থাৎ সাহিত্য রচনার যে স্বভাব-সঙ্গতি সঞ্জীবের ছিল, তিনি তার যথোপযুক্ত অনুশীলন করেননি। কিংবা পরিশ্রমসাপেক্ষ প্রয়াস-প্রযত্ন বরণ করে নেননি বলে তাঁর রচনাগুলি যেন ভাবুকতায় অবিন্যস্ত, ভাবনায় শিল্পকলাসম্মত নয়। সাহিত্য-শিল্পীর নির্বাচন ও পরিমাণ-সামঞ্জস্য জ্ঞান থাকা চাই। সঞ্জীবচন্দ্র শিল্পীর এই দায়িত্ব সম্বন্ধে যত্নবান ছিলেন না। ভ্রমণরসিকের চোখে দেখা সমুদয় বৃত্তান্তই তিনি যথাযথ পরিবেশন করে গেছেন। তথাপি 'পালামৌ'এর সর্বত্র সঞ্জীবের অকৃত্রিম সৌন্দর্যানুরাগ এবং জীবনরস-রসিকতার যে মাধুর্য আছে, তার আনন্দও কম নয়। সঞ্জীবের সৌন্দর্য-চেতনা 'পালামৌ'এর স্থানে স্থানে বিস্ময়কর রূপচিত্র রচনা করেছে। জল থাকা সত্ত্বেও জল ফেলে জল আনতে যেতে যে মেয়েদের মন অপরাহ্ণবেলায় ব্যাকুল হয়ে ওঠে এবং তাদের মধ্যে আবার যে মেয়েটি জল আনতে যেতে না পেরে শূন্য মনে বসে উঠানের ছায়া দীর্ঘতর আর আকাশের ছায়া নিবিড়তর হতে দেখে,—সে মেয়েটির মুখে সায়াহ্নের বিষণ্ণতা যে সৌন্দর্য রচনা করে, কোল রমণীদের নাচের দৃশ্য বর্ণনায় যেখানে সঞ্জীব বলেছেন আহ্লাদে চঞ্চল কোল যুবতীরা নৃত্য শুরুর প্রস্তুতি-মুহূর্তে তেজঃপুঞ্জ অশ্বের ন্যায় দেহবেগ সংযত করছিল, নৃত্য-বাদ্যের আঘাত মাত্রই সেই যৌবনসন্নদ্ধ কোলাঙ্গনাগণের দেহে একটা অশ্রুত কোলাহল জেগে ওঠার সৌন্দর্য, একটি যুবতীর যুগ্ম ভ্রূ দেখে সঞ্জীবের যখন মনে হয়েছিল যে ঊর্ধ্বে নীল আকাশের কোলে বৃহৎ পক্ষী পক্ষ বিস্তার করে ভাসছে, অথবা, নিদ্রার পূর্বে থাবাটি একবার চেটে সুন্দর নখর-সংযুক্ত থাবাটি দর্পণের মতো মুখের সামনে মেলে সেই সুপ্ত ব্যাঘ্রটি—এই চিত্রগুলির

সৌন্দর্যের সীমা নেই। সঞ্জীবচন্দ্রের মধ্যে শিশুর ন্যায় সব কিছু প্রত্যক্ষ করার অপার কৌতূহল, প্রবীণ চিত্রকরের মতো প্রত্যক্ষ দৃশ্য থেকে গ্রহণীয়টুকুর নির্বাচন এবং ভাবুকের মতো তার মধ্যে নিজ অনুভূতির রস ও সৌন্দর্যবেগের মিশ্রণ ঘটিয়ে অপূর্ব রূপরচনার প্রতিভা ছিল।

'বিদ্যাপতির রাধিকা'

রবীন্দ্রনাথের একটি উচ্চশ্রেণীর সমালোচনা-প্রবন্ধ। রচনাটিতে রাধিকার সৌন্দর্য বিদ্যাপতির পদাবলীর রাধিকার সৌন্দর্যকেও মনে হয় ছাড়িয়ে গেছে। প্রসঙ্গত রবীন্দ্রনাথ চণ্ডীদাসের পদাবলীর রাধিকার সঙ্গে বিদ্যাপতি সৃষ্ট রাধিকা চরিত্রের যে তুলনামূলক আলোচনা করেছেন, তার সৌন্দর্যও অনবদ্য হয়েছে। রাধিকা চরিত্রাবলম্বনে বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের কবি-চরিত্র ও ভাবদৃষ্টির তুলনাটিও সার্থক। বিদ্যাপতির রাধিকার প্রেমে আছে উত্তাপ আর চণ্ডীদাসের রাধিকার প্রেমে আছে গতি। বিদ্যাপতির প্রেমে যৌবনের নবীনতা ও প্রগল্‌ভতা। চণ্ডীদাসের প্রেমে ভাবাবেগের প্রগাঢ়তা ও ধীরতা। বিদ্যাপতির রাধিকা বয়ঃসন্ধির কিশোরী, প্রথম প্রেমের আস্বাদে প্রগল্‌ভা, যৌবনের গৌরবে গরবিনী, প্রসাধনকলাবিলাসিনী। বিদ্যাপতির রাধিকার মনে নব-বসন্তের সমারোহ। আনন্দ-সংগীত সেখানে পঞ্চমস্বরে বাঁধা।

বয়ঃসন্ধির পদেই বিদ্যাপতি অপ্রতিদ্বন্দ্বী। আর অতুলনীয় তিনি রূপানুরাগ ও অভিসারের পদে। তাঁর নবস্ফুটা রাধিকা বয়ঃসন্ধির চঞ্চলতায় অস্থির। দূরে সহাস্য, সতৃষ্ণ, লীলাময়ী; কাছে কম্পিত, শঙ্কিত, বিহ্বল। অসীম তাঁর কৌতূহল, কিন্তু ভীরু। নিজের রহস্যের সে নিজেই সীমা পায় না। কস্তুরীমৃগের মতো তার প্রেমের সৌরভ যে কোন্ উৎস থেকে কোথায় তাকে ছুটিয়ে নিয়ে চলেছে, নিজেই তা সে জানে না। সে অজ্ঞাতযৌবনা। চণ্ডীদাসের রাধিকা জ্ঞাতযৌবনা। গম্ভীর এবং স্থিত-ব্যাকুলা। চণ্ডীদাসের রাধিকা বিষণ্ণ

করুণার প্রমূর্ত প্রতিমা। চণ্ডীদাস বিরহের কবি, সেখানে রাধিকার আর্তির গভীরতা ও ব্যাকুলতাই প্রধান। বিদ্যাপতির রাধিকা নবীন ও মধুরা, বিদ্যাপতি মিলনের কবি।

কিন্তু বিদ্যাপতি সম্বন্ধে এটিই শেষ কথা নয়। যেখানে তিনি জন্ম অবধি রূপ দেখেও নয়ন তৃপ্ত করতে পারেননি, লাখ লাখ যুগ বুকে বুক রেখেও যার হৃদয় শান্ত হোল না, তিনি যে প্রসাধন থেকে সাধন-বেগে, নবীনতা থেকে গভীরতায়, মধুর থেকে বিধুরে পৌঁছেছিলেন, সেটাই শেষ কথা। তবে চণ্ডীদাসের সঙ্গে তাঁর প্রভেদ তবুও থেকে যায়। কেননা চণ্ডীদাসের যেখানে শুরু, বিদ্যাপতির সেইখানেই সারা।

'কৃষ্ণচরিত্র'

'কৃষ্ণচরিত্র' রবীন্দ্রনাথের বিখ্যাত সমালোচনা এবং বোধ করি রবীন্দ্র-নাথের যথার্থতম সমালোচনা। এখানে রবীন্দ্রনাথ ভক্তিবিগলিত অর্ঘ্য রচনা করেননি ; এখানে তিনি সমালোচনা-রূপ পূজার পুরোহিত নন। সমালোচনার মণ্ডন ব্যতীত খণ্ডন নামে যে অংশটি আছে, এখানে তিনি সেই খণ্ডনবাদী সমালোচক। 'কৃষ্ণচরিত্র' গ্রন্থে বঙ্কিমচন্দ্র কৃষ্ণকে একইকালে ঐতিহাসিক পুরুষ এবং অবতার চরিত্র রূপে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিলেন। মহাভারতখানাকেই তাই তাঁকে ইতিহাস বলতে হয়েছে। কিন্তু যেহেতু মহাভারতে প্রচুর অনৈসর্গিক, অতিলৌকিক এবং পৌরাণিক নিদর্শন রয়েছে, সে জন্য বঙ্কিম এর অনেকখানি প্রক্ষিপ্ত মনে করেছেন। রবীন্দ্রনাথ বঙ্কিমের মহাভারতকে কাটছাঁট করে ইতিহাস এবং কৃষ্ণকে একই সঙ্গে ভারত সাম্রাজ্য-নির্মাতা ও ভারত ভাগ্যবিধাতা কূটনীতিজ্ঞ ঐতিহাসিক রাজপুরুষ এবং ঈশ্বরের নরাবতার প্রতিপন্ন করার পাণ্ডিত্যবুদ্ধিকে খণ্ডন করেছেন এবং বেশ কিছুটা তীক্ষ্ণতার সঙ্গেই বঙ্কিমের প্রয়াসের অযৌক্তিকতা দেখিয়েছেন। তাঁর প্রথম যুক্তি—আদি কবির মহাভারতে কৃষ্ণচরিত্র যে সম্পূর্ণ মানুষ, বঙ্কিমচন্দ্রও তা মেনেছেন। তাই তিনি

তাঁর তত্ত্বের প্রতিষ্ঠার জন্য পরবর্তী কবিদের মহাভারত অবলম্বন করেছেন। অথচ এর থেকেই আবার তিনি সুবিধা মতো অংশ প্রক্ষিপ্ত, অনৈতিহাসিক ও অবিশ্বাস্য ইত্যাদি বিবেচনায় ছাঁটাই করেছেন, কিন্তু এজন্য কোন সুনির্দিষ্ট ও যুক্তিসম্মত পন্থা বা মান ধরেননি, তাঁর ব্যক্তিগত আদর্শের প্রয়োজনই হয়েছে গ্রহণ বর্জনের একমাত্র নীতি। দ্রৌপদীকে তিনি অগ্নিসম্ভবা মানেন না বা তাঁর পঞ্চস্বামীত্বেও বিশ্বাস করেন না। কেন করেন না, তার যুক্তি দেননি। দ্বিতীয়ত,—সমস্ত চিত্তবৃত্তির সম্যক অনুশীলনে সম্পূর্ণতাপ্রাপ্ত একটি আদর্শ পুরুষ কবি-কল্পনায় সম্ভব, ইতিহাসে নয়। আসলে বঙ্কিম সারাজীবন যে একজন ভারতভাগ্যবিধাতা বা মানবভাগ্যবিধাতা পুরুষের আবির্ভাব ব্যাকুল-চিত্তে ধ্যান করেছিলেন, অন্তরে যাকে পেয়েছিলেন তত্ত্বরূপে, 'আনন্দ-মঠ-সীতারাম-দেবীচৌধুরানী-চন্দ্রশেখরে'র সন্ন্যাসী বা দিব্য পুরুষগণের চরিত্রে যাকে বার বার চিত্ররূপ দিয়েছেন, ইতিহাসে তাকেই সজীব ও শরীরীভাবে প্রত্যক্ষ করবার আকাঙ্ক্ষা ও নিরতিশয় আগ্রহ থেকে মহাভারতের কৃষ্ণচরিত্রকে তিনি বেছে নিয়েছিলেন। কৃষ্ণচরিত্রের ঐতিহাসিকতা ও অবতারত্ব বা নারায়ণত্ব মহাভারতানুমোদিত নয়; তা বঙ্কিমেরই কল্পনা ও আদর্শের রচনা!

এছাড়া, বঙ্কিমচন্দ্র পাশ্চাত্য মনীষিগণকে 'মূর্খ' ইত্যাদি ভাষায় যে ভাবে অবজ্ঞা প্রকাশ এবং দুর্ব্যবহার করেছেন, রবীন্দ্রনাথ তারও নিন্দা করেছেন। বঙ্কিমের কাছে এমন অশিষ্টতা অপ্রত্যাশিত। তাছাড়া, য়ুরোপীয়গণের প্রতি অহেতুক ও অপ্রাসঙ্গিক খোঁচা দেওয়ার যে প্রবৃত্তি বঙ্কিম 'কৃষ্ণচরিত্র'-এ দেখিয়েছেন, তাও নিন্দার্হ। বঙ্কিম এই গ্রন্থে কেবল য়ুরোপীয় মনীষী নয়, তাঁর সঙ্গে যাঁরাই একমত নন, সেই অদৃশ্য পাঠকগণকেও অপমান করেছেন এবং কলহ করার একটা প্রবৃত্তি দেখিয়েছেন। অনাবশ্যক কলহ পীড়াদায়ক। এর দ্বারা বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর প্রতিষ্ঠিতব্য আদর্শ থেকে স্বয়ং বিচ্যুত হয়েছেন। 'কৃষ্ণচরিত্র' গ্রন্থে বঙ্কিমচন্দ্র পদে পদে তর্ক-যুক্তি, কলহ-বিচার উপস্থিত করে আসল কৃষ্ণচরিত্রটিকে অখণ্ডভাবে প্রতিষ্ঠিত করতে পারেননি।

কৃষ্ণের রুক্মিণী ভিন্ন দ্বিতীয় দার ছিল না প্রমাণ করতে বসে তিনি সুভদ্রা হরণ যে দূষণীয় হয়নি, তা প্রমাণ করতে বসলেন এবং অহেতুক হিন্দুর বহু বিবাহ সমর্থন করে য়ুরোপীয় সমাজে বিবাহ প্রথার নিন্দা করলেন। বিবাহতত্ত্ব নিয়ে বহু আলোচনা হোল এবং পত্নী রুগ্না, ভ্রষ্টা, বন্ধ্যা হোলে পুরুষের দ্বিতীয় দার পরিগ্রহণের নীতির সার্থকতা প্রতিপন্ন করলেন। রবীন্দ্রনাথ এই প্রসঙ্গে প্রশ্ন করেছেন যে অনুরূপ ক্ষেত্রে বঙ্কিম নারীর বহুভর্তৃকা হওয়া অনুমোদন করেন কিনা।

কৃষ্ণ পরমেশ্বরের অবতার এবং সমস্ত চিত্তবৃত্তির সর্বাঙ্গীণ অনুশীলনে উৎকর্ষপ্রাপ্ত নরোত্তম, বঙ্কিমচন্দ্র এই রকম একটি 'থিওরি'র বশীভূত যদি না হতেন এবং মহাভারতকে একখানি কাব্য রূপে আস্বাদ করতে পারতেন, তাহলে কৃষ্ণচরিত্র নিয়ে এমন বিভ্রাটে পড়তেন না।

কৈশোরে রবীন্দ্রনাথ মধুসূদনের 'মেঘনাদবধ' কাব্যের যে রূঢ় সমালোচনা লেখেন, তারপর আর 'কৃষ্ণচরিত্রে'র মতো এমন খাঁটি সমালোচনা তিনি লেখেননি। ভাষায় এমন ধার অন্য সমালোচনায় দুর্লভ।

বঙ্কিমচন্দ্রকে তিনি কত শ্রদ্ধা করতেন এবং বাংলা সাহিত্যে বঙ্কিমচন্দ্রের দান ও স্থান কোথায়, এ সম্বন্ধে তাঁর সুচিন্তিত অভিমত এই গ্রন্থেরই 'বঙ্কিমচন্দ্রে' লক্ষ্য করা গেছে। বঙ্কিম-সাহিত্যের উপর আর একটি আলোচনা এই গ্রন্থে আছে—'রাজসিংহ' প্রবন্ধে। রাজসিংহের সমালোচনা খুবই কৌতূহলোদ্দীপক। এবং এই উপন্যাসে ইতিহাস ও রোমান্সের সার্থক সমন্বয়, দুঃসাহসিক গতিবেগের দ্বারা কাহিনীবৃত্তের বিচ্ছিন্নতা ও বিভিন্নতার প্রবাহ রক্ষা, জেবউন্নিসার চরিত্রায়নে অসাধারণ কল্পনা ও মনস্বিতার পরিচয় প্রভৃতি শিল্পগুণের প্রশংসায় কবি পঞ্চমুখ হয়েছেন। 'কৃষ্ণচরিত্র' প্রবন্ধেও প্রথমে এই গ্রন্থ রচনার দ্বারা বঙ্কিমচন্দ্র যে স্বাধীন মনুষ্যবুদ্ধির জয়গান এবং কৃষ্ণের ঐতিহাসিকত্ব প্রতিষ্ঠার দ্বারা যে মানবমহিমা প্রচার করতে চেয়েছেন, তার জন্য তাঁর ভূয়সী প্রশংসা করেছেন।

'আধুনিক সাহিত্যে' আরো কয়েকটি সমালোচনা আছে।

দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের ‘মন্দ্র’ ও ‘আষাঢ়ে’ কাব্যের সমালোচনায় সমালোচকের সহৃদয়তা যত বেশি আন্তরিকতা তত নয়। ঐ কাব্য দুখানির মূল্যায়নে কবি সাংবাদিক-সমালোচনার পরিচয় দিয়েছেন। শ্রীশচন্দ্র মজুমদারের ‘ফুলজানি’ উপন্যাসের সমালোচনাও গ্রন্থ-পরিচয় জাতীয়; রসগ্রহণ অপেক্ষা বন্ধুপ্রীতিই অধিক।

‘প্রাচীন সাহিত্যে’র প্রবন্ধগুলি সৌন্দর্যবাদী (aesthetic) সমালোচনার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। এর প্রত্যেকটিই নূতন শিল্পসৃষ্টি হয়ে উঠেছে। প্রাবন্ধিক মনের পরিচয় এখানে নেই। কবিমনের পরিচয়টিই সর্বত্র ছড়ানো রয়েছে। একে সমালোচনা না বলাই সঙ্গত, বলা উচিত রচনা। অপরদিকে ‘আধুনিক সাহিত্যে’র সমালোচনাগুলি সমকালীন " " কবির প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা সঞ্জাত। দূরবর্তিতা বা রোমান্টিক কল্পনাভিসারের সুযোগ ছিল না বলেই হয়তো কবি এখানে অনেক বেশি যুক্তিনিষ্ঠ এবং তথ্যশীল হতে পেরেছেন।

‘প্রাচীন সাহিত্যে’র প্রবন্ধগুলি কবি রবীন্দ্রনাথের রসোপভোগ। এমন আশ্চর্য সৃষ্টিধর্মী সমালোচনা রবীন্দ্রসাহিত্যে পূর্বে ও পরে আর পাওয়া যায় নি।

রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যতত্ত্বের মর্মবাণী

সাহিত্য সমালোচনার দুটি অঙ্গ; একটি গ্রন্থ ও গ্রন্থকার বিশেষের আলোচনা, অপরটি সাধারণভাবে সাহিত্যতত্ত্বের আলোচনা। সাহিত্যতত্ত্ব অর্থাৎ কাব্যজিজ্ঞাসা হোল সাহিত্যের মূল নীতি, রীতি ও চরিত্র সংক্রান্ত সাধারণ বিবেচনা। সাহিত্যতত্ত্বের আলোচনায় তিনি প্রধানত সাহিত্যের সত্য ও স্বরূপ নির্ণয় করতে চেয়েছেন। সাহিত্য তাঁর মতে সহিতের বিশেষ্য অথবা স-হিত থেকে বুৎপাদিত। অর্থাৎ যা হিত বা কল্যাণ সাধন এবং সঙ্গদান করে বা মিলন ঘটায় তারই নাম সাহিত্য। অন্তরের সঙ্গে বাহিরের, রূপের সঙ্গে ভাবের, জগতের সঙ্গে জীবনের, ব্যক্তি হৃদয়ের সঙ্গে ব্যক্তি বা সমাজ-হৃদয়ের, জীবনের সঙ্গে প্রকৃতির, এক কথায় যা সীমা ও ভূমির সঙ্গে

অসীম ও ভূমার মিলন ঘটায় বা সহিত-ত্ব দেয় তারই অভিধা সাহিত্য। এই প্রসঙ্গে তিনি সাহিত্যের উপকরণ, তাৎপর্য প্রভৃতি সম্বন্ধেও আলোচনা করেছেন। সাহিত্যে বস্তুতন্ত্র ও রোমান্টিকতার স্থান, সাহিত্যের রস, ধ্বনি ও ফল প্রভৃতি সম্বন্ধেও বিস্তৃত আলোচনা করেছেন বারবার। রবীন্দ্রনাথ সাহিত্যে বাস্তবতা বলতে জৈবিকতা ও দেহতন্ত্র এবং সাময়িক ঘটনাসম্পাত সমূহের বিশ্বস্ত অনুসরণ বলে মেনে নেন নি। তার মতে সাহিত্য প্রকৃতির আরশি নয়, জীবনের যথাযথ প্রতিরূপ বা অনুরূপও নয়। জীবনের সত্য থাকে বস্তুতথ্যে নয়, ভাবাদর্শে। কল্পনাই জীবনের ধ্রুব ও নিগূঢ় ভাবসত্যের সন্ধান পায়। কাল্পনিকতা মিথ্যা, কল্পনা সত্য। কল্পনাই কবিপ্রতিভা এবং সত্য ও সুন্দরের পারস্পরিক অন্বয়টি উপলব্ধি করানোই সাহিত্যের কাজ। প্রাত্যহিক সাংসারিক জীবনের খণ্ড ও ছিন্ন যে সমূহ অভিজ্ঞতা তার বিশ্বস্ত বর্ণনা যদি 'রিয়ালিজম' হয় রবীন্দ্রনাথ তাহলে তাকে সাহিত্যে অপাংক্তেয় করবেন। তাঁর মতে বস্তুতন্ত্র আর বাস্তবতা এক নয়। বস্তুর জড় রূপটি বস্তুতন্ত্র আর বস্তুনিহিত সত্যটি তার বাস্তবতা। সাহিত্যের উপকরণ হল ছবি ও গান। ভাবকে নিজের করে সকলের করাই ললিতকলা এবং সাহিত্যের প্রধান অবলম্বন জ্ঞানের বিষয় নয়, ভাবের বিষয়। মানবহৃদয় ও মানবচরিত্রকে চিত্রে দেহ ও সংগীতে প্রাণ দিয়ে প্রকাশ করে সাহিত্য।

রবীন্দ্রনাথ সাহিত্যের ফলশ্রুতি মানব-কল্যাণের আদর্শে বিশ্বাসী; কিন্তু ঐ আদর্শ-ই সাহিত্যের মোক্ষ বা লক্ষ্যরূপে স্বীকার করেন না। আবার তিনি কলাকৈবল্যবাদেরও ঘোর বিরোধী। সাহিত্যসৃষ্টি মনুষ্যত্বের সার্থকতম এবং পূর্ণতম অভিব্যক্তির ফল। বিশ্বস্রষ্টার সৃষ্টিরই অনুরূপ কবির সৃষ্টি। আর সৃষ্টিকামনার মৌল প্রেরণা আনন্দানুভূতি। আনন্দ থেকেই সবভূতের সৃষ্টি ও গতি। আর আনন্দবোধের উৎস প্রেম ও সৌন্দর্য। সুতরাং মূলতঃ প্রেম, সৌন্দর্য ও আনন্দ থেকে উদ্ভূত ব্রহ্মাস্বাদসহোদর যে কাব্যকলা তার সৃষ্টিরহস্যে

কোন উদ্দেশ্যমূলকতায় কবি অবিশ্বাসী। অথচ উদ্দেশ্যমূলক না হয়েও বিশ্বদেবতা আর জীবনদেবতার যুগলমিলনে বিশ্বজীবন ও বিশ্বজগতে যে রসলোক, সুরলোক ও সৌন্দর্যলোক সৃষ্টি হয়েছে, তার থেকে উৎসারিত সাহিত্য স্বতঃই মানবতার পরমতম কল্যাণ সাধন করে থাকে। সাহিত্যপাঠের ফলে চিত্তোৎকর্ষ হয়, কিন্তু এই ফললাভ হয় পরোক্ষভাবে। সংস্কৃতে ফললাভের তিনটি প্রক্রিয়ার উল্লেখ আছে: প্রভুসম্মিতি, সখাসম্মিতি ও কান্তাসম্মিতি। বেদ, গীতা, সংহিতা প্রভৃতি শাস্ত্র যে শিক্ষা দেয় তা প্রত্যক্ষ এবং বাধ্যতামূলক, তাই শাস্ত্রপাঠের ফল প্রভুসম্মিত; রামায়ণ-মহাভারত গল্পচ্ছলে কৌশলে সহৃদয় সখার ন্যায় নীতি ও জীবনবেদ শিক্ষা দেয়, তাই তা সখাসম্মিত, আর যে রচনা বা সৃষ্টি প্রত্যক্ষ বা কৌশল কোনভাবেই শিক্ষা দেয় না, তত্রাচ কান্তা যেমন প্রেম, আনন্দ, প্রসাধন, সেবা ও সৌন্দর্যের দ্বারা প্রিয়ের হৃদয় হরণ করে এবং তদ্দ্বারা প্রিয়ের হৃদয়কে মহনীয় করে তোলে, তেমনি যে শিল্পসাহিত্য কান্তাসম্মিত উপায়ে উদ্দেশ্যহীন হয়েও সহৃদয়ের কল্যাণ করে, রবীন্দ্রনাথ সেই পন্থাকেই জেনেছেন সাহিত্যের ফল।

রবীন্দ্র-প্রবন্ধ-সমালোচনার ত্রুটি

এই হোল মোটামুটি রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধসমূহের সাধারণ ভাবনা। শিক্ষা, সমাজ, রাষ্ট্রনীতি, সাহিত্য, বিজ্ঞান ও ধর্ম—যে কোন বিষয়েই প্রবন্ধ লিখুন, যুক্তি অপেক্ষা ভাবাবেগের প্রাবল্য রবীন্দ্র-প্রবন্ধের সামান্য লক্ষণ। রবীন্দ্রনাথের রাষ্ট্রাদর্শ, শিক্ষাদর্শ, ধর্মাদর্শ এবং সর্বোপরি শিল্পাদর্শ অতিরিক্ত দর্শনায়িত ও ভাবোচ্ছ্বাসপ্লাবিত হয়েছে। আধ্যাত্মিকতার দ্বারাই তিনি যাবতীয় তথ্যের সত্যটিকে সন্ধান করেছেন। প্রবন্ধ রচনায় আধ্যাত্মিকতা, দার্শনিকতা ও কাব্যময়তাকে কেউ-কেউ ত্রুটি বলতে পারেন। মূল রচনায় বা বিষয়ে যে আধ্যাত্মিকতা ও দার্শনিকতা থাকে তাকে স্পষ্ট ও বোধগম্য করে তোলাই প্রবন্ধ রচনার প্রধান উদ্দেশ্য। অথচ সেই প্রবন্ধই যদি

আধ্যাত্মিক অস্পষ্টতায় ধোঁয়াটে হয়ে যায় তাহলে তা সাহিত্য হয়ত হয়, প্রবন্ধ অন্তত হয় না।

রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধের বড় ত্রুটি এই ভাবুকতা ও আবেগোচ্ছ্বাস। তাছাড়া রবীন্দ্রনাথের সমগ্র সত্তাই ঔপনিষদিক প্রত্যয় দ্বারা এমনভাবে গঠিত যে তিনি যা কিছু অনিত্য, অধ্রুব ও ক্ষণস্থায়ী, ভঙ্গুর ও অপূর্ণ, তার মূল্য ও সংকট ঠিক হৃদয় দিয়ে স্বীকার করতে পারেন নি। সাধারণ মানুষের জীবনে অনিত্য ও ক্ষণস্থায়ী মুহূর্তগুলির সংকট ও বেদনাই চরম, কিন্তু আনন্দবাদী ধ্রুব-কল্যাণে প্রত্যয়ী কবির কাছে ঐ সকল নশ্বর বস্তু এক বিরাট-ব্যাপ্ত অসীম অনুভূতির প্লাবনে নগণ্য হয়ে গেছে। এই অতিজাগতিক প্রত্যয়ের জন্যেই তাঁর প্রবন্ধগুলিতে বস্তুনিষ্ঠা দুর্নিরীক্ষ্য।

রবীন্দ্রনাথের মনীষা ও বৈদগ্ধ্যও ছিল এত বেশি অসাধারণ যে প্রাবন্ধিকের 'নীচুনজর' পাওয়া তার পক্ষে ছিল অসম্ভব। প্রাবন্ধিকের ভূমাবাদী হওয়া চলে না। অবশ্য দার্শনিক প্রবন্ধে নিশ্চয় ভূমাবাদ বা অতিজাগতিকতাই বিষয়, কিন্তু বিষয়টা তো প্রবন্ধ নয়, বিষয়টিকে প্রামাণ্য ও প্রতিষ্ঠিত করাই তার কাজ। রবীন্দ্রনাথ তাঁর প্রবন্ধের পাঠককে তাঁর ভাবের ও ভাষার ইন্দ্রজালে সম্মোহিত করে ফেলেন। কিন্তু তাঁর প্রবন্ধ পাঠ করে পাঠকের বুদ্ধি উৎফুল্ল হয় না। এবং বিষয়টাও তার কাছে স্বচ্ছ হয় না। অথচ সত্যই সে মুগ্ধ হয়। রবীন্দ্রনাথের বক্তব্যের প্রতিবাদ সে করতে পারে না, আবার সর্বান্তঃকরণে তা মেনে নিতেও মন সায় দেয় না। যুক্তির যেমন জোর আছে, গভীর প্রত্যয়নিষ্ঠ আবেগেরও তেমনি জোর আছে। রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধের শক্তি শেষোক্ত ধরনের এবং তদুপরি যুক্ত হয়েছে ভাষার ইন্দ্রজাল।

রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধের প্রথম দোষ যদি হয় 'লিরিসিজম' বা ভাবোচ্ছ্বাস, তার চেয়েও গুরুতর দোষ ভাষার আলংকারিকতা। অমূর্তকে মূর্ত করা, অব্যক্তকে স্পষ্টরূপ দেওয়া এবং ব্যঞ্জনাকে স্ফোট করা প্রবন্ধের অন্যতম দায়িত্ব। রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধে এই দায়িত্ব

সর্বত্র পালিত হয় নি। তিনি প্রবন্ধেও কবিতার মতো গূঢ় ব্যঞ্জনা সৃষ্টি করেছেন। বিশেষ করে সাহিত্য-তত্ত্ব সংক্রান্ত তাঁর প্রবন্ধগুলি বাক্‌শৈলীতে যতই মধুর হয়ে থাকুক, বক্তব্যের প্রতিষ্ঠায় তত্ত্বটি প্রাঞ্জল না হয়ে আরো বেশি রহস্যময়, ধূসর ও অমূর্ত হয়ে গেছে। বামন দণ্ডী-ভামহ-অভিনবগুপ্ত-আনন্দবর্ধন-বিশ্বনাথ, অথবা এরিস্টটল-ক্রোচে থেকে একালের টি. এস. এলিয়ট পর্যন্ত সাহিত্য-সমালোচকগণ যে ভাবে সাহিত্যতত্ত্ব নিয়ে আলোচনা করেছেন, রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য-সমালোচনা-মূলক প্রবন্ধের ধরন তার থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র।

প্রবন্ধে বহু সংজ্ঞা দেওয়া হয় এবং প্রবন্ধের বহু শব্দই পারিভাষিক রূপে ব্যবহৃত হয়। রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধ থেকে কোন বিষয়েই সুনির্দিষ্ট সংজ্ঞা পাওয়া যায় না এবং কবি কখনোই কোন একটি শব্দকে পারিভাষিক অর্থে সর্বত্র ব্যবহার করেন নি। তাঁর প্রবন্ধের কোন ব্যাকরণ এবং ন্যায় নেই। যে বক্তব্যটি তিনি বোঝাতে চেয়েছেন সর্বত্রই উপমা, উৎপ্রেক্ষা, সাদৃশ্য. চিত্রকল্প ও নিদর্শনা অলংকারের সাহায্য নিয়েছেন। প্রবন্ধের ভাষায় উপমা-উৎপ্রেক্ষা-সাদৃশ্য-রূপকল্প-নিদর্শনা-সমাসোক্তি-অপহ্নুতি প্রভৃতি অলংকার অনুচিত। কারণ এর দ্বারা সৌন্দর্য ও মাধুর্য সৃষ্টি হয় বটে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তা মানুষের বুদ্ধি ও যুক্তিবোধকে আচ্ছন্ন করে ফেলে। অলংকরণ মানেই অতিশয়োক্তি। তাছাড়া সাদৃশ্য (analogy) দিয়ে ন্যায়ত (logically) কোন সত্যের প্রতিষ্ঠা হতে পারে না। সাদৃশ্য আপাতপ্রতীয়মান এবং রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যতত্ত্বালোচনায় এই সাদৃশ্য প্রয়োগই সর্বব্যাপী বৈশিষ্ট্য হয়েছে।

উদ্ধৃতি দিয়ে রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধের 'লিরিসিজম', 'ইমেজারি', আলংকারিকতা ও ভাবাবেগপ্রাবল্য প্রদর্শন নিষ্প্রয়োজন; রবীন্দ্রনাথের যে কোন গদ্য রচনাই এর সমূহ দৃষ্টান্ত হতে পারবে।

রবীন্দ্রনাথের গদ্যশৈলীও প্রবন্ধের পক্ষে অনুপযোগী। ব্যক্তিগত রচনায়, যেমন 'ছিন্নপত্র', 'লিপিকা', 'বিচিত্র প্রবন্ধে'র রচনাশিল্পে যে গদ্যশৈলী সম্পদ হয়েছে, নিবন্ধ-সন্দর্ভে তাই হয়েছে বোঝা।

বাগ্‌ভঙ্গির অতি রমণীয়তায় রসসৃষ্টি হয়েছে, শক্তিসৃষ্টি হয় নি। ওজঃগুণের ঘাটতি প্রবন্ধের বীর্যশক্তিকে ক্ষুণ্ণ করেছে। শব্দচয়ন বহুক্ষেত্রে চিত্রধর্মী এবং অত্যন্ত আপেক্ষিক বা ধ্বনিময়। প্রবন্ধের ভাষায় শব্দগুলি যত বেশি অভিধার্থক ও পারিভাষিক হয় ততই শ্রেয়।

রবীন্দ্রনাথের অনেক প্রবন্ধের অন্যতম ত্রুটি তার অতি বিস্তার। যেমন 'বাতায়নিকের পত্র' প্রভৃতি "কালান্তরে"র কয়েকটি প্রবন্ধ। বক্তব্য বিষয় বেশি না হওয়া সত্ত্বেও দীর্ঘসূত্র বাগ্‌বিস্তার ও অপরিমিত পুনরুক্তিদোষ ঘটেছে। রবীন্দ্রনাথের বেশির ভাগ প্রবন্ধে ভাবমর্মটি বা কেন্দ্রীয় বক্তব্যটি অহেতুক অপরিমিত স্থান নিয়েছে। এর কারণ আর কিছু নয়—প্রবন্ধের ভাষার ঋজুতা, দৃঢ়তা ও পারিভাষিকতা গুণ না থাকায় একই কথাকে বারবার মালোপমায় ও সাঙ্গরূপকে সাজিয়ে বলা হয়েছে।

রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধে কবির 'আমি' পুরুষটির সদা উপস্থিতিও প্রবন্ধ হিসাবে মর্যাদা বৃদ্ধি করে নি। প্রাবন্ধিকের পক্ষে নৈর্ব্যক্তিকতা, নিরপেক্ষতা ও বস্তুতন্ময়তা বড়ো গুণ। ব্যক্তিগত রুচি ও ধ্যানের নিরঙ্কুশ প্রাধান্যও রবীন্দ্র-প্রবন্ধকে অনেকটা দুর্বোধ্য করেছে।

ফলশ্রুতি

প্রাবন্ধিক হিসাবে রবীন্দ্রনাথকে বিচার না করলেই কবির প্রতি কর্তব্য করা হবে। ভূমিকাতেই তাই আমরা বলেছিলাম যে মহাকবি ও মহৎ শিল্পীর প্রতিভা ও স্বভাবের সঙ্গে প্রাবন্ধিক স্বভাবের কোনক্রমে মিল হতে পারে না। বিরাট বিপুল সৃষ্টিধর মহৎ কবি-প্রতিভার পক্ষে প্রাবন্ধিকের পরগাছাবৃত্তি অসহনীয়। তাই ব্রহ্মাতুল্য মহাকবিগণের কেউই মৌলিক সৃষ্টির বাইরে সৃষ্টিরহস্য উদ্‌ঘাটন করতে বসে প্রবন্ধ লেখেন নি। রবীন্দ্রনাথ মহাকবি বা মহৎ শিল্পী বললে তাঁর সম্বন্ধে সবটা বলা হয় না। রবীন্দ্রনাথ কালিদাস, শেক্সপীয়র বা গ্যয়টে নন। কালিদাস, শেক্সপীয়র, গ্যয়টেরা মহৎ কবি, এবং মনীষীও। রবীন্দ্রনাথ কবি, মনীষী এবং সাধক।

শেক্সপীয়রের সুমহান প্রতিভা নাটক ও কবিতা আশ্রয় করেছিল, গ্যয়টেরও তাই। কালিদাস তো নিছক মহৎ শিল্পী। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের মতো শিক্ষা, সমাজ, সাহিত্য, শিল্প, দর্শন, ধর্ম, রাষ্ট্রনীতি, বিজ্ঞান এবং কর্মযজ্ঞ—জীবনের সর্বক্ষেত্রে সমান আগ্রহ, কুশলতা ও পরিপূর্ণ মনুষ্যত্ব নিয়ে পৃথিবীর কোন দেশে, কোন কালে, কোন প্রতিভার আবির্ভাব হয় নি। এক টলস্টয় ছাড়া রবীন্দ্রনাথের মতো কাব্যজীবনের সাধনাকে বাস্তব সংসারের জীবনে আর কোন্ মহাকবি প্রতিষ্ঠিত করে গেছেন? শ্রীনিকেতন ও শান্তিনিকেতন রচনা রবীন্দ্রনাথ ছাড়া আর কোন দেশে কোন কবি করেন নি। প্রাবন্ধিক রবীন্দ্রনাথের শ্রেষ্ঠ পরিচয় বহন করছে শ্রীনিকেতন, শান্তিনিকেতন ও বিশ্বভারতী। কারণ প্রবন্ধের মূল প্রেরণা এক ধরনের সংগঠনকামনা—জ্ঞানকে কর্মকাণ্ডে প্রয়োগ করাই প্রবন্ধ রচনার তাগিদ দেয়, রবীন্দ্রনাথ যা চিন্তা করেছেন তাকে আবেগের সঙ্গে প্রকাশ করেছেন প্রবন্ধে আর বাস্তব রূপ দিয়েছেন শান্তিনিকেতনে। প্রবন্ধের ত্রুটি সেরে নিয়েছেন সংগঠন-কর্মে।

নাট্যকার, চিত্রশিল্পী, প্রবন্ধকার, ঔপন্যাসিক প্রভৃতি খণ্ড খণ্ড ভাবে বিচার করলে কবিতা, সংগীত এবং ছোটোগল্প ব্যতীত অন্য সব ক্ষেত্রেই রবীন্দ্রনাথের অসম্পূর্ণতা ধরা পড়বে। কিন্তু ঐভাবে বিচারটাই হবে গর্হিততম ভ্রান্তি। রবীন্দ্রনাথের নাটক, চিত্র, শান্তিনিকেতন এবং প্রবন্ধ তাঁর সার্বভৌম কবিসত্তারই অঙ্গ, স্বতন্ত্র কোন অস্তিত্ব নয়।

এইজন্যই বলছি, রবীন্দ্রনাথ প্রাবন্ধিক বা প্রবন্ধ-বিজ্ঞানী নন, তিনি প্রবন্ধ-শিল্পী। শিল্পীর থাকে রূপরচনার আবেগ আর কৌশল। এই আগ্রহ ও কৌশল তিনি যে গদ্যরচনাগুলিতে রূপ দিয়েছেন সেগুলিও তাই যথাবিধি শিল্পকর্ম হয়ে উঠেছে। তাঁর শিল্পীসত্তার ললিতকলার (art-এর) দিকটি প্রকাশ পেয়েছে এই প্রবন্ধগুলিতে, আর কর্মীর কারিগরির দিকটি (craftsmanship) রূপ পেয়েছে শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্যাশ্রম সংগঠনে।

চতুর্থ-উদ্যোগ

রচনা-শিল্পী রবীন্দ্রনাথ

রচনার সংজ্ঞা

অধ্যাপক ভূদেব চৌধুরী যাকে স্বগত প্রবন্ধ বলেছেন সেই Essay জাতীয় ব্যক্তিগত গদ্য নিবন্ধগুলিকে আমরা রচনা শিল্পের অন্তর্ভুক্ত করছি। রচনাশিল্প প্রবন্ধ নয়, সমালোচনা নয়, গদ্য-কবিতা নয়, গল্পকথা নয়; এর সংজ্ঞাটি এই রকম হতে পারে: যে গদ্য রচনায় বিষয় উপলক্ষ্য মাত্র, এবং লক্ষ্য আদৌ নেই বললেই হয়; যে লেখায় সামান্য বিষয়কে গুরুতর দার্শনিক তত্ত্বে বা কবিত্বে তুলে নিয়ে অপ্রত্যাশিত ও অসামান্য মহিমারোপ অথবা বিপরীতভাবে গুরুতর বিষয়কে তুচ্ছ ও নগণ্যতায় নামিয়ে এনে তাকে কৌতুকরসের সামগ্রী করে লেখক খেয়ালখুশির (mood) পরিচয় দেন; যে লেখায় ভাবুকতা ও দার্শনিকতা গুরুগম্ভীর পাণ্ডিত্য (high seriousness) তর্কবিতর্ক ও তত্ত্বালোচনা প্রভৃতি বাদ দিয়ে হৃদয়ের অন্তঃস্থল থেকে স্বতোৎসারিত হয়; এবং যে লেখায় কোথাও স্রষ্টার বিষণ্ণতা, কোথাও বা আমেজী প্রসন্নতা, আবার কোথাও কোথাও দুই-এর একত্র সমাবেশ হয়,—তেমন কোন অনতিদীর্ঘ, আবেগোৎসারিত, ছন্দস্পন্দিত গদ্যকথিকাকে রচনাশিল্প বলা যেতে পারে।

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে রচনাশিল্পে বিষয়-গৌরব কিছু নয়, রচনা-রস-সম্ভোগই সব। রচনা-রস-সম্ভোগ বলতে বোঝাচ্ছে রচনা-শৈলীর অপূর্বতা। ব্যক্তিগত প্রবন্ধে লেখকের ব্যক্তিত্বই মুখ্য। এই ব্যক্তিত্ব (style) কিভাবে প্রকাশ পেয়েছে সেটিই এর শিল্পত্ব। রবীন্দ্রনাথের 'রচনা'র গদ্যশৈলী এবং ব্যক্তিত্বের অনবদ্যতা নিয়ে বর্তমান প্রবন্ধে উপসংহারে আমরা আলোচনা করব।

রচনার বিচিত্র স্বভাব

এই প্রসঙ্গে ইংরাজী Essay নিয়ে কয়েকটি কথা বলে নেওয়া যেতে পারে। জীবনচরিত, চিঠিপত্র, দিনলিপি এবং কথাসাহিত্য বাদ দিয়ে অবশিষ্ট গদ্যসাহিত্য ইংরাজীতে Essay নামে চলে। আমরা ইতিপূর্বে যাকে প্রবন্ধ বলেছি ইংরাজী ভাষা সেই Treatise ও Dissertation-এ বিপুলভাবে সমৃদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও ঐ নামটা তেমন প্রচলিত নয় এবং Essay কথাটিই সর্বত্র চলে থাকে। বাংলায় এর বিপরীত। এখানে রচনা ও নিবন্ধ নির্বিশেষে প্রবন্ধ চলছে।

য়ুরোপীয় Essay-র উদ্গাতা মতেঁর মতে টুকরো-টুকরো প্রসঙ্গ ও উদ্ধৃতি, কিছু সংক্ষিপ্ত ও ভাসা-ভাসা ভাবনা আর কতকটা মনের নির্যাস ও প্রতিবিম্ব যে গদ্যলেখায় পাওয়া যায় তারই নাম Essay। ['an essay of Montaigne is a medley of reflectives, quotations and anecdotes'—Hudson. p. 331.] কোন একটি বিষয় বা ভাবনাকে উপর-উপর ছুঁয়ে ছুঁয়ে যাওয়াই তাঁর মতে Essay। অপরপক্ষে ইংরাজী প্রবন্ধের উদ্গাতা বেকনের মতে Essay হোল বিস্তৃত বিশ্লেষণহীন জমাট কিছু জ্ঞানালোচনা—['concentrated wisdom, with little elaborations of the ideas exprerssed.'—Hudson p. 331]। নিরুদ্বিগ্নভাবে সংক্ষিপ্ত অথচ তাৎপর্যপূর্ণ কিছু তত্ত্ব পরিবেশন বেকনের Essayর ধর্ম ['brief notes set down significantly rather than anxiously.']।

ফরাসী সাহিত্যে Essay যে অর্থে প্রযুক্ত ইংরাজীতে ঠিক সে-অর্থে কোন দিনই তা ব্যবহৃত হয় না। বেকনের সংজ্ঞায় জ্ঞানালোচনাই Essayর বিষয় বলা হয়েছে এবং লকের হাতে এরই চরম দৃষ্টান্ত পাওয়া গেছে। লকের Essay দার্শনিক জ্ঞানালোচনায় ঠাসা (close packed with philosophic matter.)। মেকলে এবং হার্বার্ট স্পেন্সরের Essayও অনুরূপ এবং বেকন-কথিত সংক্ষিপ্ততা ও অগভীর অসংহতিও তাতে নেই। অর্থাৎ বেকন থেকে মেকলে-স্পেন্সার পর্যন্ত ইংরাজী Essay বস্তুত প্রবন্ধ বই

নয়। অ্যাডিসনের Essay-র মধ্যে পাণ্ডিত্য ও বৈঠকী আমেজের মিশ্রণ ঘটেছে; জ্ঞানালোচনাও আছে, তবে তা তরল এবং জোলো ('The thought is thin and diluted'.)।

ইংরাজীতে রচনা-শিল্প অর্থে Essay লিখেছেন প্রথম জনসন। তিনি Essayর যে রূপনির্ণয় করেছেন সেটিই হল যথার্থ রচনা-শিল্পের সংজ্ঞা: হৃদয়রসে জারানো, শিথিল-বিস্তার, অবিন্যস্ত এবং অনতিদীর্ঘ ['a loose sally of the mind, an irregular, undigested piece'.] লেখাই যথার্থ রচনাশিল্প।

রবীন্দ্র রচনার বৈশিষ্ট্য ও শ্রেণী

রবীন্দ্রনাথের রচনা-শিল্পের সঙ্গে তুলনা করা চলে এমন একজনও য়ুরোপীয় কবি-সাহিত্যিককে স্মরণ করতে পারছি না। তাঁর কোন রচনাই মতেঁর মতো কেবল বিষয়-বিশেষের ছায়া-সম্পাত (reflection), বা ভাসা-ভাসা টুকরো-টুকরো আলোচনা নয়। বেকন, লক, মেকলে বা স্পেন্সারের Treatise-ধর্মী Essay-র মতো বিশুদ্ধ প্রবন্ধও (Critical Essays) তিনি লেখেন নি। জনসনের মতো তাঁর ব্যক্তিগত নিবন্ধগুলি নিছক অবিন্যস্ত, শিথিল-বিস্তার হৃদয়-নির্যাসও নয়। বেকন, লক, স্পেন্সারের মতো নির্ভেজাল প্রবন্ধ (Treatise) এবং জনসন, ল্যাম্বের মতো নির্ভেজাল রচনা (Essay) কোনটাই রবীন্দ্রনাথে পাওয়া যায় না। তাঁর সব রচনাই মিশ্র। হৃদয়রসের (loose sally of the mind) সঙ্গে সর্বদাই কিছু পরিমাণ প্রজ্ঞা (wisdom) মিশেছে। য়ুরোপীয় প্রাবন্ধিকগণ কেউই কবি ছিলেন না; প্রবন্ধ রচনাই তাঁদের সাহিত্য-সাধনার একমাত্র বিষয় ছিল। কবি-প্রতিভার সঙ্গে ঋষি মনীষা যুক্ত হয়ে রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিত্ব সৃষ্টি করেছে। এরকম ব্যক্তিত্ব জগতে কোন কালে হয়নি। তাই বিশ্বসাহিত্যের কোন মহারথীর সঙ্গেই রবীন্দ্রনাথের সমতুল্যতা সন্ধান সার্থক হয় না।

রচনাশিল্পের যে সংজ্ঞা পূর্বে দেওয়া হয়েছে তদনুযায়ী চার রকম

রচনা এর অন্তর্ভুক্ত হতে পারে: (ক) পত্র সাহিত্য (খ) ভ্রমণ সাহিত্য; (গ) স্মৃতিকথা এবং (ঘ) ব্যক্তিগত কথিকা সাহিত্য।

বর্তমান প্রবন্ধে আমরা রবীন্দ্রনাথের সমস্ত এই জাতীয় গ্রন্থের আলোচনার অবকাশ পাব না। তাই পত্রসাহিত্য থেকে 'ছিন্নপত্র', ভ্রমণসাহিত্য থেকে 'পথের সঞ্চয়', ব্যক্তিগত নিবন্ধ থেকে 'বিচিত্র প্রবন্ধ', এবং স্মৃতি-সাহিত্য থেকে 'জীবনস্মৃতি' প্রত্যেক শ্রেণীর প্রতিনিধিস্থানীয় এই প্রধানতম গ্রন্থগুলির বিস্তৃত আলোচনার চেষ্টা করব।

পত্র সাহিত্য : ছিন্নপত্র

১৮৮৫ থেকে ১৮৯৫ খ্রীঃ এর মধ্যে 'ছিন্নপত্রে'র চিঠিগুলি রচিত। মোট ১৫২ খানি চিঠির মধ্যে মাত্র প্রথম ১৩খানি ১৮৮৫ থেকে ১৮৯০ খ্রীঃ এবং অবশিষ্টগুলি শেষের পাঁচ বৎসরের। 'ছিন্নপত্রের' আগাগোড়াই কবিচিত্তের প্রসন্নতার আমেজ এবং পরিহাসরসের স্নিগ্ধতা রয়েছে, তথাপি প্রথম পাঁচ বৎসরের প্রথম তেরখানি পত্রে (শ্রীশচন্দ্র মজুমদারকে লিখিত) বস্তুত কৌতুক পরিহাসই একমাত্র রস এবং সর্বত্র কেবল একটি হালকা লঘু সহজ আমেজীভাব। 'ছিন্নপত্রের' অধিকাংশের সঙ্গে বা সমগ্রতার সঙ্গে অর্থাৎ মূল সুরের সঙ্গে এই প্রথম গুটিকয় পত্রের আমেজীভাব তথা নিছক কৌতুক হাস্যরসের তেমন কিছু সম্পর্ক নেই। সময় এবং সুর সবদিক বিচার করে তাই সঙ্গতভাবেই মনে করা চলে যে 'ছিন্নপত্র' বস্তুতঃ ১৮৯১ থেকে ১৮৯৫ এই পাঁচ বৎসরের সৃষ্টি।

এই পাঁচ বৎসরে রবীন্দ্রনাথের জীবন অতিবাহিত হয়েছে পূর্ব ও উত্তর বাংলায়, পদ্মা ও তার শাখানদীগুলির উপর, নৌকাবোটে বা নদীকূলের বাংলায়। প্রথম তেরখানি চিঠি লেখার মধ্যে কালগত প্রভেদ যেমন বিপুল, স্থানগত ব্যবধানও তেমনি সুদূর। কিন্তু ছিন্নপত্রের বাদবাকি চিঠিগুলি আদৌ বিচ্ছিন্ন নয়; যে-মূল সুরের ঐকতানে এই এতগুলি পত্রের মধ্যে অবিচ্ছিন্ন ঐক্যসূত্র রচিত হয়েছে,

তার মূলে রয়েছে স্থান ও কালের, প্রতিবেশ ও পরিবেশের অখণ্ড বাতাবরণ। অর্থাৎ পদ্মা ও তার দুইকূলের শ্যামপল্লীবীথি, তার নিরবচ্ছিন্ন আকাশ-মাটির ছবি ও গানই ছিন্নপত্রের প্রাণ। এদিক দিয়ে দেখতে গেলেও ছিন্নপত্রের প্রথম ১৩খানি পত্র অর্থাৎ প্রথম পাঁচটি বৎসর মূল গ্রন্থের সঙ্গে খাপছাড়া। এগুলি বর্জিত হয়ে ১৮৯১ থেকে ১৮৯৫ এর মধ্যে একটি নিটোল অখণ্ড সময়ে সাজাদপুর-পতিসর —শিলাইদহের ভৌগোলিক সীমায় পদ্মার সুর আর পল্লীর রেখাচিত্রের সমন্বয়ে ছিন্নপত্রে যে অসীম আকুলতা, যে সৌন্দর্য-বেদনা, যে মানবপ্রীতি, তারই রসরূপে সে 'এক' এবং রবীন্দ্র সাহিত্যে নয়, সমগ্র বাংলা সাহিত্যেও সে অনন্য।

"ছিন্নপত্র" পত্রসংকলনের অনুরূপ নামকরণের হেতু সম্ভবত এই যে এই পত্রধারার চিঠিগুলির সব কয়টিই আংশিকভাবে সংকলিত হয়েছে। চিঠিগুলি যেভাবে লেখা হয়েছিল সেভাবেই মুদ্রিত করা হয়নি। মূল চিঠিগুলির মধ্যে কবির পারিবারিক ও ব্যক্তিগত যে সকল প্রসঙ্গ উল্লেখিত ছিল সেগুলি সযত্নে বিচ্ছিন্ন করে নিয়ে কেবল ব্যক্তি নিরপেক্ষ সাহিত্যগুণান্বিত অংশগুলিই সংকলন করা হয়েছে। এমন কি চিঠির মধ্যে ব্যক্তিবিশেষের নামের উল্লেখ যেখানে যেখানে ছিল সে-সকল স্থানগুলি পর্যন্ত ড্যাশ দ্বারা উহ্য রাখা হয়েছে। এইভাবে মূল পত্রগুলিকে খণ্ডিত ও বিচ্ছিন্ন করে প্রকাশ করা হয়েছে বলেই, এর নামকরণ হয়েছে ছিন্নপত্র।

ছিন্নপত্রের এই বিচ্ছিন্নতার জন্য অজিতবাবু খেদ প্রকাশ করে বলেছেন, "কবির জীবিতকালে প্রকাশিত হইতেছে বলিয়া ইহাদিগকে তিনি ছিন্ন আকারে উড়াইয়া দিয়াছেন।...সম্ভবতঃ সংকোচ তাহার কারণ। এই জন্য এই চিঠির টুকরাগুলির মধ্যে সেই ব্যক্তিগত রসটি নাই, চিঠিমাত্রেরই যেটি বিশেষ রস। একটি পূর্ণ প্রস্ফুটিত কমল শতদলে বিদীর্ণ হইয়া বিক্ষিপ্তভাবে ইতস্ততঃ ভাসিয়া বেড়াইলে তাহার যেমন অবস্থা হয়, এই ছিন্নপত্রগুলিরও সেইরূপ অবস্থা হইয়াছে। ইহার প্রত্যেকটি পত্র সেই নন্দনগন্ধটুকু বহন করিতেছে

বটে, কিন্তু ছিন্ন হইবার বেদনার রক্তলেখা ইহাদের গায়ে লাগিয়া আছে।"

ছিন্নপত্রের বিচ্ছিন্নতার জন্য এইভাবে বেদনাবোধ করার অনতি-বিলম্বেই কিন্তু সৌন্দর্যবাদী শিল্পী-সমালোচক অজিতবাবু প্রবোধ লাভ করতে পেরেছেন ছিন্নপত্রের বিচ্ছিন্নতা সত্ত্বেও অন্তর্নিহিত ঐক্যের ও অখণ্ডতার সন্ধান লাভ করে। তাই তিনি তৎক্ষণাৎ বলছেন—"কিন্তু না বোধহয়···এ চিঠিগুলি ঠিক ছিন্নদলের মত নয়, কারণ ইহাদের মধ্যে যে একটি ভাবসামঞ্জস্য দেখিতে পাইতেছি।"

এই ভাবসামঞ্জস্যটিই ছিন্নপত্রের ঐক্যসূত্র। কিন্তু এই ভাবটির স্বরূপ কি এবং ভাবের সামঞ্জস্যটাই বা কেমন?

স্থান এবং কালের উপর কবির ভাবের অধিষ্ঠান। কবির মেজাজ, আবেগ, কল্পনা, অনুভূতি অনেকখানিই কবির তৎকালীন অবস্থানের স্থান ও কালের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত বা প্রভাবিত হয়; এইজন্যই একই কালে, একই স্থানে বা পটভূমিতে রচিত বা অঙ্কিত শিল্পীর সৃষ্টির মধ্যে ভাবগত ঐক্য পরিদৃষ্ট হয়। ছিন্নপত্রের পত্রধারার অন্তর্নিহিত ভাব-সামঞ্জস্য রচিত হয়েছে প্রথমত ঐ রচনাগুলির স্থান ও কালের অখণ্ড বাতাবরণের ঐক্যসূত্রে।

রচনার স্থান, কাল, পরিবেশ ও পটভূমি এক হওয়ার দরুনই কবিমানসের ভাবাবেগ, স্বপ্ন-কল্পনা ও 'মুড'ও ছিল পদ্মার প্রবাহের মতোই অখণ্ড ও অনবচ্ছিন্ন। ছিন্নপত্রের পত্রগুলি পদ্মার দৃশ্যসূত্রে গাঁথা বলেই তার ভাবসামঞ্জস্য অব্যাহত রয়েছে।

স্থান, কাল, পরিবেশ ও বাতাবরণের অখণ্ড পটভূমিতে রচিত হওয়ায় ভাবের যে রস, রূপ, ছন্দ ও সুরটি ছিন্নপত্রকে একটি পরিপূর্ণ প্রস্ফুটিত পদ্মরূপে বিকশিত করে তুলল, সেই ভাবটি হল রবীন্দ্রনাথের সর্বানুভূতি, তাঁর বিশ্ববোধ। "রবীন্দ্র কাব্যের মূলসুরটি কি? সেটি প্রকৃতির প্রতি একটি অতিনিবিড়, অতিগভীর প্রেম।" ('রবীন্দ্রনাথ': অজিত চক্রবর্তী, পৃঃ ১৫), "রবীন্দ্রনাথের জীবনে ও কাব্যে সবচেয়ে বড় প্রভাব বিশ্বপ্রকৃতির। প্রকৃতি তাঁহার কাছে

সবচেয়ে জীবন্ত, সবচেয়ে সত্য সত্তা।" (প্রমথনাথ বিশী : 'রবীন্দ্র-বিচিত্রা' পৃঃ ১৫৩)।

রবীন্দ্রনাথের সকল বৈচিত্র্য ও সীমাবোধের যে আনন্দলোকে উত্তরণ ঘটেছে, সে হোল কবির অসীম প্রকৃতি চৈতন্য। "প্রকৃতির সঙ্গে যোগের এই ভাবটিকে রবীন্দ্রনাথ উত্তরকালে বিশ্ববোধ নাম দিয়াছেন, সর্বানুভূতি বলিয়াছেন। সমস্ত জলস্থল আকাশকে, সমস্ত মনুষ্য-সমাজকে আপনার চৈতন্যে অখণ্ড পরিপূর্ণ করিয়া অনুভব করিবার নামই সর্বানুভূতি।"

"এই সর্বানুভূতিই কবির জীবনের ও কাব্যের মূল সুর।" আর ছিন্নপত্রের ভাবসামঞ্জস্য বা মূলগত ঐক্যও সাধিত হয়েছে এই নিসর্গ-বোধাশ্রয়া সর্বানুভূতির মধ্যে।

ছিন্নপত্র মুখ্যত কবির প্রকৃতি-চৈতন্যের গদ্যকাব্য। "জীবন-স্মৃতি"তে প্রকৃতির সঙ্গে মিলনের আকুতি আছে, আর আছে ক্বচিৎ কখন কিভাবে তিনি সেই প্রকৃতি-রাধিকার ক্ষণমিলন লাভ করেছেন তারই অপূর্ব অভিব্যক্তি। আর "ছিন্নপত্রে"র কবি প্রকৃতির সঙ্গে ঘর করেছেন; ছিন্নপত্র যেন তাঁর প্রকৃতির সঙ্গে নিত্য দিব্যলীলার পদাবলী। বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গে প্রণয় এখানে পরিণয় লাভ করেছে; তারই আনন্দ বেদনায়, রহস্য ও বিস্ময়ে বিমুগ্ধ আত্মার স্বগতোক্তি যেন ছিন্নপত্র। কবি যেন পদ্মা-প্রকৃতির মনোরম শ্যামশ্রীর সীমাহীন সৌন্দর্যে বিমূঢ় হয়ে এই প্রকৃতির উদ্দেশ্যেই বললেন—"তোমারেই যেন ভালবাসিয়াছি শতরূপে শতবার, জনমে জনমে যুগে যুগে অনিবার।"

বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গে এই অন্তরঙ্গতার ভাবটিই ছিন্নপত্রের মূল সুর। প্রকৃতির সহিত কবির জন্ম-জন্মান্তরের, সৃষ্টির ঊষাকাল থেকে চিরায়ত সম্পর্কটি ছিন্নপত্রের পাতায় পাতায় প্রতিধ্বনিত হয়েছে। কবি উপলব্ধি করছেন যে তিনি একদিন মৃত্তিকা ও ঘাস-লতাপাতার সঙ্গে আত্মলীন হয়েছিলেন :—

"এক সময়ে···আমি এই পৃথিবীর সঙ্গে এক হয়ে ছিলুম···আমার উপর সবুজ ঘাস উঠত; শরতের আলো পড়ত···আমার এই চেতনার

প্রবাহ পৃথিবীর প্রত্যেক ঘাসে এবং গাছের শিকড়ে শিকড়ে শিরায় শিরায় ধীরে ধীরে প্রবাহিত হচ্ছে, সমস্ত শস্যক্ষেত্র রোমাঞ্চিত হয়ে উঠছে এবং নারকেল গাছের প্রত্যেক পাতা জীবনের আবেগে থরথর করে কাঁপছে।" [পত্রসংখ্যা ৬৪]

"আমি বেশ মনে করতে পারি, বহু যুগপূর্বে যখন তরুণী পৃথিবী সমুদ্রস্নান থেকে সবে মাথা তুলে উঠে তখনকার নবীন সূর্যকে বন্দনা করছেন, তখন আমি এই পৃথিবীর নূতন মাটিতে কোথা থেকে এক প্রথম জীবনোচ্ছ্বাসে গাছ হয়ে পল্লবিত হয়ে উঠেছিলুম।...আমরা দুজনে মুখোমুখি করে বসলেই আমাদের সেই বহুকালের পরিচয় যেন অল্পে অল্পে মনে পড়ে।" [পত্রসংখ্যা ৬৭]

এই উদ্ধৃতি দুটির পর বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের পরবর্তী ঘনিষ্ঠতার স্বরূপ সম্বন্ধে আর বাগবিস্তার নিষ্প্রয়োজন।

"ছিন্নপত্র" রচনা পর্যায়ে রবীন্দ্রনাথের প্রকৃতি-চেতনা যে কি সর্বাত্মক ও সর্বানুভূতি আচ্ছন্ন, তা বোঝা যায় যখন দেখি এই সময়ে রচিত "সোনার-তরী-চিত্রা-চৈতালী" কাব্যত্রয়ী তো বটেই, এমন কি "গল্পগুচ্ছের" গল্পগুলি পর্যন্ত প্রকৃতির রূপক ও প্রতীকে রূপায়িত। "অধিকাংশ গল্পই প্রকৃতির এক একটি অনুভাবকে প্রকাশ করিবার আবেগেই লিখিত।"

রবীন্দ্রনাথের প্রকৃতি-চেতনা কিন্তু প্রকৃতির ইন্দ্রিয়-সৌন্দর্যের চেয়ে সৌন্দর্যের সন্ন্যাসী বা সৌন্দর্যের বৈরাগীরূপে অধিক আকৃষ্ট হয়েছে।

"ছিন্নপত্রে" তাই প্রকৃতির বর্ণবিলাস বা প্রসাধন-সৌন্দর্যের বর্ণনা বিরল, আর তার সর্বত্র কোন বিষণ্ণ করুণ অনাসক্ত রূপেরই আধিক্য।

সুখপাঠ্যতা, গীতিধর্মিতা (lyricism) চিত্রকল্পিতা (imagery) প্রকৃতি-তন্ময়তা, সৌন্দর্যের অসীম উপলব্ধির আর্তি ও করুণায় "ছিন্নপত্র" রবীন্দ্র-কবিজীবনের ভাষ্য। 'জীবন স্মৃতি'র মতোই 'ছিন্নপত্র' রবীন্দ্রনাথের প্রথম 'কবি কাহিনী', কবির অন্তরতম 'আত্মপরিচয়'। একখানি স্বয়ংসম্পূর্ণ সুখপাঠ্য গদ্য-গীতিকাব্য এবং রবীন্দ্রনাথের কবিসত্তার 'prelude'—'আত্মদর্শন', বা রবীন্দ্র-উপলব্ধির প্রথম

'উপনিষদ' রূপে ছিন্নপত্রের যে অসীম মূল্য, তা বাদ রেখে, অন্যভাবেও কেবল সমালোচক কি তথ্যোৎসুক পাঠকের বস্তু-সংবাদ সন্ধানী কৌতূহলী চিত্তের খোরাকও এই পত্রসংকলনখানি অপর্যাপ্তভাবে সরবরাহ করে থাকে। ১৮৯১ থেকে ১৮৯৫-এর অন্তর্বর্তীকালে রবীন্দ্রনাথ যে সকল কবিতা ও গল্প রচনা করেছেন, সে সকলের উপকরণ ও উপাদান, প্রতিবেশ ও পরিবেশ, আবহ ও আবরণ, চিত্র ও চিত্রকল্প, আমেজ ও আবেশ—এই ছিন্নপত্রের মধ্যে রয়েছে। কেবলমাত্র সংগ্রহী ও সন্ধানীর আনন্দ নিয়েও তাই 'ছিন্নপত্র' সমান উপভোগ্য।

এই পর্বে কবির 'সোনার-তরী', 'চিত্রা' ও 'চৈতালী' এই কাব্যত্রয়ী, 'গল্পগুচ্ছ'-এর ছোটগল্পগুলি এবং 'সাধনা' পত্রিকার জন্য (১৮৯১—৯২) 'পঞ্চভূতের ডায়েরী' এবং রাষ্ট্রতত্ত্ব, সমাজতত্ত্বের নানা সাংবাদিকসুলভ বিবিধ প্রবন্ধ রচনা চলছে। 'মানসী' কাব্য রচনার পালা 'ছিন্নপত্রের' ভূমিকায় আর 'চৈতালী' রচনার শেষ এবং 'সাধনা' পত্রিকার অবলুপ্তিতে তার উপসংহার। বলা চলে পদ্মানদী, গ্রাম বাংলা আর 'সাধনা' পত্রিকা এই সময়ের সমস্ত রচনার ধাত্রী।

সংক্ষেপে কোনোরূপ আলোচনা ব্যতিরেকে, সূত্রাকারে মাত্র, ছিন্নপত্রের কোন পত্রে সমকালীন গল্প ও কবিতা রচনার কতটুকু প্রাথমিক উপকরণ বা অভিজ্ঞতার আভাস পড়েছে, তা নীচে উল্লেখ করা হোল।

(ক) "সোনার তরী" কাব্যের 'সোনার তরী' ও 'শৈশব সন্ধ্যা' কবিতা দুটির ভাবাবেগের আভাস আছে যথাক্রমে ৮৮ ও ১০৮ নং পত্রে। ৩৮, ৬৪, ৬৭, ৭৭ নং পত্রে 'সমুদ্রের প্রতি', ১৮ নং পত্রে 'অক্ষমা' ও 'দরিদ্রা', ১৮ ও ১৯ নং চিঠিতে 'যেতে নাহি দিব', ৯২ নং চিঠিতে 'দেউল' ও 'জালফেলা', ৫৮ নম্বরে 'আকাশের চাঁদ' ও 'পরশপাথর' এবং ৩৬, ৫৭, ৬৪, ৬৭ নম্বর পত্রে 'বসুন্ধরা' কবিতার ভাবগত সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়।

(খ) "চিত্রা" কাব্যের 'গানভঙ্গ', 'পূর্ণিমা', 'সাধনা' কবিতাগুলির

মিল আছে যথাক্রমে ৬১, ১৫১, ১২৭ নং চিঠির সঙ্গে। ২২ ও ২৬ নং চিঠিতে 'সুখ' এবং ১০২ নম্বরে 'অন্তর্যামী' ও 'জীবনদেবতা' কবিতা দুটির ভাবসঙ্গতি পাওয়া যায়।

(গ) "চৈতালী" কাব্যের 'সঙ্গী', 'মধ্যাহ্ন', 'ইছামতী' কবিতাগুলির সঙ্গে যথাক্রমে ২০, ২৭, ৮৯ ও ১৪৫ নম্বর চিঠির মিল। ১৩৭ ও ৮৪ নং পত্রে 'পদ্মা' কবিতাটির রূপাভাস মিলবে।

(ঘ) 'গল্পগুচ্ছে'র "পোস্টমাস্টার" গল্পটির অভিজ্ঞতা বা চরিত্রাবলম্বন পাওয়া যায় ৬০, ২১ ও ১১৯ নং চিঠিতে। ১১৯ নম্বরে 'ক্ষুধিত পাষাণ', ২৮ নং-এ 'ছুটি', ১০৫ নং-এ 'মেঘ ও রৌদ্র', ১০১ নং চিঠিতে 'নিশীথে' এবং ৩০ নং-এ 'সমাপ্তি' গল্পের প্লটের বীজ মিলছে।

(ঙ) "সাধনা" পত্রিকায় প্রকাশিত নানা নিবন্ধের অন্তর্গত 'লোকসাহিত্য'-এর গ্রাম্যগাথা ও ছড়া ইত্যাদি রচনার কথা আছে ৯৩ এবং ১১৯ নম্বর চিঠিতে। রূপকথার উল্লেখ বা রূপকথায় কবির আগ্রহের পরিচয় আছে অনেকগুলি চিঠিতে। "সাধনা"য় প্রকাশের জন্য নানা প্রবন্ধ লিখবার কথা কবি উল্লেখ করেছেন ১৩৭ নম্বর চিঠিতে—"সাধনার জন্য লিখতে লিখতে অন্যমনস্ক হয়ে যাই।" নানা গ্রন্থপাঠ ও সমালোচনা লেখার উল্লেখ আছে ছড়িয়ে।

(চ) 'বিসর্জন' (১৮৯১) নাটকখানির কেন্দ্রীয় ভাববস্তুর সঙ্গে 'ছিন্নপত্রে'র ১০১ নং পত্রের স্পষ্ট সাদৃশ্য রয়েছে। বলেন্দ্রনাথের 'পশুপ্রীতি' প্রবন্ধ প্রসঙ্গে কবি এই চিঠিতে একটি পাখি হত্যার দৃশ্যের অভিজ্ঞতার কথা বলেছিলেন। এই নিষ্ঠুর হিংস্র দৃশ্যের থেকে তাঁর মনে যে ভাবের উদ্রেক হয়েছে সেই ভাব থেকেই 'বিসর্জন' রচিত। এই চিঠিতে কবি বলেছেন—

> "এই পৃথিবীতে অনেক কাজ আছে যার দূষনীয়তা
> মানুষের স্বহস্তে গড়া, যার ভালোমন্দ
> অভ্যাস প্রথা দেশাচার লোকাচার
> সমাজ নিয়মের উপর নির্ভর করে।"

* * *

"প্রেম হচ্ছে সমস্ত ধর্মের মূল ভিত্তি।
সকল ধর্মের শ্রেষ্ঠ ধর্ম সর্বজীবে দয়া।"

* * *

"ভেবে দেখ দেখি জীবের জীবনের
কী ভয়ানক অপব্যয় এবং কী অল্পমূল্য।"

"বিসর্জন" নাটকে লোকাচারাশ্রিত ব্রাহ্মণের দম্ভস্ফীত পাশব-শক্তির সঙ্গে করুণা ও প্রেমের সংঘাতের যে কাহিনী আছে, এখানে তারই ভাবাবেগ।

এমনিভাবে দেখানো যায় যে ঐ সময়ের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ যে সকল কাব্য, নাটক, গল্প ও প্রবন্ধ রচনা করেছেন, সে সকলের উপকরণ, প্রাথমিক অভিজ্ঞতা ও ভাবাবেগ 'ছিন্নপত্রে' বিধৃত হয়েছে।

"সোনার-তরী" ও "চিত্রা" কাব্যের মৌল প্রেরণা মানব ও প্রকৃতি প্রেম; মর্ত্যপ্রীতিই এই পর্বের কাব্যের মূল সুর। নিঃসন্দেহে "সোনার তরী" এবং "চিত্রা" সৌন্দর্যসম্ভোগের কাব্য এবং এই সৌন্দর্য যথেষ্ট ইন্দ্রিয়সম্ভব। "ছিন্নপত্রে"-ও কবির এই জীবন-প্রীতি ও মর্ত্যপ্রীতি। 'সোনার তরী' ও 'চিত্রা'র দুএকটি কবিতার দুএকছত্র নিয়ে 'ছিন্নপত্রে'র সঙ্গে মিলিয়ে দেখলেই এই সাযুজ্য বোঝা যাবে;—কবি বলছেন,

"আমি এই পৃথিবীকে ভারি ভালোবাসি।" (১৮) "পৃথিবী যে কী আশ্চর্য সুন্দর এবং কি প্রশস্ত প্রাণে এবং গভীরভাবে পরিপূর্ণ তা এইখানে না এলে মনে পড়ে না।" (৩৫) "(পৃথিবীকে) বিশ্বাস করে, ভালোবেসে, ভালোবাসা পেয়ে, মানুষের মতো বেঁচে এবং মানুষের মতো মরে গেলেই যথেষ্ট—দেবতার মতো হাওয়া হয়ে যাবার চেষ্টা করা আমার কাজ নয়।" (৩৬); "এই পৃথিবীর ওপর আমার যে একটি আন্তরিক আত্মীয়বৎসলতার ভাব আছে, ইচ্ছে করে সেটা ভালো করে প্রকাশ করি।" (৬৪)

'বসুন্ধরা' কবিতায় যখন কবি পৃথিবীকে মাতৃসম্বোধনে বলেন—

"ওগো মা মৃন্ময়ী,
তোমার মৃত্তিকামাঝে ব্যাপ্ত হয়ে রই ;
দিগ্বিদিকে আপনারে দিই বিস্তারিয়া
বসন্তের আনন্দের মতো ;"—

অথবা 'সমুদ্রের প্রতি' কবিতায় কবি অনুভব করেন—

"মনে হয়, যেন মনে পড়ে
যখন বিলীনভাবে ছিনু ওই বিরাট জঠরে",

তখন "সোনার তরী" যে "ছিন্নপত্রে"র কয়েকটি পত্রেরই কাব্যরূপ, তাতে সন্দেহ থাকে না।

"ছিন্নপত্রে" যে Romantic melancholy বা সুদূরের জন্য বিষণ্ণতা, প্রকৃতির অনন্ত রূপ ও সৌন্দর্যের মধ্যে অহেতুকী বেদনা ও বৈরাগ্যের যে ধূসরানুভূতি, তারই প্রতিধ্বনি বহন করছে "যেতে নাহি দিব" প্রভৃতি কবিতা। তীব্র জীবনাসক্তি ও মর্ত্যপ্রীতি এই বিষণ্ণতার কারণ। এই রূপ-রস-গন্ধ-ধ্বনি-বর্ণময় পৃথিবীর সৌন্দর্য, প্রেম ও আনন্দের আস্বাদের মধ্যে মৃত্যুর প্রতিবন্ধক হানার যে সম্ভাব্যতা, তারই চিন্তায় কবির এই বিশ্বপ্রকৃতি, এই জগৎ ও জীবনের সৌন্দর্য-সম্ভোগ বারে বারে পীড়িত ও খণ্ডিত হয়; এই খণ্ড-বো.র, এই বিচ্ছিন্ন আমিত্ব-বোধের থেকেই এই পর্বে কবির বৈরাগ্য, নৈরাশ্য, বেদনা ও বিষণ্ণতা দেখা গিয়েছে ঃ

"আমি ভালোবাসতে পারি কিন্তু রক্ষা করতে পারি নে,
আরম্ভ করি সম্পূর্ণ করতে পারি নে,
জন্ম দিই, মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচাতে পারি নে।" (১৮)

পৃথিবীর এই দারিদ্র্য, এই অক্ষমতা, এই অপূর্ণতার জন্যই একদিকে এর প্রতি কবির মমতা, আবার এরই জন্য কবির এত বিষণ্ণতা। "সোনার তরী"—"চিত্রা"র কবিতায় এই দুই ভাবের প্রতিধ্বনি। "চিত্রা"য় যে জীবনদেবতাবাদের স্পষ্ট প্রকাশ, ছিন্ন-পত্রে'ই তার কথা আছে—"আমি নিজেকে কিছুই জানি নে।

আমি একটা সজীব পিয়ানোর যন্ত্রের মতো ;···কখন কে এসে বাজায় কিছুই জানিনে, কেন বাজে তাও সম্পূর্ণ বোঝা শক্ত। কেবল কী বাজে সেইটেই জানি।" (১০২)।

এই 'রহস্যময় যন্ত্রী'টিই 'কবির অন্তরের কবি', কবির 'innerself' সেই 'অন্তর্যামী' 'জীবনদেবতা'—'চিত্রা'য় যার প্রসঙ্গ এসেছে নানা কবিতায়।

"ছিন্নপত্রে" যে কেবল সমকালীন রবীন্দ্র-সাহিত্য-সৃষ্টির প্রাথমিক উপকরণ, প্রতিবেশ ও ভাব-ভাবনার স্বাক্ষর আছে তা নয়, এক হিসাবে সমস্ত রবীন্দ্র কাব্যসৃষ্টিরই নানা ভাব, ধর্ম, গতি ও লক্ষ্যের পরিচয় এই পত্রসংকলনে পাওয়া যাবে। এর কারণ নানা রূপ-বৈচিত্র্য ও ভাব-স্বাতন্ত্র্য সত্ত্বেও রবীন্দ্রকাব্যধারা যে-সাগর-সঙ্গমে আত্মহারা হয়েছে, রবীন্দ্রনাথের সমগ্র জীবনের সাধ ও সাধনার যেখানে সিদ্ধি, তার আভাস তাঁর যৌবনের প্রথম রচনা থেকে জীবনের শেষ কবিতাটি পর্যন্ত অব্যাহত আছে। বারে বারে তাঁর কাব্যের ঋতু বদল হয়েছে ; তিনি কেবলই বৈচিত্র্যপিয়াসী ও স্বাতন্ত্র্যবিলাসী। তথাপি বিশ্ব-প্রকৃতির সঙ্গে আত্মলীনতার অসীম ব্যাপ্তিতে তাঁর যে সর্বানুভূতি, সকল অনুভূতি যে সঙ্গমে সমাহিত—সেই সার্বভৌমত্ব, সেই সর্বানুভূতির পরিচয়, সেই সীমা-অসীমের মিলন সাধনার প্রয়াস ও সিদ্ধি (যদি আদৌ হয়ে থাকে) এই "ছিন্নপত্রে"ই আছে। এই উপলব্ধির মধ্যেই "ছিন্নপত্রে'র রবীন্দ্র-কাব্য ও জীবন সাধনায় স্থায়ী মূল্য।

'ছিন্নপত্রে'র স্থায়ী রস করুণ। কিন্তু প্রথম ১৭ খানি পত্রে রয়েছে কৌতুক রসের উচ্ছলতা। ১৮৮৫ থেকে ১৮৯১ খ্রীঃ অর্থাৎ পাঁচ বৎসরে বন্ধু শ্রীশচন্দ্র মজুমদারকে এগুলি লেখা। এই চিঠিগুলির রচনায় কালগত ও স্থানগত ব্যবধান ব্যাপক। বন্দোরা সমুদ্রতীর, সোলাপুর, দার্জিলিং, কোলকাতা, লণ্ডন প্রভৃতি নানা জায়গা থেকে লেখা। পত্রের রস নির্ভর করে পত্র-প্রাপকের রসবোধ এবং তার সঙ্গে পত্র-রচয়িতার সম্পর্কের অন্তরঙ্গতার উপর। পত্র সাহিত্যে চরিত্র থাকে দুটি—একটি প্রথম পুরুষ (রচয়িতা) ও অন্যটি মধ্যমপুরুষ (গ্রাহক)। দুটি

চরিত্রের একটি নারী হোলেই পত্র হয়ত যথার্থ সাহিত্য হয়ে উঠতে পারে। লিটন ষ্ট্রাচি যাকে বলেছেন feminine touch, পত্র-রচনায় তার প্রয়োজন খুবই। ইন্দিরা দেবী, লেডী রামু মুখার্জী, রাণী মহলানবীশ প্রভৃতিকে লিখিত রবীন্দ্রনাথের যথাক্রমে 'ছিন্নপত্র', 'ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী' এবং 'পথে ও পথের প্রান্তে' পত্রগুচ্ছগুলি যেমন শিল্পোত্তীর্ণ হয়েছে, 'চিঠিপত্র' আটটি খণ্ড তেমন হয়নি। তাছাড়া রবীন্দ্রনাথই স্বীকার করেছেন মেয়েরাই ভালো পত্রলেখিকা হয়। পত্র-রচনা নারী স্বভাবের অনুগত।

✓প্রথম ১৭ খানি পত্রের নিরবচ্ছিন্ন কৌতুক রসের অন্যতম উৎস এর দ্বিতীয় চরিত্র শ্রীশ মজুমদারের রসগ্রাহিতা। এই চিঠিগুলি স্থান কাল পাত্র বিচারে নয়, রস এবং রচনা শৈলীর দিক দিয়ে 'ছিন্নপত্রে'র মূল সুরের সঙ্গে অসম্পৃক্ত। তবে এর থেকে তরুণ রবীন্দ্রনাথের ঘরোয়া জীবনের অন্তরঙ্গ রূপটি বেশ কিছুটা পাওয়া যায়, যেটি পত্র সাহিত্যের অন্যতম লোভনীয় সম্পদ। যখন রবীন্দ্রনাথ বিশ্ববিখ্যাত হননি, তখনকার তাঁর সাধারণ সহজ সুন্দর ঘরোয়া মনটির অকৃত্রিম চিত্র এই পত্রগুলিতে জীবন্তরূপে পাওয়া যায়।

✓এই চিঠিগুলিতে কবির প্রসন্নরস (humour) সৃষ্টির প্রধান উপকরণ হয়েছে ভাষাগত কৌশল—Antithesis অলংকারের প্রয়োগ—'এই চিঠি এবং আমরা শুক্রবারেব সকালের ডাকে কোলকাতায় বিলি হব', —চেতন অচেতন উভয় কর্তার জন্য একই ক্রিয়াপদ ব্যবহার করে বিরোধাভাস অলংকারের চমৎকারিত্ব সৃষ্টি হয়েছে। এক জায়গায় বলছেন, 'কোলকাতা তার সমস্ত লোষ্ট্রকাষ্ঠ দিয়ে প্রকৃতিকে গঙ্গাপার করেছে।' নিজেকে উদ্দেশ্য করে বলছেন, 'দেওয়ালগুলো তাকিয়ে আছে, ভাবছে ঘরের প্রধান আসবাবটা গেল কোথায়?' এবং বন্ধুকে উদ্দেশ্য করে বলছেন, 'কোথায় আপনি, কোথায় আপনার সেই ছাতা, পাপোষ শয্যায় শয়ান সেই পুরাতন জুতোযুগল'। চাকুরী ও পদমর্যাদার প্রতি কবির চিরকালের তাচ্ছিল্য এখানে মৃদু পরিহাসরস সৃষ্টি করেছে।

কবি তিন নং পত্রে বিরহ নিয়ে রসিকতা করেছেন। প্রিয়া বিরহ নয়, প্রিয় বিরহ। কবি একলা রয়েছেন, কিন্তু বন্ধু শ্রীশবাবু গয়ায় সব-ডেপুটিগিরি করছেন। কবি বলছেন—'নিদেন, আমার দ্বারের পার্শ্বে আপনার সেই পরিচিত ছাতিটা জুতোটা রেখে গেলেও আমার কথঞ্চিৎ সান্ত্বনা ছিল।'

চার নম্বর পত্রে সমালোচক ও গবেষকদের সবজান্তাভাব এবং হাস্যকর পণ্ডিতীপনার প্রতি কবির বরাবরের বিরূপতা মৃদু শ্লেষাত্মক কৌতুক রসের (Satire) সৃষ্টি করেছে। বিশেষজ্ঞদের বিশেষ অজ্ঞতার প্রতি কবির মৃদু তিরস্কার বিদ্রূপরসের আভাস দিচ্ছে।—'পাণিনি ব্যাকরণটি এমন একটি ঘোড়ার ডিম যা কোন ঘোড়ায় পাড়ে নি।' 'বাংলা সাহিত্য যে দেশের সাহিত্য সে দেশ মূলেই ছিল না'—ভবিষ্যতে তত্ত্বজ্ঞরা নাকি এমনও প্রমাণ করতে পারবে।

পাঁচ নম্বর পত্রে আধুনিক বাঙ্গালীকে কবি বলছেন 'ঊনবিংশ শতাব্দীর পোষ্যপুত্র'। ছয় নং পত্রে খবর কাগজওয়ালাদের এবং সম্পাদকদের প্রতি কবির বিরূপতা পরিহাসরসিকতা সৃষ্টি করেছে। সাত নং পত্রে কবি বাত ব্যাধি নিয়ে কৌতুকরসের সৃষ্টি করেছেন। কেউই বাতের ওপর একছত্র কবিতা কেন লিখলেন না—এই নিয়ে কবির অনুযোগ। বিরহের কষ্টটাই কেন কবিতার বিষয় আর বাতের কষ্টটা বা নয় কেন? হৃদয় ভেঙ্গে গেলেও মানুষ মাথা তুলে খাড়া হয়ে দাঁড়াতে পারে, কিন্তু বাতে কোমর ভাঙ্গলে মানুষ একেবারে কাৎ। 'তখন প্রেমের আহ্বান, দেশের আহ্বান এলেও সে কোমরে তার্পিন তেল মালিশ করবে।' শ্রীশবাবু বাল্যবিবাহ সম্বন্ধে কবির মতামত চেয়েছিলেন, উত্তরে কবি এই গুরুতর বিষয়টাকে নিতান্ত লঘুভাবে রসিকতা করে পাশ কাটিয়ে গেলেন। আট নং চিঠিতে এক দীর্ঘ পদ্য; শ্বাসাঘাত-প্রধান বাংলা পদ্যে ইংরাজী বাংলা খিচুড়ী ভাষায় নানারকম অসঙ্গত শব্দবয়নের সাহায্যে কৌতুক সৃষ্টি করেছে। বিষয় একই—বন্ধু-বিরহে কবির অলস

অবকাশ আর কাটছে না, বন্ধুর অনুপস্থিতিতে একলা কবির কাব্যের মৌতাত জমছে না, এ যেন,—

'নাই শস্য, আছে চাষা
আছে নস্য, নাই নাসা।'

এই পদ্য দ্বিজেন্দ্রলালের হাসির কবিতাব অনুরূপ। নয় নং পত্রে কবি সপরিবার দার্জিলিং ভ্রমণ উপলক্ষ্যে বাক্সপ্যাটরা নিয়ে ঝামেলা পুইয়েছেন, তারই সরস বর্ণনা দিয়েছেন। গাদাগাদা বাক্স খোলা, বন্ধ করা, গোছানো, বেঞ্চির তলায় গোঁজা ও টেনে বার করে করে কবির 'ঠিক বাক্স-Phobia হয়েছে।' 'মোটের উপর মোট, মুটের উপর মুটে'—epigram-এর দৃষ্টান্ত। এর আগের বাক্যটিতে anti-climax এর অপরূপ দৃষ্টান্ত আছে: 'সর্দি, হাঁচি, শালকম্বল, মোজা, পা কন্‌কন্, হাত ঠাণ্ডা, মুখ নীল, গলাভার এবং ঠিক তার পরেই দার্জিলিং'। ১০ নং পত্রে শিলাইদহে স্ত্রীপুত্রের খোঁজে একদিন কবিকে কি উদ্বেগ পোয়াতে হয়েছে, তার বিস্তৃত বর্ণনা দিয়ে কবি বলছেন—'স্ত্রী-স্বাধীনতার বিরুদ্ধে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়ে উঠলুম।' স্ত্রীকে খুঁজে পাওয়ার পর বলছেন, 'বোটলক্ষ্মী বোটে ফিরলেন।' ১১ নং চিঠিতে কবি লঘুস্বরে গম্ভীর কথা বলে এবং গম্ভীর কথার লঘু পরিণতি দিয়ে কৌতুকরসের সৃষ্টি করেছেন। কবির শিশু পুত্রটি গম্ভীর হয়ে বসে বসে ঘুমিয়ে পড়ল। এই প্রসঙ্গে কবি বলছেন—'এ সংসারে কোথা থেকে আগমন, কেনই বা নির্গমন, ভাবতে ভাবতে দেখলুম ঘনঘন হাই তুলতে লাগল, তারপরই আমার কোলে মাথা রেখে পা ছড়িয়ে নিদ্রা আরম্ভ করে দিল'। বার নং পত্রে জনৈক ম্যাজিষ্ট্রেটের বর্ষা-দুর্যোগের রাত্রে কবির বাংলোয় আশ্রয় গ্রহণের ঘটনার বর্ণনায় যে স্নিগ্ধ কৌতুকরসের সৃষ্টি হয়েছে, তার মূলে আছে বর্ণনার আনুপুঙ্খতা, তুচ্ছাতিতুচ্ছ জিনিষেরও যথাযথ বর্ণনাই এখানে কৌতুকের কারণ। জমিদার বাবুর কাছে বিদ্যালয়ের জন্য টুলবেঞ্চির আবেদন করতে এসে একটি ছোট ছেলে মাস্টারমশায়ের শিক্ষামত সংস্কৃতে তাঁর যে প্রশস্তি অনর্গল

মুখস্থ বলতে লাগল, কবি সেই ছেলেমানুষী উপভোগ করেছেন ; তারই উপভোগ্য বর্ণনা আছে সতের নম্বর পত্রে।

১০, ১১, ১৩, ১৪ নং পত্র ছাড়া প্রথম ১৭ খানি চিঠিতে কৌতুক রসই স্থায়ী। রবীন্দ্রনাথের কৌতুক বিশুদ্ধ প্রসন্নরস (humour), পরিহাসরসিকতা কোথাও কোথাও অল্প কিছু আছে, কিন্তু বিদ্রূপ (sarcasm) ও শ্লেষ (satire) নেই বললেই হয়। রবীন্দ্রনাথের অপরিসীম সৌজন্যশীল ও সৌন্দর্যপ্রখর মনে অসঙ্গতি, হীনতা বা দীনতার জন্য কাউকে কটাক্ষ করার মতো জ্বালা ও 'অহম'-কার ছিল না। কৌতুকহাস্যের মাত্রা সম্বন্ধে তিনি খুবই সচেতন ছিলেন এবং মাত্রা বেশী হলেই যে কৌতুক করুণরসে, comedy tragedyতে পরিণত হয়, তা তিনি জানতেন বলে কখনো মাত্রা ছাড়িয়ে যাননি। শুধু পত্রসাহিত্য নয়, সকল রচনাসাহিত্যেই তিনি চিত্তের প্রসন্নতা এবং জীবনরসরসিকতা থেকে উৎসারিত স্নিগ্ধ-মধুর কৌতুকহাস্যের দ্যুতি ছড়িয়ে রেখেছেন। এই স্নিগ্ধ কৌতুকহাস্য ও প্রসন্নসরসতা তাঁর রচনাশিল্পের একটি সাধারণ লক্ষণ এবং তাঁর ব্যক্তিত্বের চিহ্ন।

পত্রসাহিত্যের পক্ষে এই কৌতুকহাস্যরস খুবই প্রয়োজন। পত্র-সাহিত্যের প্রধানতম সর্ত রচয়িতার রসগ্রাহী চিত্তের স্ফূর্তি, রচয়িতার আমেজিভাব (mood) এবং খেয়ালিপনা (fancy)। এগুলি থেকেই চিঠিপত্রে কথায় কথায় কৌতুকরসের বিকিরণ হয়।

পূর্বেই বলেছি যে 'ছিন্নপত্রে'র মূল সুর অহেতুকী করুণবিষন্নতা (Romantic melancholia)। কিন্তু মূল গ্রন্থের বিস্তারিত কারুণ্য ও বিষাদবৈরাগ্য-ভাবের মধ্যে প্রথম দিকের চিঠির এই মেজাজী, আমেজি, লঘু কৌতুকহাস্য আদি-রস হিসাবে 'ছিন্নপত্র' গ্রন্থখানির রসবৈচিত্র্য সম্পাদনা করে এর মাধুর্য বৃদ্ধিই করেছে।

'ছিন্নপত্র' নদীবিধৌত পূর্ব-বাংলার পল্লীপ্রকৃতির রেখাচিত্রের একটি এ্যাল্‌বামের মতো। বিশেষ করে রবীন্দ্রনাথের নদী-চেতনার বিচিত্ররূপের পরিচয় এখানে ছড়িয়ে আছে। কবি প্রকৃতির

পঞ্চরূপের মধ্যে অপ্-রূপের প্রতিই সবচেয়ে অনুরক্ত ছিলেন। আকাশ, পাহাড়-পর্বত, অরণ্যানী অপেক্ষা প্রকৃতির স্রোতস্বিনী রূপের দ্বারা তিনি যে অধিকতর প্রভাবিত ও মুগ্ধ ছিলেন, তার প্রমাণ আছে 'পঞ্চভূত' গ্রন্থে। ক্ষিতি, সমীর, দীপ্তি, ব্যোম ও স্রোতস্বিনী, প্রকৃতির এই পঞ্চভূতের মধ্যে শেষোক্তটিই যে কবির প্রিয়া, এতে সন্দেহ থাকতে পারে না। প্রকৃতির অপ্-রূপের মধ্যে আবার শক্তি ও অসীমতার প্রতীক সমুদ্র অপেক্ষা সংসার-জগতের পাশ দিয়ে প্রবাহিত স্রোতস্বিনী নদীর প্রতিই কবির টান ছিল অধিক। 'ছিন্নপত্রে' নদীর প্রতি এই টান নানাভাবে, নানা তাৎপর্যে ব্যক্ত হয়েছে। যেমন (ক) ১১৪, ১১৮ ও ৬৭ নং পত্রে নদী ও গতি সম্বন্ধে কবির ধারণার পরিচয় পাচ্ছি। বস্তু থেকে গতিকে বিচ্ছিন্ন করে বস্তুবিহীন স্বয়ংসিদ্ধ গতিধর্মের যে ভাব 'বলাকা'য় ('চঞ্চলা') আছে—তা যে কবি পদ্মার থেকে প্রত্যক্ষ অনুভূতির মধ্য দিয়ে পেয়েছেন, তা বোঝা যাবে। পদ্মা এখানে নিত্যগতির প্রতীক। (খ) ১৯, ৪৩, ৯৫ ও ৭৯ নম্বর চিঠিতে নদী ও নারীর সম্পর্কটি ব্যক্ত হয়েছে। নদী যেন নারী, নারীর মতোই উৎফুল্লা, সৃজনশীলা, সর্বংসহা, প্রগলভা ; আবার ভরানদী মাতৃত্বভরা নারীর মতোই সুধীরা ও প্রশান্তগম্ভীর এবং অন্নপূর্ণা।

"তোমরা হাসিয়া বাহিয়া চলিয়া যাও
কুলকুল কল নদীর স্রোতের মতো।
আমরা তীরেতে দাঁড়ায়ে চাহিয়া থাকি ;
মরমে গুমরি মরিছে কামনা কত—"

'সোনারতরী'র এই কবিতার ভাবটিই নদী ও নারীর উপমায় পরিস্ফুট হয়েছে। (গ) কোথাও কোথাও নদী ও কবির সম্পর্ক ব্যক্ত হয়েছে—কবির কাব্যসাধনা নদীর প্রবাহেরই মতো দুপাশের বিচিত্র জীবনের উপকরণ বুকে বয়ে অনাসক্তভাবে মোহনার দিকে বয়ে চলেছে, কবি যেমন যান মুক্তির দিকে। (ঘ) ১৯ ও ৪৪ নং চিঠিতে নদী ও পৃথিবীর মাতা-সন্তানের বাৎসল্য-সম্পর্কের

কথা আছে। (চ) কবিমনের তত্ত্বরূপ অর্থাৎ কবির আনন্দবাদ, জন্মান্তরবাদ ও সৃষ্টিবাদের তত্ত্বরূপ হয়েছে নদী ৩৮ নং চিঠিতে। (ছ) সর্বোপরি নদীর সৌন্দর্যরূপ ছড়িয়ে আছে অসংখ্য পত্রে। বলা বাহুল্য পদ্মানদীই এই সৌন্দর্যের দেবী। পদ্মার এই সৌন্দর্যেরও বিচিত্ররূপ। ৭৯ নং পত্রে নদীর তটিনীরূপ আর ১৩৪ নং পত্রে পদ্মার নাগিনীরূপ। কিন্তু অধিকাংশ পত্রে পদ্মার দুটি রূপ ফুটেছে, —(ক) রহস্যময়ী রূপ এবং (খ) বিষাদময়ী রূপ। কোথাও-কোথাও পদ্মার রূপের স্বভাব-বর্ণনা (Photography) আছে এবং কোথাও-কোথাও রূপকল্প (Image) রূপেও নদী ব্যবহৃত হয়েছে। দুএকটি পত্রে চলনবিল প্রভৃতি বৃহৎ ঝিল-বিলের উল্লেখ রয়েছে। নদী যে রবীন্দ্রনাথকে এমন করে আকর্ষণ করেছে তার কারণ বোধ হয় এই যে, এর মধ্যে তিনি তাঁর কাব্যজীবনের মর্মবাণীর সন্ধান পেয়েছেন। বৈরাগ্য সাধনে মুক্তিকে কবি অস্বীকার করেছিলেন, কিন্তু মুক্তিই ছিল তাঁর কাম্য। সংসারসীমা ও কর্মবন্ধনকে মেনে নিয়ে জীবনব্রত সুষ্ঠুভাবে প্রতিপালন করার মধ্য দিয়েই বিশ্বদেবতার সঙ্গে মিলন হবে, এই প্রত্যয়ের সমর্থন নদীর প্রবাহের মধ্যে কবি পেয়ে থাকবেন। নদী গৃহবাসী—পল্লীর মধ্য দিয়ে পল্লীকে শস্যসম্পদে পূর্ণ করে, দু'তীরের সংসারজীবনের সব গ্লানি ও জীবনের হাসিকান্না বুকে বয়ে নিয়ে চলেছে সে সীমা থেকে সমুদ্রের অসীমে আত্মহারা হতে—সংসার ও মানুষের সব গ্লানি, সব আনন্দ, সে অনাসক্তভাবে সমুদ্রে নিয়ে গিয়ে দান করে মুক্ত হবে। সীমা-অসীমের মিলনের প্রতীক নদী তাই কবিকে স্বভাবত মুগ্ধ করেছিল। 'ছিন্নপত্রে' তাই পদ্মা ও তার উপনদীগুলি পটভূমি (Background), প্রতীক (Symbol), প্রসাধন (Metaphor), স্বভাববর্ণনা (Sketching) এবং চিত্রকল্প (Imagery), এই পঞ্চরূপে বা পরিপূর্ণরূপে কবির চেতনায় ধরা দিয়েছে।

'ছিন্নপত্রে'র মূল সুর পূর্বেই একাধিকবার বলা হয়েছে, বিষাদ ও বৈরাগ্যজনিত করুণা। বিবিক্ততার জন্যই বিষণ্ণতা। কবি পদ্মা-

লালিত বাংলার পথে-প্রান্তরে, আকাশে-বালুচরে, নদীবুকে-শস্যক্ষেত্রে, দিগন্তে এবং কূলে-কূলে সর্বত্র সকালসন্ধ্যায় কেবলই ম্লান বিষণ্ণ করুণার বিশ্বরূপ দেখেছেন—কেবলই একটি ছলছল জলভরা ভাব অনুভব করেছেন। এর কারণ আদৌ বস্তুগত বা প্রকৃতির রূপগত হতে পারে না। এই রোমান্টিক দুঃখবোধ সম্পূর্ণ কবির মন্ময়* (Subjective)। কবির অন্তরের বেদনাই বাইরের বিশ্বপ্রকৃতির উপর ছড়িয়ে পড়েছে। এই সর্বব্যাপী বিবিক্ততা ও কারুণ্য-চেতনার কারণ এই ক'টি হতে পারে,—(ক) ভারতীয় বৈরাগ্য-বাদের প্রভাব—ভারতীয় ধর্মবোধ ও আধ্যাত্মিকতা চিরকাল মরমিয়া দুঃখবাদ। উপনিষদে আনন্দবাদের কথা থাকলেও বৌদ্ধদর্শন থেকে মধ্যযুগের বৈষ্ণব—শাক্ত—আউল বাউলে বিরহ ও বৈরাগ্যের বেহাগ সুরটাই মূল তান। রবীন্দ্রনাথের উপর ভারতীয় এই আধ্যাত্মিকতার প্রভাবের জন্যই তাঁর রচনায় বিষণ্ণ-সুরের অনবচ্ছিন্নতা। (খ) নিঃসঙ্গতা ও নির্জনতাবোধ মৃত্যুচেতনা ও বিষণ্ণতাবোধের আদি মনস্তাত্ত্বিক কারণ। পদ্মাপারের নৌকাবাসের দিনগুলিতে কবি অত্যন্ত নিঃসঙ্গ ও নির্জন ছিলেন, অথচ তাঁকে ব্যাপ্ত করেছিল অসীম এক প্রকৃতিলোক। তাছাড়া কয়েক বছর পূর্বে কাদম্বরী দেবী প্রমুখ অন্তরঙ্গ প্রিয়জনের বিচ্ছেদের গোপন বেদনাও প্রচ্ছন্নভাবে থাকতে পারে।

(গ) রবীন্দ্রনাথের সহজাত সংস্কারে ছিল সুগভীর প্রকৃতি-তন্ময়তা। 'ছিন্নপত্রের' পটভূমিতে পদ্মাপারের প্রকৃতির অসীম ব্যাপ্তি কবিকে স্বীয় অস্তিত্বের তুচ্ছতা ও খণ্ডতাবোধই জাগিয়ে দিয়ে থাকবে। ১৪, ১০০, ৬৬ ও ৬৭ নং পত্রে দেখা যায় বিশ্বজগতের অসীমতার পরিপ্রেক্ষিতে আপন সত্তার আনবিক অকিঞ্চিৎকরতায় কবিচিত্ত ব্যথিয়ে উঠেছে।

(ঘ) পৃথিবীতে মৃত্যু অনিবার্য অথচ জীবন অস্তিত্ব রক্ষার তীব্র বাসনায় প্রেম দিয়ে, স্নেহ দিয়ে, সংগ্রামে সংগ্রামে অক্লান্ত; প্রাণের আকূতি কত গভীর অথচ মৃত্যু অপ্রতিরোধ্য। জীবনে প্রেমের এই

অসহায়তা ও অপূর্ণতা এবং এ-দুয়ের দ্বন্দ্বে প্রাণের ও প্রেমের পরাভব কবির বেদনার অন্যতম কারণ। (১৭ ও ১৮ নং পত্র)

(ঙ) সন্ধ্যার নির্জনতা ও নিঃসঙ্গতা বিষণ্ণতার অন্যতম কারণ হয়েছে। সন্ধ্যার বর্ণনায় প্রতিটি চিত্রকল্প যত না শিল্প-সুন্দর হয়েছে, তার চেয়ে বেশি হয়েছে অচরিতার্থতা, উদ্দেশ্যহীনতা, অতৃপ্তি ও ব্যর্থতাজনিত গভীর বৈরাগ্যের ভাবনায় ধূসর। জীবনের অতৃপ্তি ও ব্যর্থতা সন্ধ্যার যুগযুগান্তব্যাপী পৃথিবী-পরিক্রমায় যেন নিঃশেষিত। অপরিতৃপ্তিবোধের জন্যই যেন পৃথিবী এত ম্লান, এত করুণ। (২৬, ৩০, ৯৯, ১০৭, ১১২ নং পত্র দ্রঃ)।

'ছিন্নপত্রে'র প্রথম দিকে বিষাদবৈরাগ্যের সুর যত প্রবল, শেষের দিকে তেমন নয়। ক্রমেই বিষণ্ণতা কমে এসেছে; কবি যেন ধীরে ধীরে আত্মসমর্পণের (reconciliation) দিকে চলেছেন। প্রকৃতির মধ্যে তিনি শান্তি খুঁজে পেয়েছেন, এরই মধ্যে জীবনের পূর্ণতা দেখেছেন; নীরব সহিষ্ণুতা ও সান্ত্বনা লাভ করেছেন প্রকৃতির স্নিগ্ধ রূপে। বিষাদ ও বৈরাগ্য ক্রমে অপ্রমত্ত আনন্দে পর্যবসিত হয়েছে; বিষাদ ও বৈরাগ্য হয়েছে মুক্তি-পথিক। 'ছিন্নপত্রে'র ধারাবাহিকতা এই ভাবের দিক দিয়েও তাই সার্থক হয়েছে। কিন্তু বিষাদ ও বৈরাগ্য থেকে কবি শেষপর্যন্ত পরিপূর্ণভাবে মুক্তি লাভ করেননি, কেবল মুক্তি-সন্ধানী হয়েছেন, মুক্তি পথের পথিক হয়েছেন। 'ছিন্নপত্রে'র শেষের দিকে এই শান্তির আভাস আছে, যদিচ পূর্ণতা নেই।

ব্যক্তিগত নিবন্ধ : বিচিত্র প্রবন্ধ

১৮৮৫ থেকে ১৯১৬-র মধ্যে লেখা কতকগুলি রচনার সংকলন 'বিচিত্র প্রবন্ধ'। বর্তমান সংস্করণের পূর্বে এর আরো দুটি সংস্করণ হয়েছিল। তার থেকে অনেক লেখা 'ছিন্নপত্র', 'পথে ও পথের প্রান্তে', 'গল্পগুচ্ছ', 'পঞ্চভূত' ইত্যাদি গ্রন্থের অন্তর্ভূত করে স্বল্পায়তনে বর্তমান 'বিচিত্র প্রবন্ধ' গ্রন্থটির প্রচলন হয়েছে। 'বিচিত্র প্রবন্ধে'র রচনাগুলি আদৌ প্রবন্ধজাতীয় নয়। প্রথম ও দ্বিতীয় সংস্করণে কিছু-কিছু প্রবন্ধ ও ডায়েরিজাতীয় রচনা ছিল বলেই সেগুলিকে অন্যান্য সমজাতীয় গ্রন্থে স্থানান্তরিত করে বিষয় ও ভঙ্গিগত মিল অনুযায়ী বর্তমান সংস্করণটি সজ্জিত করা হয়েছে।

প্রায় সুদীর্ঘ ত্রিশ বৎসরাধিক সময়ে রবীন্দ্রনাথের যতগুলি প্রবন্ধ-গ্রন্থ বেরিয়েছে তার কোনটির অন্তর্ভূত না করে ঐ সময়ের মধ্যে বিচ্ছিন্নভাবে লেখা তন্বী রচনাগুলিকে একটি স্বতন্ত্র গ্রন্থাকারে সংবদ্ধ করা হয়েছে। এর থেকেই অনুমান করা যায় যে, প্রথমত, রচনা হিসাবে এই লেখাগুলির কোন মৌলিকতা আছে এবং দ্বিতীয়ত, এর সকল রচনাগুলির মধ্যেই ভাব ও রূপশৈলীগত ঘনিষ্ঠ আত্মীয়তা আছে। 'বিচিত্র প্রবন্ধে'র রচনাগুলির আভ্যন্তরীন 'বিষয় ও ভঙ্গিগত' আত্মীয়তা এবং রবীন্দ্রনাথের অপরাপর নিবন্ধসমূহ থেকে এদের অনন্যপূর্বতা কোথায় এবং কিভাবে, তার আলোচনা করা যেতে পারে।

'বিচিত্র প্রবন্ধে'র রচনাগুলি আদৌ বি-চিত্র নয়, এবং প্রবন্ধও নয়। প্রবন্ধ নয়, কেননা এর কোন রচনাটিতেই প্রকৃষ্টরূপ বন্ধন নেই এবং তথ্যভার ও বিষয়বস্তুর গৌরবও নেই। এবং বিচিত্র

নয়, কেননা এর প্রায় সবগুলি রচনার ভাবমর্ম-ই মূলত এক। 'রুদ্ধগৃহ' ও 'পথপ্রান্তে' রচনাদুটিতে যথাক্রমে বিস্মৃতি-তত্ত্ব এবং পথ-তত্ত্ব বা পথিক-প্রেমের ভাবাবেগ হোল কেন্দ্রীয় ভাবমর্ম। উভয় তত্ত্বই মূলত এক—জীবনের চলমানতা বা পথিকবৃত্তি-ই নিয়ে আসে মৃত্যু-শোকের বিস্মৃতি। আর বিস্মৃতিই প্রেমের শক্তি, তার ধর্ম। আবার 'বাজে কথা' ও 'পনেরো আনা' রচনাদুটির সারমর্মও এক; উভয়ত্রই অনাবশ্যকতাকে একটি তত্ত্ব-মূল্য দেওয়া হয়েছে। বিশ্বপ্রকৃতি ও বিশ্বজীবনের পনেরো আনা অর্থাৎ বেশির ভাগটাই অপচয়িত হয়, বাজে খরচে যায়। কি সাহিত্য, কি মানবসমাজ আর কি বিশ্বপ্রকৃতি, সর্বত্রই যা প্রয়োজনীয়, কাজের অর্থাৎ যা ফলবান পরিমানে তা এক আনা এবং অধিকাংশের আত্মবিস্মৃতি, অস্তিত্বহীন আত্মদানের দ্বারা যে উর্বর শ্যামলতার সৃষ্টি হয়, তারই আনুকূল্যে ঐ সামান্য এক আনা পরিমান মহামূল্যবানের সৃষ্টি হয়। অতএব বাজে কথা বা পনেরো আনার আপনার অনাবশ্যকত্বের জন্য ক্ষোভ ও বেদনাবোধ করা নিষ্প্রয়োজন। এখানেও প্রচ্ছন্নভাবে বিস্মৃতি ও গতিতত্ত্ব আছে। বাজে কথা নিজের অনাবশ্যকতার জন্য স্থায়ী হয় না, সঙ্গে-সঙ্গে বিস্মৃত হয়ে যায় এবং পনেরো আনারাও নিজেদের অকিঞ্চনতা ও অনাবশ্যকতার দরুণ সত্বর বিলুপ্ত হয়। কালের গতি তাদের দ্রুত অপসৃত করে নিয়ে যায়। এই বিলীয়মানতায় তার অগৌরব নয়; কেননা যে ক্ষণটুকু তারা ছিল, সে মুহূর্তটুকুতে তারা যে এই বিশ্বজগৎ ও জীবনকে সুন্দর, উর্বর, শ্যামল ও সরস করে আনন্দ দিয়েছে, তাতেই জীবনের সার্থকতা ও চরিতার্থতা। 'শরৎ' রচনাটিতে প্রাচ্যভারতের সঙ্গে পশ্চিমা শরৎ ঋতুর রূপ ও ভাবগত গরমিলের তুলনাত্মক আলোচনা প্রসঙ্গেও রচনাকার এই ক্ষণবাদের দর্শনেই এসে পৌঁছেছেন। শরতের সব ফসল-ই ওষধিঃ 'এরা যে ছোট, এরা যে অল্পকালের জন্য আসে', তবু এদের শোভা ও আনন্দ কম নয়, অসার্থক নয়; বনস্পতির মতো মহীরুহ নয় বলে শরতের ফসল যেন ক্ষোভ না করে। এরা

পৃথিবীতে আবাস না পেয়ে যদি কেবল আতিথ্য পেয়ে থাকে, তাতে শোকের কারণ নেই। শরৎ ক্ষণজীবীদের ক্ষণিক উৎসবের ঋতু; শরৎ গত ও আগতের ক্ষণিক মিলনের ঋতু; শরৎ চির নবীন, চির শ্যামল প্রাণের ঋতু। বিগত বর্ষা ও আগত শীতের জন্ম ও মৃত্যুর মধ্যে দাঁড়িয়ে সে অনাসক্ত আনন্দের শিশিরাশ্রু ঝরায়। বসন্তের মতো সে প্রসাধন ও সম্ভোগের ঋতু নয়, আবার শীতের মতো রিক্ত বৈরাগীও নয়। জীবনের যথার্থ রূপের প্রতীক সে। সে শোকও করে না, ক্ষোভও করে না। ক্ষণ-আনন্দেই সে চরিতার্থ। 'বাজে কথা' ও 'পথপ্রান্তে' রচনাযুগলের বিস্মৃতিবাদ ও ক্ষণবাদের পরিচয় এখানেও স্পষ্ট। 'মাভৈঃ' রচনাটিতে প্রাণদানের মহিমার কথা বলা হয়েছে। এ রচনাটিতে আছে প্রাণতত্ত্ব। মৃত্যু হোল প্রাণের স্বরূপ যাচাই করার কষ্টিপাথর। মৃত্যুর তুলায় জীবনের মূল্যনিরূপণ করলেই প্রাণের শ্রেষ্ঠ পরিচয় পাওয়া যায়। ত্যাগ-ই দেয় ভোগের অধিকার। আর প্রাণত্যাগের চেয়ে বড় ত্যাগ হয় না। প্রাণের প্রতি মোহ যার নেই, সে-ই জানে প্রাণের মূল্য ও মহিমা। নির্ভীকতা-ই তো শক্তি। আর মৃত্যুকে পরোয়া না করাই শ্রেষ্ঠ নির্ভীকতা। এই নির্ভীকতা ছিল আমাদের প্রপিতামহীদের, যাঁরা স্বচ্ছন্দে স্বামীর চিতায় প্রাণ বিসর্জন দিয়ে সতী হতেন। মৃত্যুকে পরোয়া না করার মধ্যে যে ত্যাগব্রত ও দুঃসাহসিক নির্ভীকতার শক্তি ও তেজ, তারই মধ্যে আছে মৃত্যুঞ্জয়ী প্রাণের পরম মূল্যবোধের উপলব্ধি। 'মাভৈঃ' রচনাটির এই হোল ভাবমর্ম। এর মধ্যেও দেখছি 'রুদ্ধগৃহ' ও 'পথপ্রান্তে' রচনাযুগ্মের মূল ভাবের রেখাপাত। 'রুদ্ধগৃহ' রচনায়ও মৃত্যুকে অস্বীকার করা হয়েছে, মৃত্যুতে মৃতের জন্য শোক না করার কথা বলা হয়েছে। 'পথপ্রান্তে' রচনাটিতে আছে মৃত্যুকে অকিঞ্চনজ্ঞানের মূলমন্ত্র—বিস্মৃতিতত্ত্বের অন্তর্নিহিত বাণী 'চরৈবেতি' মন্ত্র। 'আষাঢ়' রচনাটিতেও এই মৃত্যুতত্ত্বের কথা আছে। তার চেয়েও বেশি আছে অনাবশ্যকের ও অকর্মন্যতার মহিমা বর্ণনা। 'আষাঢ়' ও 'নববর্ষা'

রচনাদুটির ভাবমর্ম একই। 'আষাঢ়' রচনায় বিশ্বপ্রকৃতির ঋতুচক্রকে বিশ্বজীবনের কর্মবিভাগানুযায়ী চাতুর্বর্ণের সঙ্গে রূপকত্ব আরোপ করে রচনাকার গ্রীষ্মকে বলছেন ব্রাহ্মণ, বর্ষাকে ক্ষত্রিয়, আর শীতকে বৈশ্য। শরৎ এবং বসন্ত হোল শূদ্র। অতঃপর তিনি বর্ষাঋতুর স্বতন্ত্র মহিমা বর্ণনা করেছেন। বর্ষা বিশেষভাবে কবির ঋতু, কেননা বর্ষা হোল কর্মহীন, অলস অবকাশযাপনের এবং অহেতুক বিরহবেদনা-বোধের ঋতু। ঋতুর মধ্যে বর্ষা হোল প্রসাধনহীন, দীন ও নিঃসঙ্গ; সে ছুটীর ঋতু, সংগীতের ঋতুও বটে।

আষাঢ় বর্ষার আগমনী। আষাঢ়স্য প্রথম দিবসে নববর্ষার কাব্য 'মেঘদূতে'র মেঘ রামগিরি পর্বত থেকে যক্ষের বিরহবেদনা বয়ে নিয়ে উজ্জয়িনীমুখে যাত্রা করেছিল। 'আষাঢ়' ও 'নববর্ষা' উভয় রচনাতেই বর্ষা ঋতুর মহিমা বর্ণনায় 'মেঘদূতে'র প্রসঙ্গই অধিক স্থান জুড়েছে। 'নববর্ষা' রচনায় রচনাকার 'মেঘদূত' কাব্যের রূপক ব্যাখ্যারোপ করেছেন। এ-রচনাটিতে অপ্রাসঙ্গিকভাবে সাহিত্য-তত্ত্বাদির গুরুগম্ভীর আলোচনা এসে গেছে বটে, কিন্তু এর মৌল ভাবমর্মটি 'আষাঢ়' রচনাটিরই অনুরূপ। মেঘের সঙ্গে জীবনের প্রাত্যহিক ও সাংসারিক কাজকর্ম বা চিন্তা ও চেষ্টার সম্পর্ক নেই বলেই সে মনকে কল্পনার অবকাশ দেয়, পুরাতন হয়েও সে অমলিন চিরনূতন আনন্দরূপে প্রতি আষাঢ়ে এসে উপস্থিত হয় এবং আমাদের চেনা পৃথিবীর উপর একটা অচেনার আবরণ দিয়ে একে রোমান্টিক করে তোলে—কর্মক্লান্ত গ্লানিভরা বাস্তবজীবন থেকে মনকে অবকাশ দেয়, প্রিয় ও শ্রেয়ের জন্য হৃদয়কে বিরহী করে তোলে।

'আষাঢ়' ও 'নববর্ষা' রচনাযুগলে আছে অবকাশ-তত্ত্ব, আছে কর্মভোগাসক্তিহীন নিষ্প্রয়োজনীয়তার আনন্দ-তত্ত্বের বাণী। আবার কর্মবন্ধনহীন মুক্তপ্রাণের আনন্দ উপলব্ধির এই একই মর্মবাণী ধ্বনিত হয়েছে 'বসন্তযাপন' রচনাটিতে। প্রবৃত্তির প্রয়োজন সিদ্ধির জন্য মানুষের প্রাত্যহিক সমাজসাংসারিক কর্মপাশবদ্ধ নিছক বস্তুতান্ত্রিক জীবনযাপনের গ্লানিতে বিক্ষুব্ধচিত্ত রচনাকার মানুষকে 'সমাজদাঁড়ের

পাখী' সম্বোধন করে মনুষ্যত্বের এমন মর্মান্তিক অপচয়ের জন্য গভীর খেদ ও বেদনা প্রকাশ করেছেন। বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গে বিশ্বজীবনের যে সুগভীর আত্মীয়তা আছে কর্মবন্ধনের জন্য মানুষ তা ভুলে থাকে। মানুষ যে জড়ের সঙ্গে জড়, তরুলতার সঙ্গে তরুলতা, মৃগপক্ষীর সঙ্গে মৃগপক্ষী, এই সত্য সে মনে রাখতে পারে না। সে তার দৈনন্দিন স্থূল কর্মসিদ্ধির জন্য টের পায় না যে আকাশের নীল তারই বিরহে স্বপ্নাবিষ্ট, পাতার সবুজ তারই জন্য তরুণীর কপোলের মতো নবীন, বসন্তের বাতাস আজ তারই সঙ্গে মিলনের জন্য আগ্রহে চঞ্চল। প্রকৃতির সঙ্গে প্রেমের সম্পর্ক মানুষ কর্মাসক্তির জন্যই ভুলেছে—এই আত্মবিস্মৃতি মানবজন্মের সকরুণ ব্যর্থতা।

'শরৎ', 'আষাঢ়', 'নববর্ষা' এবং 'বসন্তযাপন' এই চারিটি রচনায় বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গে মানবজীবনের প্রেম ও বিরহের সম্পর্কটি প্রত্যক্ষভাবে রয়েছে এবং 'রুদ্ধগৃহ', 'পথপ্রান্তে', 'কেকাধ্বনি' ও 'পাগল' রচনার মধ্যে আছে পরোক্ষভাবে। বস্তুত প্রকৃতি-প্রীতিই এই রচনাগুলির মর্মবাণী। 'কেকাধ্বনি' রচনায় ময়ূর, ব্যাঙ, ঝিঁঝিঁ প্রভৃতির স্বর বাহ্য কর্কশতা সত্ত্বেও কবিদের কাছে প্রিয় কেন, এ-প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে রচনাকার সৌন্দর্যতত্ত্বের আলোচনা করেছেন। সৌন্দর্যের রূপগত ও ভাবগত দুইরূপ। প্রসাধনকলায় যে-সৌন্দর্য, সেটি খুবই প্রকট ও প্রত্যক্ষ। এই প্রত্যক্ষ বাহ্যরূপ সম্পূর্ণ ইন্দ্রিয়ভোগ্য এবং যেহেতু সকলেরই ইন্দ্রিয় আছে তাই বস্তু বা ব্যক্তির বাহ্য প্রসাধন-সৌন্দর্য নির্বিশেষ ও তাৎপর্যহীন। সাধারণ মানুষ এতেই খুশি ; কিন্তু কবি, শিল্পী ও ভাবুক বস্তুর প্রসাধনসৌন্দর্যের চেয়ে তার অন্তর্নিহিত ভাবসৌন্দর্যের সন্ধান করেন। ইন্দ্রিয় যেখানে সৌন্দর্যের সন্ধান পায় না, মন সেখানে বস্তুর অন্তরে সুন্দরের সৃজন করে নেয়। সৌন্দর্য সৃষ্টি করার এই ক্ষমতা মনের আছে ; এরই নাম কল্পনা, এরই নাম প্রতিভা। বস্তুর ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য প্রসাধনসৌন্দর্যকে অতিক্রম করে অন্তর্নিহিত ভাবগত সাধনসৌন্দর্যের এষণা ও

সৃজনশীলতা বা প্রতিভা আছে বলেই, কবি-শিল্পী-ভাবুকগণ কেকাধ্বনি, ব্যাঙের ডাক, ঝিঁঝিঁর স্বরেও সৌন্দর্য উপভোগ করতে পারেন। ঐ আপাতকর্কশ স্বরগুলি নববর্ষা বা ঘনবর্ষার নিবিড় ভাবের সঙ্গে চমৎকার খাপ খায়; সুগভীর সামঞ্জস্য ও সংস্থান সমাবেশের সঙ্গতি সৃষ্টি করে; বর্ষাপ্রকৃতির অবিশ্রাম ধারাপাতধ্বনির সঙ্গে সুরসংগতি বা ঐকতান রচনা করে এবং মানুষের কানের পর্দার বদলে প্রকৃতির পরিপূর্ণ সুরটি তার মর্মের মধ্যে প্রবেশ করিয়ে দেয়। এইভাবে প্রকৃতির এইসব সুর ও ধ্বনি যে পরিবেশ ও বাতাবরণ রচনা করে তাতেই কবিমন কল্পনার অবকাশ পায়, প্রাত্যহিকীর কর্মবন্ধন থেকে মুক্তি পায়, আবেগ ও আনন্দ পায়।

'পাগল' রচনাটিতেও এই প্রকৃতি-তত্ত্ব অথবা এই আনন্দ-তত্ত্বই রবীন্দ্রনাথের অতিপ্রিয় 'নটরাজ' প্রতীকের আশ্রয় পেয়েছে। প্রকৃতির দ্বৈতরূপ 'নটরাজ' প্রতীকে মূর্ত।

বিশ্বপ্রকৃতির মধ্যে বিশ্বদেবতার শিব ও রুদ্র, জন্ম ও মৃত্যু, সৃষ্টি ও প্রলয়, এই যে দ্বৈতক্রিয়া, এ তাঁর লীলা; এতেই তো সেই আনন্দময়ের আনন্দরূপের প্রকাশ। বিশ্বপ্রকৃতিতে ব্যাপ্ত বিশ্বদেবতার এই আনন্দময় দ্বৈতলীলার রূপটি 'নটরাজ' প্রতীকে রবীন্দ্রনাথ বারবার প্রকাশ করেছেন। 'কল্পনা'র 'বর্ষশেষ', 'খেয়া'র 'আগমন', 'রাজা', 'অচলায়তন' ও 'ডাকঘর' নাটকের রহস্যময় অরূপ সেই আশ্চর্য রাজা এবং 'ঋতুরঙ্গশালা'র 'নটরাজ' কল্পনার মধ্যে আলোচ্য নিবন্ধটির 'পাগল'কেই পাওয়া যায়। স্রষ্টা বা প্রতিভাবান মাত্রই পাগল, কেননা তাঁরা সর্বসাধারণের সঙ্গে এক নন; তাঁদের অনুভব, উপলব্ধি, কল্পনা, ধ্যান, দৃষ্টি সবই অভাবনীয়. সাধারণের সঙ্গে তা আশ্চর্যরকম ব্যতিক্রম। তাঁরা কেন্দ্রাতিগ। তাঁদের নিয়মছাড়া, সৃষ্টিছাড়া সৃজনী-প্রতিভা ঐশ্বরিক, তাই মহৎশিল্পী মাত্রেই পাগল। বিশ্বদেবতা মহত্তম শিল্পী, তাই তিনি মহত্তম পাগল। তাই তো মহাদেব ভোলানাথ অমন সৃষ্টিছাড়া। তাই তো বিশ্বপ্রকৃতি এমন খামখেয়ালি—কখনো

কালবৈশাখী, ভূমিকম্প, জলস্তম্ভে বিশ্ব নাশের উপক্রম করেন, আবার কখনো জ্যোৎস্নায় পৃথিবী ভাসিয়ে দেন, ফুলে-ফলে-ফসলে শ্যামল পৃথিবী ভরিয়ে রাখেন। সৃষ্টির ধর্মই খামখেয়ালিপনা; নিয়ম-বন্ধনকে ভেঙ্গে তছ্‌নছ্‌ করে নতুন করে গড়া। কোন কিছুর প্রতি তার মোহ ও আসক্তি নেই, কোন কিছুই তাই সে রক্ষা করে না।' সংহারে তার সৃজনের মতোই আনন্দ। সুখের মূলে আছে লোভ আর মোহ। সুখ বস্তুগত, দেহগত। তাই সুখ পাছে হারাতে হয় সেই আশঙ্কায়, সদা ভীরু। আনন্দ দুঃসাহসিক, নির্দয়; কেননা তা নির্মোহ, নিরাসক্ত, বস্তু ও দেহাতীত। জীবনের জন্য তার অহেতুক মায়া নেই। মৃত্যু অহরহ জীবনকে নূতন করে, তুচ্ছকে করে অসাধারণ মূল্যবান। রূপের মধ্যে অপরূপ, বন্ধনের মধ্যে মুক্তির সন্ধান দেয় সে। প্রাত্যহিকতার গ্লানি, নিয়মের দাসত্ব আর প্রিয়জনের জন্য যে মুগ্ধ প্রণয়, তার থেকে মুক্তির আনন্দ নিয়ে আসে তাণ্ডব নৃত্যশিল্পী বিশ্বদেবতা নটরাজ (The cosmic Dancer)।

এতক্ষণ 'বিচিত্র প্রবন্ধে'র প্রায় সমস্ত প্রধান রচনাগুলির কেন্দ্রীয় ভাবমর্মটি উদ্ধৃত করে অন্তর্নিহিত ভাবগত মিলটি লক্ষ্য করছিলাম। দেখা গেল যে, এর কোন রচনাই নিঃসঙ্গ নয়, নয় দোসরবিহীন। প্রথমত একটি ভাব অধিকাংশ ক্ষেত্রে দুটি রচনায় পূর্ণতা পেয়েছে। যেমন 'রুদ্ধগৃহ' ও 'পথপ্রান্তে'; 'বাজেকথা' ও পনেরো আনা'; 'আষাঢ়' ও 'নববর্ষা'। এই জোড়-কলম রচনাযুগলের ভাবগত সাদৃশ্য ব্যতীত অন্য যুগলের সঙ্গেও ভাবঐক্য উপরের আলোচনায় স্পষ্ট হয়েছে। অপেক্ষাকৃত ভাব-গম্ভীর রচনা 'পাগল'-এ বিশ্বপ্রকৃতির অন্তরে বিশ্বদেবতার প্রলয়নৃত্য বা 'পাগলামি'র মধ্যে মহাশিল্পীর সৃষ্টিছাড়া সৃষ্টির আনন্দ ও প্রতিভার যে প্রকাশ-তত্ত্বটি মূর্ত হয়েছে, সেই ভাবটিই পূর্বোক্ত রচনাগুলিতে হালকা সুরে, আমেজী মেজাজে বলা হয়েছে। সুতরাং ভাবের দিক দিয়ে 'বিচিত্র প্রবন্ধের' অধিকাংশ রচনাগুলিই সম্পৃক্ত।

'ছোটনাগপুর', 'পরনিন্দা' 'মন্দির', 'লাইব্রেরী', 'রঙ্গমঞ্চ', 'সোনার কাঠি' প্রভৃতি গুটিকয় রচনা বিষয়ের দিক দিয়ে কিছুটা বৈচিত্র্য রাখে। 'সরোজিনী-প্রয়াণ' রচনাটি আমরা আলোচনা থেকে একরকম বাদ দিতে পারি, কেননা এটি রবীন্দ্রনাথের নেহাৎ কাঁচা লেখা। 'ছোটনাগপুর' ভ্রমনকাহিনীমূলক কথিকা এবং এ-লেখাটিতে রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিত্ব চিহ্ন কম। সঞ্জীবচন্দ্রের 'পালামৌ'র অনুকরণের চিহ্ন কেবল বর্ণনাভঙ্গিতে নয়, কোথাও-কোথাও এর ভাষাগঠনেও বর্তমান ঃ

(১) 'পৃথিবীর কঙ্কালের মতো' রুক্ষ প্রান্তরে 'এক একটা মুণ্ডের মতো পাহাড়ে'র গায়ে মেঘ জমেছে। এই দৃশ্যের বর্ণনায় রবীন্দ্রনাথ যখন লেখেন ঃ 'স্বজাতীয় মেঘেরা আসিয়া তাঁহার সঙ্গে কোলাকুলি করিয়া যাইতেছে', তখন অনুরূপ ক্ষেত্রে 'পালামৌ'র 'মর্ত্তে মেঘ করিয়াছে' বর্ণনা মনে পড়ে; (২) 'ছোটনাগপুরে' বরাকর নদীর উপর দিয়ে ছ্যাকড়া গাড়ি পার করার দৃশ্যটি হুবহু 'পালামৌ'র অনুরূপ দৃশ্যের অনুসরণ। 'টানাটানি করিয়া গাড়ী এই নদীর উপর দিয়া পার করিয়া আবার রাস্তায় তুলিল' এই পংক্তিটি 'পালামৌ'র দ্বিতীয় পৃষ্ঠায় এই ভাষাতেই আছে। 'পালামৌ'র বারো পৃষ্ঠায় ছোটনাগপুর মালভূমির পাহাড়ের বর্ণনায় বলা হয়েছে 'বিচলিত নদীর সংখ্যাতীত তরঙ্গ'। রবীন্দ্রনাথ এক্ষেত্রে নদীর বদলে সমুদ্রকে উপমান করেছেন। একশিলা প্রস্তরের গায়ে অশ্বত্থবৃক্ষের প্রসঙ্গে সঞ্জীব-চন্দ্রের বিখ্যাত উক্তি 'অশ্বত্থবৃক্ষ বড় রসিক, এই নীরস পাষাণ হইতেও রস গ্রহণ করিতেছে' এবং পরবর্তী উক্তি 'বৃক্ষটি বড় শোষক, নীরস পাষাণেরও নিস্তার নাই' রবীন্দ্রনাথের রচনায় নিছক বৃক্ষটির উল্লেখমাত্রে শেষ হয়েছে। বলা বাহুল্য 'পালামৌ'-এ সঞ্জীবচন্দ্রের কল্পনা ও রসসৃষ্টির গভীরতা ও প্রসার রবীন্দ্রনাথের চেয়ে তাঁর 'ছোটনাগপুরের' পরিপ্রেক্ষিতে ঢের বেশি। সঞ্জীবচন্দ্রের জীবন-রসরসিকতা তাঁর রচনার পদে-পদে পরিস্ফুট। এখানেও রবীন্দ্রনাথের হোল ভাবদৃষ্টি ও প্রকৃতিতন্ময়তা আর সঞ্জীবচন্দ্রের হোল রসদৃষ্টি ও

জীবনময়তা। একজনের হোল কথাশিল্পীর দৃষ্টি, অন্যজনের কবিদৃষ্টি। এ মৌল প্রভেদ একই অঞ্চলের ভ্রমনবৃত্তান্তেও স্পষ্ট, যদিও এক্ষেত্রে সঞ্জীবচন্দ্রের দ্বারাই রবীন্দ্রনাথ প্রভাবিত।

অবশ্য এই প্রত্যক্ষ প্রভাব সত্ত্বেও এই রচনাটিতেও রবীন্দ্রনাথের স্বকীয়তা একেবারে নিশ্চিহ্ন নয়। রচনার শেষাংশে মানুষের জীবনযাত্রার যে-আদর্শ একটি পাহাড়ী ঝর্ণার রূপকল্প দিয়ে তিনি বোঝাতে চেয়েছেন, সেটিই এই রচনাটির ফল। আর এই ফলটির দ্বারাই 'ছোটনাগপুর' রচনাটিও 'বাজেকথা', পনেরো আনা', 'নববর্ষা', 'আষাঢ়' প্রভৃতির মূল ভাবের সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়ে গেছে: 'গাছের তলা দিয়া দিয়া একটুখানি শীতল নির্ঝর যেমন ছায়ায় ছায়ায় কুলকুল করিয়া যায়, জীবন তেমন করিয়া যাইতেছে'। এই যে রূপকল্প, এটিই রবীন্দ্রনাথের প্রিয়তম ও আদর্শতম জীবনযাত্রার বার্তাবহ। বস্তুত এই রূপকল্পটির প্রতিটি অঙ্গ অত্যন্ত অর্থপূর্ণ। 'গাছের তলা', 'নির্ঝর' ও 'ছায়ায় ছায়ায়' জীবনের নিসর্গ-নির্ভরতার ব্যঞ্জনা দিচ্ছে; 'একটুখানি' কথাটি জীবনের নির্লোভ, নিরাসক্ত ও নিরভিমানতার ব্যঞ্জনা আনছে, 'শীতল' কথাটি ব্যঞ্জনা দিচ্ছে জীবনের নিরুদ্বেগ নিরুত্তাপ নিশ্চিন্ত প্রশান্তির; আর 'কুলকুল' ধ্বনিটির তাৎপর্য সবচেয়ে বেশি। জীবন নিসর্গ-নির্ভর, নির্লোভ, নিরাসক্ত, নিরভিমান, নিরুদ্বেগ, নিরুত্তাপ, নিশ্চিন্ত, প্রশান্ত হবে ঠিকই, কিন্তু সঙ্গে-সঙ্গে জীবনে গান থাকা চাই, প্রাণ থাকা চাই, বেগ থাকা চাই। 'কুলকুল' জীবনের সুর ও ছন্দের দিকটির ইংগিত দিচ্ছে, জীবনে সংগীত ও আনন্দের ব্যঞ্জনা দিচ্ছে। 'ছোটনাগপুর' রচনায় এই যে একটি রূপকল্প রবীন্দ্রনাথ দিয়েছেন, এখানেই তিনি এক মুহূর্তে সঞ্জীবচন্দ্রের প্রভাব অতিক্রম করে রবীন্দ্রত্বে উত্তীর্ণ হয়েছেন এবং অন্যান্য প্রধান রচনাগুলির মধ্যে তিনি যে জীবনাবেগের কথা বলেছেন, তার সঙ্গে এক হয়ে গেছেন।

'পরনিন্দা', 'মন্দির', 'রঙ্গমঞ্চ' 'লাইব্রেরী' ও 'সোনার কাঠি' রচনা কয়টির বিষয়বৈচিত্র্য অনস্বীকার্য। 'মন্দির' রচনাটিতে

আলোচনার বিষয় হয়েছে ভুবনেশ্বর লিঙ্গরাজ মন্দিরের স্থাপত্য-শিল্প। তবে স্থাপত্য-শিল্প আলোচনার বিষয় মাত্র হয়েছে, বস্তু আদৌ হয়নি। ভুবনেশ্বরের মন্দির দেখে এর স্থাপত্যের মধ্যে রচনাকারের মনে একটি বৃহৎ অর্থ উদয় হয়েছে। তিনি যেন কি একখানা নূতন গ্রন্থ পাঠ করলেন, মনে হয়েছে এই মন্দিরে উৎকীর্ণ শিল্পশৈলীর মধ্যে যেন পাথর কুঁদে ঋকমন্ত্র গাঁথা হয়েছে। মানুষ অনন্তের থেকে অন্তরে যে-বাণী পেয়েছিল, ভক্তিভরে সেই বাণীই বুঝি মন্দিরগাত্রে আকীর্ণ করে রেখেছে। চিরবহমান মানবসংসারজীবনের পরিপূর্ণ চরিত্র ও কাহিনী, মন্দিরগাত্রে পরিকীর্ণ এই স্থাপত্য শিল্প ব্যক্ত করছে। জড় পাষাণ শিল্পীর হাতে এসে কেমন করে চেতনাময় হয়ে ওঠে, কেমন করে তা মানুষের ভাষাকেও হার মানিয়ে মানবজীবনের গভীরতম সত্যের ব্যঞ্জনায় মুখর হয়ে ওঠে, ভুবনেশ্বর-কোনারকের মন্দিরশিল্প তারই স্বাক্ষর বহন করছে।

ভুবনেশ্বর-কোনারক মন্দির শিল্পের আলোচনায় যে প্রশ্নটি অনতিক্রমণীয়, রুচি ও শালীনতার সেই প্রসঙ্গটি স্বতই রচনাকারের আলোচনায় গুরুত্বলাভ করেছে। মন্দিরগাত্রে উৎকীর্ণ চিত্র ও মূর্তিশিল্পগুলির অধিকাংশই নরনারীর যৌনসংসর্গ ঘটিত। মন্দির তীর্থস্থান, দেবালয়, ভক্তের আত্ম-নিবেদনের পবিত্র প্রাঙ্গণ। মানুষ কামনাবাসনাতাড়িত জীবনে বীতশ্রদ্ধ হয়ে গ্লানিমুক্ত হতে প্রব্রজ্যা নিয়েই মন্দিরে আসে। অথচ এসে দেখে সেখানেও রয়েছে সেই ভোগলালসাময় জীবনেরই প্রতিচ্ছবি। ভোগলালসাবিমুখ প্রব্রজ্যাকামী ভারতীয় সংস্কৃতির সঙ্গে তার তীর্থক্ষেত্রের মন্দির গাত্রে এই যৌনলালসার চিত্রসমূহের সঙ্গতি কোথায়—এ একটি জটিল প্রশ্ন। পাশ্চাত্যশিল্পরসিকগণ ভারতীয় মন্দির-শিল্পকে অশ্লীল বলেছেন। রবীন্দ্রনাথ কিন্তু একে অশ্লীলতা দোষে অভিযুক্ত করার বদলে এই আপাত অশ্লীলদৃশ্যগুলির মধ্যে একটি বৃহৎ অর্থের সন্ধান পেয়েছেন। সেই বৃহৎ অর্থটি হোল: 'দেবতা দূরে নাই,···তিনি আমাদেরই মধ্যে আছেন। তিনি জন্ম মৃত্যু সুখদুঃখ পাপপুণ্য

মিলনবিচ্ছেদের মাঝখানে স্তব্ধভাবে বিরাজমান। এই সংসারই তাঁহার চিরন্তন মন্দির'। এই চঞ্চল, অস্থির, বিলীয়মান, বিচিত্র মানবসংসারের মধ্যে পরমেশ্বর স্থির ও নিত্যরূপে বিরাজ করছেন। মন্দিরগাত্রে মানবসংসারের বিচিত্র জীবনযাত্রার চলচ্চিত্র উৎকীর্ণ, মন্দিরমধ্যে তিনি আছেন স্থির ও নিত্যরূপে। ভক্ত এসে তাঁর সংসারের চঞ্চল ও অন্তরের স্থির দুই রূপই দেখে তাঁর নিত্যরূপে আত্মসমর্পণ করুক। ভারতীয় শিল্পী মন্দিরগাত্রে সংসারজীবনের কোন কিছুই বাদ দেয়নি, গোপনতম জীবনলীলাও পরিস্ফুট করেছেন, কুৎসিত বা অশ্লীল মনে করেননি ; কেননা নরনারীর যৌন সংসর্গ তো জীবনের নিত্যসত্য। মন্দিরগাত্রে সংসারের পরিপূর্ণ রূপ মুদ্রিত করতে গিয়েই শিল্পীকে নগ্ন হতে হয়েছে, এ তার অশ্লীল মনোবৃত্তি নয়, এ তার পূর্ণ অনাসক্ত দৃষ্টি। মন্দিরের বাইরে নরনারীর সংসারলীলা আর ভিতরে দেবতার নিত্যলীলায় জীবাত্মা-পরমাত্মার সাযুজ্য, সারূপ্য ও সালোক্য তিনি অনায়াসে, সহজ উপমায় ও সরল সাহসে মূর্ত করেছেন। উপনিষদের মন্ত্রই যেন বিশদভাবে এই মন্দিরে উৎকীর্ণ হয়েছে। লোকালয় ও দেবালয় এক হয়ে গেছে এই মন্দিরের ভিতরে ও বাইরে। নরনারীর সম্পর্কের রূপকে ভূমির সঙ্গে ভূমার, অসীমের সঙ্গে সীমার, সংসারের সঙ্গে বিশ্বের, এ-কালের সঙ্গে অন্যকালের যোগ একাত্ম হয়ে উঠেছে।

'মন্দির' রচনাটিতে একটি বৃহৎ অর্থের যে ব্যাখ্যাটি উপরে লক্ষ্য করা গেল, এর প্রায় সবটাই তাঁর নিজস্ব সৃষ্টি। বহুকথিত ভারতীয় সংস্কৃতির সমন্বয়মূলক ভূমাবাদের ধ্রুবত্বে তাঁর অসংশয় প্রত্যয়ের দরুণ তিনি মন্দিরের স্থাপত্যকলা শিল্পসম্মত পন্থায় বিচার না করে, সমস্ত ব্যাপারটি নিছক ভাবদৃষ্টি দিয়ে দেখেছেন। আর্টের ব্যাকরণ দিয়ে দেখলে ঐ মন্দিরগাত্রে উৎকীর্ণ শিল্পনিদর্শনসমূহে অনেক সূক্ষ্ম চারুতার পাশাপাশি রুক্ষ স্থূলতার নিদর্শনও তিনি পেতেন। শিল্পবিচারে অশ্লীলতা স্বীকার্য নয়, কিন্তু স্থূলতা অবশ্য স্বীকার্য। ভুবনেশ্বর মন্দিরের অনেক ছবিই স্থূল, কেবল রুচিগত স্থূলতা নয়,

শিল্প-কর্মেই স্থূল। রবীন্দ্রনাথ ভারতীয়ত্ববোধের জন্য এই স্থূলতাকে বৃহৎ অর্থের মনগড়া মহিমা চাপিয়ে এড়িয়ে গেছেন। 'মন্দির' রচনাটি শিল্পসমালোচনামূলক প্রবন্ধ হতে পারত; কিন্তু হয়নি। হয়েছে একটি সুন্দর ব্যক্তিগত রচনা শিল্প। 'বিচিত্র প্রবন্ধে'র অন্যান্য রচনার সঙ্গে এর এইমাত্র মিল যে এটিও প্রবন্ধ না হয়ে হয়েছে একটি অতিরিক্ত ব্যক্তিত্ব চিহ্নিত রচনা; বিচারের বদলে বিষয়ের রসোপভোগ।

'পরনিন্দা' রচনাটি কৌতুকরসাত্মক। এই লেখাটি খাঁটি রসরচনার সার্থক দৃষ্টান্ত। রসরচনার অন্যতম বৈশিষ্ট্য তার উপকরণের অকিঞ্চিৎকরতা। যাহোক-তাহোক কিছু-একটা উপলক্ষ্য পাওয়া গেলেই হোল, রচনাকার সেটিকে ঘিরে ঊর্ণনাভের মতো খেয়ালি কল্পনার তন্তু বুনতে আরম্ভ করেন। ঊর্ণনাভের দেহনিঃসৃত রসের মতো রচনাশিল্পীর একটি পরম রমণীয় রসবোধ রচনার সর্বত্র জড়িয়ে থাকে। 'পরনিন্দা'য় রচনার বিষয়টি হোল পরচর্চ্চার সার্থকতা। যদিও পরনিন্দা মানবস্বভাবের দুর্মোচণীয় অঙ্গ এবং পরনিন্দায় মানুষ চিরকাল আনন্দ পেয়ে আসছে তথাপি এ-জিনিষটি দূষণীয় বলেই পরিগণিত হয়ে থাকে। রচনাকার কিন্তু আলোচ্য ক্ষেত্রে পরনিন্দার একটি নূতন অথচ চমৎকার তাৎপর্য দিয়েছেন এবং প্রমাণ করেছেন যে পরিমিত পরনিন্দা দূষণীয় তো নয়ই, বরঞ্চ মনেব স্বাস্থ্যবর্ধক এবং হিতকর। পরনিন্দা আসলে অন্যের সমালোচনা। সমালোচনার ভয় না থাকলে সমাজে অনাচার দেখা দিত। পরনিন্দা সমাজকে ঐ অনর্থ থেকে রক্ষা করছে। 'উহা লবণের মতো সমস্ত সংসারকে বিকার' অর্থাৎ পচনশীলতা থেকে রক্ষা করছে। সমাজকে প্রকৃতিস্থ রাখতে নিন্দাভয় বা লোকভয় সাহায্য করে।

দ্বিতীয়ত, পরনিন্দা মহত্বকে গৌরবান্বিত করে। মহত্ব যে দুরূহ সাধনাসাপেক্ষ, নিন্দাই তা বুঝিয়ে দেয়। দোষীকে সংশোধন করার চেয়ে গুণীকে সমাদর দেওয়া নিন্দার প্রধান কাজ। নিন্দার দ্বারা বেদনাবোধ করে না এমন লোক হয়না। যে যত সংবেদনশীল, সে

তত অল্প নিন্দায় ব্যথা পায়। সুতরাং নিন্দাবাদ যদি যথার্থ না হয়ে অহেতুক হয়, তাহলে তা সহৃদয় স্পর্শকাতর গুণীর পক্ষে খুবই মর্মান্তিক হয়ে থাকে। তথাপি পরনিন্দা দূষণীয় নয়; কারণ নিন্দাবাদ কখনো বিচার নয়। নিন্দা সাক্ষ্য প্রমাণের ধার ধারেনা বলে প্রথমত সকলে তা বিচারকের রায়ের মতো অলঙ্ঘণীয় সত্য মনে করে না। দ্বিতীয়ত, নিন্দুককে পাল্টা নিন্দা করে নিন্দিতও একরকম সুখ পেতে পারে। নিন্দাবাদ জিনিষটা স্বভাবত লঘু বলে এতে ব্যথার চেয়ে কৌতুকের ভাগ বেশি। নিন্দা নিন্দুককে একরকম সুখ দেয় আর শ্রোতাদেরও ভাল লাগে। নিন্দায় সুখের রহস্যটি আছে আবিষ্কারকের কৃতিত্ব-বোধে। অপরের চরিত্রের বা জীবনের যে গোপন কথা কেউ জানে না অথচ একজন কেউ তা আবিষ্কার করে ফেলেছেন, এই যে কৃতিত্ব বা 'অহম'-কার, এতেই তার সুখবোধ হয়। যা আড়ালে-আবডালে ও গোপনে-নিভৃতে থাকে, সেই অজ্ঞেয়কে জানার কৌতূহল মানুষের স্বভাবসিদ্ধ; এবং সেই দুর্লভতার মোহই নিন্দুককে অন্যের হাঁড়ির খবর বলতে প্রলুব্ধ করে। গোপনকে জানার কৌতূহল ও কৃতিত্বে নিন্দুকের সুখ, কিন্তু তা নিন্দিতের অনিষ্টকামনাজাত নয়। অবশ্য বিদ্বেষমূলক নিন্দাও সংসারে আছে। বিদ্বেষমূলক নিন্দা নিঃসন্দেহে জঘণ্য অপরাধ, কিন্তু পরিমাণে তা অনধিক। খাঁটি পরনিন্দা বা পরচর্চ্চা খলতাহীন কৌতূহল ও কৌতুকপ্রিয় সুখবোধ বই নয়। বিশেষত নিন্দাবাদের মধ্য দিয়ে তার উপস্থিত নিন্দার ভিত্তি সত্য বা মিথ্যা যেটাই হোক, নিন্দুক বস্তুত একটি শ্রেয়োবোধ বা একটি আদর্শবোধ এবং মহত্বের মহিমাই ঘোষণা করে।

'রঙ্গমঞ্চ' রচনায় রচনাকার আকাশ-আঙ্গিনা প্রাঙ্গণে দৃশ্যপট, পর্দা ও সাজসরঞ্জামহীন মুক্তাঙ্গন অভিনয়ের পক্ষে স্বীয় অভিমত ব্যাখ্যা করেছেন। সাজসজ্জা ও দৃশ্যপট-বিহীন মুক্তাঙ্গন অভিনয়ের পক্ষে তাঁর যুক্তির সারকথা হোল এই যে, অন্যথায় দৃশ্যপট সীমিত মঞ্চে কাব্যের অসীম ব্যঞ্জনা পরিস্ফুট হতে বাধা পায়। দ্বিতীয়ত, দৃশ্যপট-সাজসজ্জা রংচং দিয়েই যদি অভিনয় রচনা হয় তাহলে অভিনয়-

শিল্পীদের কৃতিত্ব যেমন লাঘব হয় তেমনি দর্শকগণের কল্পনা-বিস্তার ও কাব্যরসগ্রহণের সহৃদয়তার প্রতিও অশ্রদ্ধা প্রকাশ করা হয়।

'লাইব্রেরী' রচনায় উপমার মালা গেঁথে গ্রন্থাগারের মহিমা বর্ণনা করা হয়েছে এবং এর শেষাংশে রয়েছে বাঙ্গালীকে গৃহমুখীনতা পরিত্যাগ করে বিশ্বের সঙ্গে একতালে সৃষ্টিকর্মে নিয়োজিত হবার আহ্বান।

'সোনার কাঠি' রচনায় আলোচনার উপলক্ষ্য হয়েছে সংগীত। আমাদের সাহিত্য যেমন বিদেশী সাহিত্যের স্পর্শে সজীব ও সৃজনশীল হয়ে উঠেছে, আমাদের সংগীতকেও তেমনি বিদেশী সংগীতের সংস্পর্শে নবায়িত করতে হবে। পাশ্চাত্ত্য প্রভাবকে রচনাকার 'সোনার কাঠি' বলেছেন, এই সোনারকাঠির ছোঁয়ায় সাহিত্যের মতো সংগীতও আধুনিক হয়ে উঠুক, এই ইচ্ছা কবি জানিয়েছেন। 'ছবির অঙ্গ' রচনাটিতে চিত্রশিল্পের আলোচনায় ছবির শাস্ত্রোক্ত ছটি অঙ্গের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করে বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যই যে রূপসৃষ্টির তত্ত্ব, তা দেখাতে চেয়েছেন। 'ছবির অঙ্গ', 'ছোটনাগপুর', 'মন্দির', 'লাইব্রেরী' ও 'সোনার কাঠি' এই পাঁচটি রচনা বিষয়ের দিক দিয়ে বিচিত্র, অন্যান্য রচনাগুলির সঙ্গে ভাবমর্মে অসম্পৃক্ত এবং কিছুটা প্রবন্ধের লক্ষণাক্রান্ত।

ভাবের ও বিষয়ের মিল না থাকলেও এই রচনাগুলির সঙ্গে অন্যান্যগুলির ভঙ্গির অর্থাৎ রচনারীতির (Style) মিল আছে। প্রসঙ্গত 'বিচিত্র প্রবন্ধে'র গদ্যশৈলীর আলোচনা এসে পড়ে। কিন্তু পরে রবীন্দ্রনাথের রচনাশিল্পের গদ্যরীতি নিয়ে পৃথকভাবে আলোচনা করা হবে বলে এখানে কেবল 'বিচিত্র প্রবন্ধে'র গদ্যরীতির সাধারণ ধর্মটি উল্লেখ করছি। 'বিচিত্র প্রবন্ধে'র সব রচনাই রচনাকারের ব্যক্তিত্ব-চিহ্নিত। এই ব্যক্তিত্ব-চিহ্নের প্রথম বৈশিষ্ট্য লেখকের 'মুড'। সব কটি রচনায় একই 'মুড' রয়েছে। অবশ্য 'মুড'-এর তরঙ্গ কোথাও উঁচুতে, কোথাও নিচুতে, কোথাও গম্ভীর, কোথাও লঘু; কিন্তু এই খেয়ালি মেজাজ এটাই প্রমাণ করে যে রচনাকার

'মুড়ে' আছেন। 'রুদ্ধগৃহ' ও 'পথপ্রান্তে' রচনাদুটির গদ্যরীতি 'বাজেকথা' ও 'পনেরো আনা'র রীতির থেকে প্রথমটা স্বতন্ত্র মনে হতে পারে। কিন্তু এই স্বাতন্ত্র্য একই মুডের দুটি ভঙ্গি, একটি লঘু, একটি গুরু। লঘুগুরুভঙ্গির এই তরঙ্গ কেবল আলাদা-আলাদা রচনার নয়, একই রচনায়ও পাশাপাশি মিলিত হয়েছে। দ্বিতীয়ত, রচনাকারের 'অহম' বা 'আমি'-পুরুষটির সদা উপস্থিতি সব রচনাতেই। সব রচনাই প্রথম পুরুষে লেখা। রচনাশিল্পের প্রধান লক্ষণ এইটিই —এই ব্যক্তিত্বের আরোপ, প্রথম পুরুষের প্রাধান্য। তৃতীয়ত, সম্বোধনের একটি সাধারণ রীতি রচনাগুলির মধ্যে দেখা যায়। রচনাকার একদিকে, আর সকলে যেন তাঁর প্রতিপক্ষ। প্রতিপক্ষের মনোভাব বা বক্তব্য আগেভাগে নিজেই বলে দিয়ে পরক্ষণে সেটির অসারতা দেখিয়ে পরাভূত প্রতিপক্ষের জীবনবোধের অসম্পূর্ণ সংকীর্ণতার জন্য করুণা প্রকাশের একটি সাধারণ লক্ষণও রচনাভঙ্গিতে ফুটে উঠেছে। যেমন 'বসন্তযাপনে' প্রতিপক্ষকে সম্বোধন করে করুণা করছেন, 'হায়রে সমাজ দাঁড়ের পাখী'। 'পনেরো আনা'য় প্রতিপক্ষের প্রতি করুণামিশ্রিত উপদেশ 'জীবন বৃথা গেল। বৃথা যাইতে দাও।' প্রতিপক্ষের প্রতি সম্বোধনে মধ্যমপুরুষ ব্যবহারের এই রীতির কিছুটা বঙ্কিমচন্দ্রের 'কমলাকান্তের দপ্তরের' রচনারীতির দ্বারা প্রভাবান্বিত। চতুর্থত, একমাত্র 'সোনারকাঠি' ছাড়া বাকি সব রচনাই সরল সাধুভাষায় লেখা। বিষয়টি গম্ভীর বা কৌতুকরসাত্মক যাই হোক, পদবিন্যাস, পর্বসন্নিতি, ভাব ও অর্থগত যতি স্থাপন, পদেপদে উপমা উৎপ্রেক্ষার প্রয়োগ প্রভৃতি একই ব্যাকরণ, একই রচনারীতি সর্বত্র রয়েছে। এই সব কারণে কেবল ভাব নয়, ভঙ্গিতেও এ-রচনাগুলির মধ্যে একই রচনারীতি (Style) অনুসৃত হয়েছে।

'বিচিত্র প্রবন্ধে' রস-রচনার আদর্শ স্থাপিত হয়েছে। রসরচনা যে চুটকি কৌতুক নয়, অথবা সাংবাদিকতাও নয়, গভীর কথা সহজ-ভাবে প্রসন্নচিত্তে বলার আর্ট-ই যে রসরচনা, (Belles Letters)

রবীন্দ্রনাথ তা দেখিয়ে গেছেন। 'বিচিত্র প্রবন্ধে' কবিত্ব, দার্শনিকতা, বাহ্যজগতকে পর্যবেক্ষণ এবং অন্তরে অবগাহন যেমন আছে, তেমনি কবিত্ব, দার্শনিকতা, পর্যবেক্ষণ ও অবগাহন মিলেমিশে বৈচিত্র্যের মধ্যে সমগ্রতার ঐক্যও আছে। কবিত্ব ও দার্শনিকতার প্রভেদ জল ও বরফের সম্পর্কের অনুরূপ। জল জমে বরফ হয়। তেমনি কবিত্ব বেশী গভীর ও নিবিড় হোলেই জমে যায়, জমে দর্শন হয়ে ওঠে। আবার জল যেমন পানীয়, কবিত্বও তেমনি আস্বাদনীয়; বরফ তেমন নয়, সেটি প্রায়ই গুরুপাক এবং অব্যবহার্য। 'রুদ্ধগৃহে' 'বিস্মৃতিতত্ত্ব', 'পথপ্রান্তে' 'পথতত্ত্ব', 'নববর্ষা', 'আষাঢ়' ও 'বসন্তযাপনে' 'অবকাশতত্ত্ব', 'কেকাধ্বনি'তে' 'সৌন্দর্যতত্ত্ব', 'বাজেকথা' ও 'পনেরো আনায়', 'ক্ষুদ্র ও ক্ষণবাদ' প্রভৃতি দার্শনিক ভাবমর্ম রয়েছে। 'পাগল' প্রবন্ধটি রীতিমত দর্শনের কোঠায় পড়ে। বিশ্বশিল্পী বিশ্বদেবতা এবং জীবনশিল্পী জীবনদেবতার বিশ্বপ্রকৃতির অনন্ত আঙ্গিনায় মিলন বা প্রতিভাবান এবং বিশ্বস্রষ্টা উভয়কেই পাগল সম্বোধনের দ্বারা এক করা প্রভৃতি দর্শনের এলাকাভুক্ত আলোচনা। বন্ধনহীন ও অনাসক্ত প্লেটনিক প্রেমের আদর্শ রবীন্দ্রনাথের কবিতায় ছড়াছড়ি যায়। ব্যক্তির সীমানা-ছাড়া এই প্রেমাদর্শই 'বিচিত্র প্রবন্ধে' প্রতিষ্ঠিত। জীবন নয়, এ প্রেম পথের প্রতি। তাই গতিই ধ্রুব। এই গতিবাদ বার্গ্‌সঁ-র নয়; গতির এ অনুভূতি তিনি উপনিষদ থেকেই পেয়েছেন। সত্য কেবল ক্ষণ, সত্য হোল অনু; প্রতিক্ষণের আনন্দই সত্য। গতির অন্তরে রয়েছে প্রেমের অভিকর্ষ। প্রেমের কেন্দ্রাতিগ শক্তিই জীবনকে সীমার কেন্দ্রানুগত্য থেকে টেনে এনে চন্দ্রসূর্যগ্রহতারকার সঙ্গী করে নেয়। সীমা-অসীম, ভূমা-ভূমি, বিশ্বদেবতা ও জীবনদেবতার বিশ্বপ্রকৃতির কোলে দ্বৈত আনন্দলীলা এবং জীবন ও মৃত্যু, স্মৃতি ও বিস্মৃতির পরিপূরকতা প্রভৃতি রবীন্দ্রদর্শনের সব কটি চিন্তাধারা বা মতবাদেরই অভিব্যক্তি 'বিচিত্র প্রবন্ধ'-এর রচনাগুলিতে আছে।

কেবল দার্শনিকতা নয়, 'বিচিত্র প্রবন্ধে' রচনাকারের জীবন

পর্যবেক্ষণের সূক্ষ্ম স্বাক্ষরও আছে প্রচুর। 'মন্দির' ও 'ছোটনাগপুর' স্পষ্টত পর্যবেক্ষণ-অভিজ্ঞতার সৃষ্টি। ঋতু বিষয়ক রচনাগুলিতেও বর্ষা-বসন্ত-শরতের রূপবৈচিত্র্য পর্যবেক্ষণের ছাপ আছে। 'পরনিন্দা'য় মানবচরিত্র পর্যবেক্ষণ বা মনস্তত্ত্ব অনুধাবনের পরিচয় প্রাঞ্জল। বিভিন্ন রূপকল্প ব্যবহারেও এই পর্যবেক্ষণশীলতার পরিচয় মেলে।

কিন্তু পর্যবেক্ষণ অপেক্ষা 'বিচিত্র প্রবন্ধে'র রচনাগুলিতে লেখকের অন্তরে অবগাহনের পরিচয়ই অধিক। 'রুদ্ধগৃহ', 'পনেরো আনা', 'পাগল', 'নববর্ষা', 'বসন্তযাপন' রচনাগুলিতে রচনাকার আপন অন্তরের গভীরতম অন্তঃস্থলে অবগাহন করেছেন এবং বাইরের রূপ-জগত সম্বন্ধে প্রায় লুপ্তচৈতন্য হয়ে কেবল স্বীয় অন্তরাবেগকে প্রস্রবনের মতো উচ্ছ্বসিত করেছেন। এগুলির অনেকটাই যেন কবির মগ্নচৈতন্যের সৃষ্টি। মগ্নচৈতন্যের জন্যই কোন-কোন রচনার কোন-কোন অংশে অস্পষ্ট রহস্যময়তা বা 'মিস্টিসিজমে'র আভাস লেগেছে এবং সে অংশগুলি স্বভাবত সুরময় হয়ে উঠেছে। এই জায়গাগুলিতেই রচনাকাবের আবেগ ভাবুকতা অতিক্রম করে কবিত্বে উঠে গেছে। 'বিচিত্র প্রবন্ধ'-এর 'রুদ্ধগৃহ', 'পথপ্রান্তে', 'পাগল' প্রভৃতি রচনার কোন-কোন অনুচ্ছেদ স্বতই গদ্যকবিতা হয়ে উঠেছে। যেমন 'পথপ্রান্তে'র প্রথম থেকে শেষ স্তবক পর্যন্ত সমস্তটা; অথবা 'রুদ্ধগৃহে'র চতুর্থ স্তবকঃ এ ঘর বিধবা..... ...সেই অবধি এখানে যেন মৃত্যুরও মৃত্যু হইয়াছে। 'পথপ্রান্তে' ও 'রুদ্ধগৃহে'র সঙ্গে 'লিপিকা'র 'সন্ধ্যা ও প্রভাত', 'সতের বছর', 'প্রথম শোক' গদ্যকবিতার ভাব ও ভাষাগত মিল এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়। প্রকৃতি, প্রেম ও মানব এই তিনের ঐক্যতত্ত্ব রবীন্দ্রনাথের কবিতার একটি প্রধান মর্মবাণী এবং পথ-তত্ত্ব বা গতিই এই তিনের ঐক্যের মূল। সুরু ও সারার প্রতীক পথ ও পথপ্রান্ত; আবার সন্ধ্যা ও প্রভাতও ঐ একই ব্যঞ্জনা দিচ্ছে। 'রুদ্ধগৃহ' কাদম্বরী দেবীর আত্মহত্যার পর অর্গলবদ্ধ ঠাকুর বাড়ীর একখানি গৃহমাত্র নয়, কবির অবরুদ্ধ

হৃদয়গৃহের ব্যঞ্জনাই রয়েছে এর মধ্যে। এ দুটি রচনার নামকরণ কবিতার মতোই তাৎপর্যময়।

ভাবোচ্ছ্বাসময় গদ্যকবিতা-প্রায় রচনা 'রুদ্ধগৃহ' ও 'পথপ্রান্তে'; দার্শনিকতাস্পর্শী আত্মোপলব্ধিমূলক রচনা 'পাগল'; পর্যবেক্ষণপ্রধান বর্ণনাধর্মী রচনা 'আষাঢ়', 'শরৎ', 'ছবির অঙ্গ', 'সোনার কাঠি', 'মন্দির', 'রঙ্গমঞ্চ', 'পরনিন্দা' প্রভৃতি সবই কমবেশী অন্তরে অবগাহন-মূলক মন্ময় রচনা। এই মন্ময়তাগুণেই 'বিচিত্র প্রবন্ধ' এমন অনবদ্য হয়েছে। 'রুদ্ধগৃহ' রচনার প্রচ্ছন্ন করুণ রস মিশেছে 'পথপ্রান্তে'র নির্বেদ-ভাবাত্মক শান্তরসের সঙ্গে। 'বাজেকথা', 'পনেরো আনা' ও 'পরনিন্দা'র বিদগ্ধ (Witty) কৌতুকহাস্যরসের সঙ্গে 'মাভৈঃ'এর মৃত্যুঞ্জয়ীভাবের উৎসাহব্যঞ্জক মৃদু বীররস মিশেছে। বাকি রচনাগুলিতে রয়েছে প্রসন্নরস। রচনাকারের মনের হাসির স্নিগ্ধতাই 'বিচিত্র প্রবন্ধে'র রচনাগুলির মাধুর্যের উৎস। বাংলার প্রবন্ধ সাহিত্যে 'বিচিত্র প্রবন্ধে'র দোসর নেই। বঙ্কিমচন্দ্রের 'কমলা-কান্তের দপ্তর' এবং অবনীন্দ্রনাথের 'কুঁকড়ো'র মতো কিছু কিছু রচনা-সাহিত্য ছাড়া 'বিচিত্র প্রবন্ধ' জাতীয় বিশুদ্ধ রচনাশিল্প বাংলা সাহিত্যে এখনো হয়নি। 'বিচিত্র প্রবন্ধে' রবীন্দ্রনাথের গদ্যশিল্প অজন্তার চারুতা রচনা করেছে।

ভ্রমণ সাহিত্য : পথের সঞ্চয়

১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দে 'বিচিত্র প্রবন্ধ' এবং ১৯১০ খ্রীষ্টাব্দে 'পথের সঞ্চয়' প্রকাশিত হয়। ১৯১২ খ্রীস্টাব্দে রবীন্দ্রনাথ দ্বিতীয়বার বিলাত গমন করেন এবং সেখান থেকে আমেরিকায়ও ভ্রমণে যান। এই বিদেশ ভ্রমণ রবীন্দ্রনাথের জীবনের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সৌভাগ্য ও সম্পদ। এই ভ্রমণের সময় তিনি তাঁর শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্য বিদ্যালয় ও আশ্রমের আদর্শ বিশ্বের গুণী জ্ঞানীর কাছে উপস্থাপিত করেন এবং বিশ্বভারতীকে যথার্থত বিশ্ববাসীর মিলনকেন্দ্ররূপে গড়ে তোলার সম্ভাবনার সন্ধান পান। আর্থিক সাহায্য তো পেয়েছিলেনই, তার চেয়েও বেশি পেলেন আধ্যাত্মিক সাহায্য। দ্বিতীয়ত, এই পরিভ্রমণকালে তিনি য়ুরোপের বহু কবি, শিল্পী ও মনীষীর বন্ধুত্বলাভ করেন এবং এদেরই উদ্যোগে অনতিবিলম্বে তিনি নোবেল পুরস্কার পান। ১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দে রবীন্দ্রনাথের নোবেল পুরস্কার প্রাপ্তির অবিস্মরণীয় লগ্নের অনতিপূর্বে ১৯১২ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর য়ুরোপ ভ্রমণ-কালীন মানসিকতার স্বাক্ষর এই 'পথের সঞ্চয়'। এই দিক দিয়েও এ-গ্রন্থখানির একটি বিশেষ মর্যাদা আছে।

'পথের সঞ্চয়' কী জাতীয় সাহিত্য তার পরিচয় এর নামেই। তবে ভ্রমণ-কাহিনী না বলে একে ভ্রমণ-সাহিত্য বলাই সঙ্গত। ভ্রমণ-কাহিনীও সাহিত্য হতে পারে; তথাপি ভ্রমণ-সাহিত্য বলার উদ্দেশ্য উভয়ের মধ্যে রচনার বিষয় ও ভঙ্গিগত প্রভেদটুকু স্পষ্ট করা। ভ্রমণ-কাহিনীতে কাহিনীর ভাগ কম নয়; অসম্পৃক্ত, ক্ষণস্থায়ী এবং বিলীয়মান বহু চিত্র ও চরিত্রের সমাবেশে পরিব্রাজকের অভিজ্ঞতা, উপলব্ধি ও উপভোগের সরস, সরল বর্ণনামূলক রচনার

নাম ভ্রমণ-কাহিনী। এতে গল্পের স্বাদ বেশ পাওয়া যায়, অথচ ছোটগল্প বা উপন্যাসের সম্পূর্ণতা ও জীবনবোধের গভীরতা না থাকায় পাঠকের 'সিরিয়স' হওয়ার দায় থাকে না। ভাবের চেয়ে বিষয়ের বর্ণনার ভাগ থাকে বেশি। পরিদৃশ্যমান ভৌগোলিক সৌন্দর্য, অপরিচিত সমাজজীবনের অভিনব রীতিনীতির জন্য কৌতুক ও কৌতূহল বোধ, পথে প্রবাসে আচম্‌কা-পাওয়া অভিজ্ঞতার বিস্ময় ও পুলক, নিজের দেশের মানুষের সঙ্গে নূতন মানুষদের সঙ্গ ও স্বভাবের মাঝে-মাঝে তুলনা, এই সব হোল ভ্রমণ-কাহিনীর সাধারণ উপকরণ। এই সব সাধারণ লক্ষণ মেলালে 'পথের-সঞ্চয়'কে ভ্রমণ-কাহিনী বলা সঙ্গত হবে না। কেননা এর মধ্যে য়ুরোপ-আমেরিকার ভৌগোলিক সৌন্দর্য-বর্ণনা প্রায় নেই। এ-কম বিস্ময় নয় যে, রবীন্দ্রনাথের মতো প্রকৃতিতান্ত্রিক কবি য়ুরোপের পথে-প্রবাসে ঘুরেছেন অথচ তাঁর নিসর্গ-চিত্র রচনা করেননি। তাঁর সতের বছর বয়সে লেখা 'য়ুরোপ প্রবাসীর পত্রে' ইংলণ্ডের বহু ল্যাণ্ডস্কেপ আছে। কিন্তু একথা বলতেই হয় যে, য়ুরোপের নিসর্গপ্রকৃতি রবীন্দ্রনাথকে তেমন মুগ্ধ করেনি, যেমন করেছে বাংলার আকাশ-নদী-মাঠ। এমনকি ভারতবর্ষের হিমাচল-বিন্ধ্যাচল-কাশ্মীর-কন্যাকুমারিকাও রবীন্দ্রনাথের উপর তেমন প্রভাব বিস্তার করেনি, যেমন করেছে পূর্ব বাংলার পদ্মা-চলনবিল আর বীরভূমের কোপাই-খোয়াই-শালবীথি। 'পথের সঞ্চয়ে' য়ুরোপের নিসর্গচিত্র যেমন বিরল, য়ুরোপীয় মানুষের চরিতকথাও তেমনি ক্বচিৎ এসেছে। 'কবি য়েট্‌স', 'স্টপফোর্ড ব্রুক', 'রোদেনস্টাইন' প্রভৃতি কয়েকজনের চমৎকার চরিত্র-চিত্রন (Pen Picture) আছে। কিন্তু এঁরা সকলেই ছিলেন আমাদের কবির অন্তরঙ্গ বন্ধু। এঁদের সাহচর্য, আতিথ্য ও সমাদরে কবির এই ভ্রমণ যাত্রা সার্থক হয়েছে। এঁদের তাই তিনি স্বতন্ত্রভাবে এক-একটি পত্রাকার রচনায় সশ্রদ্ধ প্রীতি দিয়ে এঁকেছেন। ভ্রমণ-কাহিনীর মধ্যে যে অসংখ্য চরিত্রের ভিড় হয় তাঁরা কেউ এঁদের মতো প্রথিতযশা গুণী ও মনীষী নন—সাধারণ নাম-না-জানা পথিক

মানুষের ক্ষণমিলনের চকিত চরিত্র-চিত্র-ই এর সম্পদ। তেমন নাম-না-জানা বিদেশী পথিকের চকিত-চিত্র 'পথের-সঞ্চয়ে' নেই। 'ছিন্নপত্রে' এরকম সাধারণ নাম-না-জানা মানুষের চকিত চরিত্র-চিত্র আমরা অনেক পেয়েছি, যেগুলি পরে 'গল্পগুচ্ছে' পূর্ণতা পেয়েছে। তাই 'ছিন্নপত্রে' ভ্রমণকাহিনীর যতটা উপকরণ আছে, 'পথের সঞ্চয়ে' বাহুত সেটুকুও নেই। 'ইংলণ্ডের ভাবুক-সমাজ' রচনাটিতে সাধারণ-ভাবে ও-দেশের গুণীসমাজের বৈশিষ্ট্যের প্রতি দৃষ্টিপাত করা হয়েছে। কিন্তু এ-ও চরিত্র-চিত্র নয়।

চিত্র ও চরিত্র ছাড়া, পথেঘাটে আচম্‌কা-পাওয়া দুর্লভ কোন অভিজ্ঞতার বিস্ময়, য়ুরোপীয় গার্হস্থ্য ও সমাজজীবনের রীতিনীতির প্রতি কৌতূহল এবং কৌতুকরসবোধও 'পথের সঞ্চয়ে' বিরল।

তথাপি যে একে আমরা ভ্রমণ-সাহিত্যের অন্তর্ভূত করছি, তার কারণ এই নয় যে এটি পথে ও প্রবাসে রচিত হয়েছিল এবং এর নামকরণেও এই ভ্রমণের পরিচয়টি স্পষ্ট করে বলে দেওয়া হয়েছে। যে ব্যক্তিত্ব-চিহ্নিত রচনার মধ্যে পরিব্রাজকের বহির্দৃষ্টি ও অন্তর্দৃষ্টির সঙ্গে স্মৃতি-নিঃসৃত সুনির্বাচিত দৃশ্যাবলীর সংযোগ হয়, তাকেই উৎকৃষ্ট ভ্রমণ-সাহিত্য বলা সঙ্গত। এই সংজ্ঞানুযায়ী 'পথের সঞ্চয়' উৎকৃষ্ট ভ্রমণ-সাহিত্য।

ভ্রমণ-সাহিত্যে ছোটগল্প, উপন্যাস, পত্র, ডায়েরি, প্রবন্ধ ও রসরচনা—সাহিত্যের সব দিকেরই কম বেশী মিশ্রন থাকে। তবে যেটির পরিমাণ আনুপাতিক হারে বেশী থাকে তদনুযায়ী তার বিশেষ শ্রেণীভাগ ও নামকরণ করা যায়। রবীন্দ্রনাথের ভ্রমণ-সাহিত্যগুলি হয় প্রবন্ধ, নয় রচনাধর্মী। গল্প বা উপন্যাসধর্মী ভ্রমণ-কাহিনী তিনি লেখেননি। 'মহাপ্রস্থানের পথে' উপন্যাসধর্মী, 'দৃষ্টিপাত' গল্পধর্মী, 'দেশেবিদেশে' রসরচনাধর্মী, 'চীন দেখে এলাম' ডায়েরিধর্মী, 'য়ুরোপপ্রবাসীর পত্র' পত্রধর্মী, 'রাশিয়ার চিঠি' এবং 'পথের সঞ্চয়' প্রবন্ধধর্মী ভ্রমণসাহিত্য।

'পথের সঞ্চয়'-এর রচনাগুলি আত্মগত এবং স্বয়ং সম্পূর্ণ; সাধারণ

ভ্রমণ কাহিনীর মতো নিরবচ্ছিন্ন ভাব বা বর্ণনা নেই। প্রতিটি রচনাই স্বতন্ত্র এবং প্রতিটি রচনাতেই কিছু তত্ত্ব ভার আছে। এই হিসাবে একে দার্শনিক প্রবন্ধধর্মী ভ্রমণ-সাহিত্য বলা যেতে পারে।

আধ্যাত্মিকতার সাধারণধর্মের জন্য 'পথের সঞ্চয়ে'র সকল লেখার মধ্যে একটি ভাব ও ভঙ্গিগত মিল আছে। 'বিচিত্র প্রবন্ধে'র রচনাগুলির মধ্যে যে মূলগত ঐক্য আছে, 'পথের সঞ্চয়ে'র ঐক্য তার চেয়েও অন্তরঙ্গ। 'বিচিত্র প্রবন্ধে' যতটুকু বিষয়-বৈচিত্র্য আছে, 'পথের সঞ্চয়ে' ততটুকুও নেই। বিষয় ও ভাব-বৈচিত্র্যহীন এই গ্রন্থের রচনাগুলির মূল সুর একটিই—প্রাচ্য ও প্রতীচ্য সংস্কৃতির মিলন এবং সেই মিলনের মধ্য দিয়ে সীমা ও অসীমের সমন্বয়ের আনন্দোপলব্ধি।

'পথের সঞ্চয়' কবির মধ্য বয়সের রচনা। পঞ্চাশোত্তর কবি বিশ্বভ্রমণে বেরিয়েছেন, তাঁর সমগ্র চৈতন্যে তখন সর্বানুভূতি। সীমার মাঝে যে 'অসীম তুমি'র 'আপন সুর' কবি অনেক দিন আগে থেকেই শুনছিলেন এবং নিজের রচনার মধ্যে যাঁর মধুর প্রকাশ দেখে নিজেই আনন্দে-বিস্ময়ে রোমাঞ্চিত হচ্ছিলেন, সেই আনন্দময় দিব্য পুরুষটিই 'পথের সঞ্চয়ে'র সব রচনার কেন্দ্রীয় আত্মা। এই আনন্দবাদই এই বিশ্বমুখীন রচনাগুলির মূল ভাব-প্রেরণা।

'পথের সঞ্চয়ে' তিন ধরণের রচনা আছে। (১) প্রথম শ্রেণীর রচনা ভাবের দিক দিয়ে অধ্যাত্মদর্শনমূলক এবং রীতির দিক দিয়ে সুরধর্মী (Lyric)। 'আনন্দরূপ', 'যাত্রা', 'দুই ইচ্ছা', 'মায়াবাদ', প্রভৃতি এই শ্রেণীর দৃষ্টান্ত। (২) দ্বিতীয় শ্রেণীর রচনাগুলি বিষয়ের দিক দিয়ে সংগীত ও শিল্প বিচারমূলক এবং রীতির বিচারে জ্ঞানধর্মী (Informative)। 'অন্তর বাহির', 'খেলা ও কাজ', 'সংগীত', 'কবি য়েট্‌স' প্রভৃতি এই শ্রেণীর অন্তর্ভূত। (৩) তৃতীয় শ্রেণীর নিবন্ধের বিষয় ও ভাব হোল প্রধানত প্রাচ্য ও প্রতীচ্য জীবনযাত্রা

ও সংস্কৃতির চরিত্রগত প্রভেদ এবং মিলনের আকাঙ্ক্ষা আর রচনার রীতিটি মুখ্যত বর্ণনাধর্মী (Descriptive)।

প্রথম শ্রেণীর রচনাগুলিতে রবীন্দ্রনাথের গতিবাদ, লীলাবাদ, আনন্দবাদ এবং সীমা-অসীমবাদের অভিব্যক্তি হয়েছে। মনে রাখতে হবে, 'পথের সঞ্চয়' 'গীতাঞ্জলি' ও 'ডাকঘর' রচনার সমকালীন। তবে 'পথের সঞ্চয়'-এর শেষ পর্যায় কিন্তু 'গীতাঞ্জলি'-পর্ব অতিক্রান্ত এবং নবউজ্জীবনের কাব্য 'বলাকা'-পর্বের শুরু পর্যন্ত বিস্তৃত। তাই 'পথের সঞ্চয়ে' একদিকে যেমন 'গীতাঞ্জলি'র বিশ্বদেবতার প্রতি কবির জীবনদেবতার বিগলিত আত্মনিবেদনের আনন্দার্তি আছে, আছে 'ডাকঘরে'র সীমা ও অসীম বা রূপ ও অরূপের মিলন, তেমনি রয়েছে 'বলাকা'র সঞ্জীবনী তেজ, আছে গতিধর্ম। কবির 'অন্তর্নিহিত আমি', 'কবির অন্তরের কবি', নামান্তরে কবির জীবনদেবতা কবিকে দিয়ে অজস্র সৃষ্টিকর্ম করিয়ে নিচ্ছেন; এই যে তাঁর লীলা, এই তো তাঁর আনন্দ। আর সমস্ত আনন্দের যিনি আধার সেই আনন্দরূপের স্বরূপ উপলব্ধি করার জন্যই কবি বিশ্বভ্রমণে বেরিয়েছেন। এই আনন্দ-রূপ বিরাট ও বিচিত্র। দুটি চোখ দিয়ে এই বিরাটকে যত দিক দিয়ে যত বিচিত্র করে দেখে নেওয়া যায় দেখে নেবেন, কবির যাত্রার বা গতির এই হোল একমাত্র উদ্দেশ্য। এইভাবে রবীন্দ্র-নাথের গতিধর্ম লীলা ও আনন্দবাদের সঙ্গে মিশে যাচ্ছে। যাত্রার লক্ষ্য বা গতির ধর্ম আনন্দময় বিরাট পুরুষকে সর্বপ্রকারে পূর্ণরূপে বিচিত্রভাবে দর্শন করা।

'যাত্রা' রচনায় এই গতিধর্মের কথাই আছে। বিশ্বপ্রকৃতির মধ্যে রয়েছে প্রাণশক্তি। প্রাণের ধর্ম বেগ। সামনে চলাতেই প্রাণশক্তির বিকাশ এবং এই চলা জৈব প্রয়োজনসিদ্ধিমূলক নয়। রূপ থেকে অরূপে অতিক্রমণই রবীন্দ্রনাথের গতিবাদের মূল মর্ম। জীবন থেকে মৃত্যু, মৃত্যু থেকে জীবন, এ হোল দেহের বাসাবদল। এই বাসাবদল ছাড়া জীবন; অরূপের বা রূপের স্বরূপের সন্ধান

পায়না। শত অভ্যাস ও সংস্কারের জড়তায় মানুষের জীবন নিস্পন্দ ও নিশ্চল। এই প্রয়োজনসর্বস্ব 'ছোট আমি'র সীমিত জীবন বস্তুত নিষ্প্রাণ। সৃষ্টিকর্মহীন এই জীবনে আনন্দরূপের উপলব্ধি আসে না। 'ছোট আমি'র গণ্ডি ছাড়িয়ে 'বড় আমি' বা ব্যক্তির প্রয়োজনাতিরিক্ত মহৎ ও বৃহৎ প্রাণের সঙ্গে বিশ্বের অন্তরাত্মার যোগ অনুভব করা, তথা আনন্দময়ের সন্ধান লাভের জন্য মাঝে-মাঝে ঘর ছেড়ে বাইরে বেরিয়ে পড়া দরকার। গতির লক্ষ্য আনন্দ। আর আনন্দ থেকেই হয় সৃষ্টি। সৃষ্টির জন্য চাই আনন্দ আর আনন্দের জন্য চাই গতির অভিকর্ষ, এবং এই গতি হবে অকারণ ও অবারণ। এই তত্ত্বটিই 'যাত্রা' নিবন্ধের ভাবমর্ম।

'আনন্দরূপে' আনন্দের স্বরূপ বলা হয়েছে। আনন্দ বস্তুনির্ভর ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নয়। আনন্দ হোল সৌন্দর্যানুভূতি। বিশ্বপ্রকৃতি মানব মনে নাড়া দিয়ে যে সাড়া জাগায়, তারই নাম সৌন্দর্যানুভূতি। সহজে স্বার্থ ও ইন্দ্রিয়ের প্রয়োজন সিদ্ধির সীমায় আবদ্ধ জড় জীবনে বিশ্বপ্রকৃতির আহ্বান সাড়া তোলে না। কিন্তু একবার যদি তার চেতনা জেগে ওঠে, তাহলে বিশ্বরূপের সৌন্দর্যের অসীমতায় সে বিহ্বল হয়ে যায়। এই সৌন্দর্যে রূপ মুখ্য নয়—রূপকে অতিক্রম করে এক রহস্যময় অরূপের অনুভবই মুখ্য। Keats জেনেছেন রূপের মধ্যেই সৌন্দর্য পরিপূর্ণ এবং তাকেই বলেছেন সত্য। রবীন্দ্রনাথ রূপ ছাড়া রূপাতীত সৌন্দর্যের সন্ধান করেছেন এবং রূপারূপের মিলনে যে সৌন্দর্যোপলব্ধি, তাকেই বলেছেন সৌন্দর্যের সত্য; আর অন্তরে সৌন্দর্যের এই অসীম বিস্তারের অনুভূতিকে বলেছেন আনন্দ-রূপ। রূপের পদ্মে অরূপ মধু পান করে তিনি দুঃখের বক্ষের মাঝে আনন্দের সন্ধান পেয়েছেন।

যা অক্ষয় তাই সত্য। পৃথিবীতে বস্তুর অক্ষয় সত্তা দুর্লভ। এখানে সবই মরণশীল, পচনশীল, পরিবর্তমান। কবি তাই সত্যের সন্ধান করলেন বস্তুর অন্তরালে অন্য কোন গভীর সত্তার কল্পনার মধ্যে—এই কল্পনারই ফল অসীমের বা আনন্দরূপের অনুধ্যান।

আনন্দকে এইভাবে উপলব্ধি করতে পারলে সব কিছুর মধ্যেই সৌন্দর্য প্রতিভাত হয়। পৃথিবীকে রবীন্দ্রনাথ দেখেছেন সুর হিসাবে। মাটি শুধু মাটি নয়, পাতা শুধু পাতা নয়; সবকিছুর মধ্যে আছে সামঞ্জস্য। এই সামঞ্জস্যায়িত প্রকৃতি সেই অসীম সৌন্দর্যের, অতএব সেই আনন্দরূপেরও এক একটি ধারা মাত্র। এই বিশ্ব এক বিরাট বাঁশির সুর, আনন্দের একটি ঐকতান। এই অপরিমেয় আনন্দকে জল বা স্থল বলে জানা মানুষের দুর্ভাগ্য।

আত্মার ধর্মই আনন্দ। বরফের যেমন শৈত্য, অগ্নির যেমন দাহিকাশক্তি, আত্মার শক্তি তেমনি আনন্দ। সৌন্দর্যের বিস্তারে প্রেম, প্রেমের বিস্তারে আনন্দ, আনন্দের বিস্তারে অমৃতের বা অসীমের উপলব্ধি আসে। 'আনন্দরূপ' নিবন্ধটির এই হোল ভাবমর্ম।

বস্তুর অতিরিক্ত কিছুর অস্তিত্ব রবীন্দ্রনাথ বরাবর স্বীকার করতেন। এরই নাম দিয়েছেন মায়া এবং তিনি স্পষ্ট বলেছেন, 'বস্তু হতে সেই মায়া তো সত্যতর'। বস্তু যেখানে নিজের সীমানা ছাড়ান বৃহতের ইসারা দেয়, সেই অসীমাভিসারী সত্যই মায়া। 'যাত্রা' ও 'আনন্দরূপ' রচনাযুগলেরই আর এক রূপ 'মায়াবাদ'। গতির মধ্যে যে সৃষ্টিলীলা, তারই নাম মায়ার খেলা। ক্ষিতিকে মাটি, অপ্—কে জল রূপে না দেখে আনন্দরূপের লীলার অঙ্গরূপে দেখতে হবে! পলে পলে দিন রাত্রির মধ্যে যে অসীমের সঞ্চার, জগতের মাঝে সেই বিচিত্ররূপিনীকে অনুভব করতে হবে। এই বিচিত্ররূপিনী জগতের আনন্দরূপই রবীন্দ্রনাথের নটরাজ। এরই নৃত্যের এক পদক্ষেপে বিচিত্র সৌন্দর্যের ঐশ্বর্য বিশ্বময় ব্যাপ্ত হয়ে থাকে, অন্য চরণক্ষেপে সমস্ত রূপৈশ্বর্য ও বৈচিত্র্য সংহত হয়ে আসে। বিচিত্রের মধ্যে এই সংহত একের উপলব্ধির আর এক নাম রস বা আনন্দ এবং এই রস বা আনন্দই মায়া। আর এ মায়া বিভ্রম নয়; বরঞ্চ মায়া-সৃষ্ট এই সৌন্দর্য, আনন্দ ও রস-জগতের চেয়ে বস্তু-জগতই অ-সত্য। 'মায়াবাদ' রচনাটির গীতধর্মিতা শেষে

বাস্তবিকই কবির আনন্দনিরত মগ্ন চৈতন্যের মধ্যে গীতিকবিতার রূপ নিয়েছে।

'দুই ইচ্ছা' রচনাটির মধ্যেও এই গতিবাদ ও আনন্দবাদের বাণী রয়েছে। মানুষের মধ্যে স্থিতি ও গতির যে দুমুখী চিন্তা, 'দুই ইচ্ছা' রচনাটির তাই হোল ভাবমর্ম। 'সোনার তরী'র 'দুই পাখী' কবিতার ভাবটিই এখানে গদ্যে 'দুই ইচ্ছা' নাম পেয়েছে। জীবনকে ভোগ এবং ত্যাগ করার দুরকম ইচ্ছাই মানুষের মনে প্রবল। ভোগের ইচ্ছাটা কিন্তু মানুষের প্রবৃত্তি বা প্রকৃতি। ত্যাগের ইচ্ছাটা বস্তুত প্রকৃতিকে অতিক্রম করার আকাঙ্ক্ষা। এই অতিক্রম করার ইচ্ছার জন্যেই মানুষকে যত দুঃখ সহ্য করতে হয়। দ্বিতীয় ইচ্ছার পিছনে এই যে দুঃখ, উপনিষদে একেই বলা হয়েছে—'ভূমৈব সুখম্ নাল্পে সুখম্ অস্তি।' এই দুঃখ অভাবসাপেক্ষ বা বাসনাজাত নয়—এই ঔপনিষদিক দুঃখ বস্তুত আনন্দের সঙ্গে অভিন্ন।

সুখ আর আনন্দ এক নয়। সুখ উপকরণ-নির্ভর, আনন্দ একান্তভাবে আত্মিক। সুখের বিপরীত যে দুঃখ, তা য়ুরোপীয় নৈরাশ্যবাদ ও নেতিবাচক। কিন্তু আনন্দের পরিপূরক যে দুঃখ, তা উপনিষদের ভাবধারাপুষ্ট রবীন্দ্রনাথের জীবনবোধের মূলাধার। 'রক্তকরবী'র একটি উক্তি এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়ঃ "কাছের পাওনা নিয়ে বাসনার যে দুঃখ সে দুঃখ পশুর, দূরের পাওনা নিয়ে আকাঙ্ক্ষার যে দুঃখ সে দুঃখ মানুষের।" এই দুঃখ-ই মানুষের গৌরব, তার আনন্দের উৎস। সুখের ইচ্ছা, সীমার ইচ্ছা, স্থিতির ইচ্ছার চেয়ে দুঃখ, গতি, সৃষ্টি বা আনন্দের এই ইচ্ছাই হোল মানবধর্ম।

আলোচ্য রচনাগুলির ভাবমর্মের মধ্যে আনন্দরূপের সাধনার ধর্মটি সর্বত্র স্পষ্ট প্রতীয়মান। দ্বিতীয় শ্রেণীর রচনাগুলিতে রবীন্দ্রনাথের শিল্প-ধর্মের কথা আছে। এর মর্মবাণীও প্রকারান্তরে আনন্দবাদ। শিল্প-সংগীত সম্বন্ধীয় রচনা 'অন্তর বাহির'-এ কবি আর্ট ও সঙ্গীতের মধ্যে অন্তর ও বাহিরের যোগাযোগ নির্ধারণ করতে চেয়েছেন। শিল্পে 'বাহির' বা রূপশৈলী মুখ্য নয়, মুখ্য

হোল শিল্পীর আন্তরিকতা। ধ্যান, কল্পনা ও ভাবনার দ্বারা শিল্পী কোন ভাবসত্যকে মৌলিক ও সুন্দরভাবে রূপদান করেন। শুধু বস্তুতন্ত্র নিয়ে আর্টের পূর্ণতা সম্পাদন করা যায় না।

আর্ট অনুকরণ নয়। বাতাসের বা সমুদ্রের অশ্রান্ত কল্লোলই কবির প্রাণে গান জাগায় না—বাহির বিশ্বে যে কলধ্বনি ওঠে, তাকে শিল্পী অন্তরের মধ্যে গ্রহণ করে মর্মের রসে, রংএ, সুরে মিশিয়ে প্রতিধ্বনিত করেন। ভাবকে আপন করে সকলের করাই সাহিত্য বা ললিত কলা। বাইরে থেকে পাওয়া উপকরণকে অন্তরের মধ্যে সামঞ্জস্য করে নিয়ে প্রকাশ করলে হয় শিল্প। অন্তর ও বাহির, ভাব ও রূপ, বস্তু ও কল্পনার সামঞ্জস্য ও মিলনেই শিল্প সার্থক ও সত্য হয়। বাহিরের রূপ-জগত ও অন্তরের কল্প-জগতে মিলেমিশেই সত্যের পূর্ণতা। উপাদানকে অতিক্রম করাই আর্ট। প্লেটো বলেছেন, আর্ট অনুকরণ; রবীন্দ্রনাথ বলেন, আর্ট অনুভবন। রূপের অনুকরণ হতে পারে; কিন্তু আর্ট তো কেবল রূপ নয়—তাতে অরূপও আছে। অমূর্তের অনুকরণ হয় না। রূপ আর্টের আধার, অরূপ তার আত্মা।

মানুষের জীবনে অভ্যাসের জড়তা একটা আস্তরণ পেতে রাখে। তাই বাহিরকেই আমরা দেখতে পাই, অন্তরে প্রবেশের পথ পাইনে। শিল্পীর কাজ অভ্যাসের জড়তা বিদীর্ণ করে অন্তরকে প্রকাশ করা। গুণী প্রাত্যহিকের তুচ্ছতার মধ্য হতে নূতনত্বের সৃষ্টি করেন।

আর্টের ক্ষেত্রে রূপ ধ্রুব নয়; সে একটা প্রতীকমাত্র। যুগের ও কালের নির্দেশে এই প্রতীকের বা আধারের বদল হয়। আঙ্গিক কখনও ধ্রুব হয় না, আঙ্গিকও রূপক মাত্র।

প্রকৃতির গোপন অন্তঃপুরে গিয়ে সেখানকার রহস্য উদ্‌ঘাটন করে যে কবি গান গাইতে পারেন, তিনিই যথার্থ অন্তর-বাহিরকে এক করেছেন।

গান ও অভিনয় স্বতন্ত্র। অভিনয়ে অনুকরণটাই মুখ্য। গানে অনুকরণ নেই। গান হৃদয়ের সূক্ষ্ম ও সুন্দরতম অভিব্যক্তি। ভালবাসার অনুভূতি কত সুন্দর। অভিনয় বা কথায় প্রকাশ করলে

তা স্থূল শোনায়। অথচ গানে ঐ অনুভূতিই কত মধুর হয়ে ওঠে। এর কারণ, গানে প্রত্যেকটি বাণী শব্দগত স্বাতন্ত্র্য হারিয়ে কেবল একটি সুরের ঐকতান তোলে। সঙ্গীতে এই সামঞ্জস্য ও সংযম থাকে বলেই আর্টের মধ্যে সে সেরা। আর্টের প্রথম সর্ত সংযম। অভিনয়ে সংযম কম বলেই আর্ট হিসাবে তা অন্যসবের চেয়ে নিকৃষ্ট।

আর্টের দ্বিতীয় সর্ত ব্যঞ্জনা। য়ুরোপ বাস্তবের হুবহু নকল করে বস্তুতন্ত্রের দেমাক করে। প্রকৃতির মডেল করাই য়ুরোপীয় আর্টের বৈশিষ্ট্য। ভারত যে বর্তমানে য়ুরোপের নকল করে ধ্যানের বদলে বস্তুতন্ত্রের নামে বাহিরকে অবলম্বন করছে, কবির এতে ঘোর আপত্তি। গ্রীকরা গান্ধার-শিল্প নামে বুদ্ধের যে ভাস্বর্য গড়েছিলেন তাতে বুদ্ধদেবের চেহারার বিকৃতি ঘটেছে। বুদ্ধ তাঁদের হাতে হয়েছেন কৃশকায়; উপবাসী বুদ্ধের চেহারা তাঁরা সোজা বুদ্ধি দিয়ে কৃশ ধরে নিয়েছেন। কিন্তু উপবাস যে বুদ্ধকে কৃশ করতে পারে না, এই ধ্যান-দৃষ্টি তাঁরা পান নি। ভারতীয় শিল্পীর এই ধ্যান বা অন্তর্দৃষ্টি ছিল। তাই তাঁদের ভাস্কর্যে বুদ্ধদেবের চেহারায় কৃশতা নেই, আছে প্রসন্ন সৌম্যভাব। গুণী শিল্পী সুন্দরের মধ্য দিয়ে সত্যকে প্রকাশ করেন। আর ব্যবসায়ী আর্টিস্ট চাক্ষুস দেখাটাকেই আঁকেন। দেখার আগোচরেও যে রূপ আছে তাকে অনুভূতি ও কল্পনা দিয়ে ধরতে পারাই যথার্থ শিল্পীর পরিচয়। বাহির কখনও চরম নয়। ক্রান্তদর্শী না হোলে শিল্পী হওয়া যায় না।

'সংগীত' নিবন্ধটিতে ধ্রুপদী সংগীত সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়েছে। য়ুরোপের সংগীতে মানুষের জীবনই মুখ্য। এর তুলনায় ভারতীয় মার্গ সংগীতে মানব বিমুখীনতা ও জীবন বৈচিত্র্যের অভাবের সমালোচনা এই নিবন্ধটির প্রধান বিষয়। ঊনিশ শতকে ভারতীয় মার্গ সংগীতের অবস্থা সংকটাপন্ন হয়েছিল। কারণ, উচ্চাঙ্গ সংগীতের পৃষ্ঠপোষক বনেদী ধনিকশ্রেণী তখন পতনোন্মুখ। অথচ তৎকালীন রুচিও সংগীতচর্চার অনুকূল ছিল না। রবীন্দ্রনাথ য়ুরোপীয় হাণ্ডেল সংগীতোৎসবে সংগীতের প্রাচুর্য দেখে খুশি হয়েছেন, কিন্তু গানে

প্রাণের ও ভাবের অভাব দেখে ক্ষুণ্ণ হয়েছেন। এই প্রসঙ্গে ভারতীয় সংগীতের সঙ্গে য়ুরোপীয় সংগীতের তুলনা করেছেন। দুইএর স্বভাবে আমূল প্রভেদ। য়ুরোপের লক্ষ্য সুরের বৈচিত্র্য, ভারতের ঝোঁক সুরের ঐক্য। য়ুরোপে ভারতীয় সংগীতের চর্চা শুরু হয়েছে। সেখান থেকে আমাদের তা পুনর্গ্রহণ করতে হবে। তাছাড়া সংগীতকে আমাদের শিক্ষাব্যবস্থার অন্তর্ভূত করতে হবে। এই হোল আলোচ্য রচনাটির সারমর্ম।

'কবি য়েটস্' প্রবন্ধটিও শিল্প-সাহিত্যমূলক। কবিরা দু জাতের, —সাহিত্য জগতের কবি ও বিশ্বজগতের কবি। গান থেকে গান করেন যাঁরা তাঁরা সাহিত্যজগতের কবি। সমালোচনার পারিভাষিক অভিধা দিয়ে বললে প্রথমশ্রেণী হলেন কলাকৈবল্যবাদী; তাঁরা আঙ্গিক ও রূপশৈলীসর্বস্ব অনুশীলনবাদী শিল্পী। আবেগ ও কল্পনা তাঁদের স্বতঃস্ফূর্ত নয়, প্রকৃতির সঙ্গে তাঁদের একাত্মতা নেই। তাঁরা সখের কাব্যবিলাসী।

'অন্তর বাহির' নিবন্ধে সাহিত্যশিল্পের মাত্রা ও উপকরণ বিষয়ে রীতিমত বিচার করা হয়েছে। শিল্পের উপকরণ নিঃসংশয়ে বহির্জগত থেকে গৃহীত হয়; উপকরণ সর্বাংশে বস্তুগত (objective) কিন্তু শিল্প বহির্জগতের কেবল প্রতিধ্বনি বা প্রতিচ্ছবিই (photography) নয়। জাহাজের কেবিনে শুয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ, শুনছিলেন সমুদ্রের কল্লোল, বাজছিল তাঁর মনে একটি সুর। এই সুর কিন্তু ঐ কল্লোলের প্রতিধ্বনি, অনুকরণ বা অভিনয় নয়—ঐ কল্লোল তাঁর অন্তরে প্রবেশ করে যে অনুভূতি উদ্রেক করেছে, এ তারই অনুরণন।

আলোচ্য প্রশ্নটি শিল্পে বাস্তবতাবিষয়ক। 'সাহিত্যের স্বরূপ' গ্রন্থের 'সত্য ও বাস্তব' প্রবন্ধে তিনি যে মতামত দিয়েছেন 'অন্তর বাহিরে'র সঙ্গে তা সম্পূর্ণ সঙ্গত। প্রত্যক্ষ বাস্তবই সত্য নয়। সত্য অন্তরের অনুভূতি মাত্র, বাহিরের বস্তুতে তার অস্তিত্ব খোঁজা বৃথা। বস্তু মাত্রই অনিত্য, খণ্ডিত ও স্থানকালাতিশায়ী। বস্তু থেকে গৃহীত নির্যাসটুকুই তার সত্য, ছোবড়াটা কিছু নয়। অর্থাৎ সামাজিক ও

জাগতিক সত্য এবং শিল্পীর সত্য স্বতন্ত্র। শিল্পীর সৃষ্টি একান্ত তারই অন্তর বা মানস-রচনা, বাহিরটা তার আধার ও উপকরণ—বাহির থেকে নেওয়া মালমসলাগুলিকে শিল্পী হৃদয়-রসে জারিয়ে নেন বলেই তা সুরে ও সৌন্দর্যে অনন্যপূর্ব হয়ে ওঠে।

অন্য দুটি নিবন্ধেও রবীন্দ্রনাথ শিল্প-সংগীত বিচারে প্রায় এই একই কথা বলেছেন। কবি য়েট্‌সকে তিনি বিশ্বজগতের কবি বলতে গিয়ে নতুন যুগের শিল্পীদের প্রতি কটাক্ষপাত করেছেন। শিল্প ও সংগীত সম্বন্ধে 'পথের সঞ্চয়ে'র আরও নানা জায়গায় এখানে সেখানে প্রকীর্ণ মন্তব্য পাওয়া যায়। বস্তুত গ্রন্থখানির আলোচনার অন্যতম প্রধান সূত্রই হোল শিল্প ও সংগীত। কিন্তু এই শিল্প ও সংগীতা-লোচনার মধ্যেও এই গ্রন্থের আসল মূল সুর—এক কেন্দ্রীয় আনন্দময় আত্মার নেপথ্য উপস্থিতি, বিরাটকে বিচিত্ররূপে দুটি চোখ ভরে দেখে নেওয়ার আনন্দ এবং সীমা-অসীমের মিলনানুভূতির চিরন্তন রাবীন্দ্রিক রাগিনী অনুরণিত হয়েছে।

তৃতীয় শ্রেণীর সন্দর্ভ, যেখানে প্রাচ্য ও প্রতীচ্য সমাজ সংস্কৃতির বিভেদের আলোচনান্তে মিলনের আকাঙ্ক্ষা ও আবেদন ব্যক্ত হয়েছে, সেখানেও রয়েছে এই আনন্দময় পুরুষের জ্যোতির্ময় উপস্থিতি এবং তার মধ্যেও সমানে রাবীন্দ্রিক ঐকতান ধ্বনিত হচ্ছে।

'যাত্রার পূর্বপত্র', 'জলস্থল', 'সমুদ্রপাড়ি', 'খেলা ও কাজ', 'ইংলণ্ডের ভাবুক সমাজ,' 'ইংলণ্ডের পল্লীগ্রাম ও পাদ্রি', 'সমাজভেদ', 'লক্ষ্য ও শিক্ষা' প্রভৃতি নিবন্ধে ভারতীয় জীবনবোধের সঙ্গে পাশ্চাত্য জীবন-ধারার তুলনামূলক বিচার আছে। য়ুরোপ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের মনোভাবের তিনটি পর্ব স্পষ্টত লক্ষ্য করা যায়। আদিপর্বে রবীন্দ্রনাথ য়ুরোপকে প্রশংসার চোখে দেখেননি ; ভারতীয়ত্বে তখনও তিনি মুগ্ধ। ভারতীয়ভাবে বিভোর তরুণ রবীন্দ্রনাথের কাছে য়ুরোপ শুধুমাত্র ভোগসর্বস্ব জড়বাদী রূপে প্রতিভাত হয়েছিল। তারপর 'পথের সঞ্চয়ে'র যুগে অর্থাৎ মধ্য বয়সে য়ুরোপের সঙ্গে বিশ্বভ্রমণের দ্বারা তাঁর পরিচয় যখন গভীর হয়েছে তখন তাঁর মনোভাবের আমূল বদল

হোল। য়ুরোপের ভোগবাদ যে জড়বাদ নয়, সে যে বলিষ্ঠ জীবনবাদ তা অনুধাবন করলেন। এই সময় য়ুরোপের প্রতি তিনি বিমুগ্ধ। আদিতে যা মনে হয়েছিল ভোগ-ক্ষুধা, মধ্য বয়সে তাকেই বললেন জীবনের গতিধর্ম। য়ুরোপের প্রাণধর্ম বিরাটকে বিচিত্র রূপে অনুধাবন করছে এবং সৃষ্টিকর্মে আপনার সেই অনুধ্যানের আনন্দকে ব্যক্ত করছে। য়ুরোপের কর্মচঞ্চল সৃষ্টিমুখর প্রাণাবেগে মুগ্ধচিত্ত কবি ভারতের কর্মপ্রয়াসহীন স্থানুত্ব, অভ্যাস ও সংস্কারের জড়তায় এই সময় গভীর বেদনাবোধ করেছেন। এই সময়েই তিনি ভারতবাসীকে সনাতন আর্যামি ও হিন্দুয়ানার স্থানুত্ব ও জড়তা ত্যাগ করে য়ুরোপের কাছে নতুন যুগের জ্ঞানবিজ্ঞান ও সৃষ্টিকর্মের দীক্ষা নিতে আহ্বান জানিয়েছেন। কিন্তু য়ুরোপের প্রতি বিমুগ্ধ-আত্মা রবীন্দ্রনাথের মনোভাবের আবার পরিবর্তন হয়েছিল ১৯৩৯ খ্রীঃ ২য় মহাযুদ্ধের সময় থেকে। 'কালান্তরে'র প্রবন্ধসমূহে য়ুরোপীয় সভ্যতার মহিমার প্রতি তাঁর মধ্যবয়সের শ্রদ্ধা, বিশ্বাস ও সম্ভ্রমবোধের মহতী বিনষ্টি ও মোহভঙ্গের দীপ্ত ঘোষণা সর্বজনবিদিত।

কিন্তু 'পথের সঞ্চয়ে' য়ুরোপের প্রতি রবীন্দ্রনাথের মনোভাব পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে। 'যাত্রার পূর্বপত্রে' য়ুরোপ যাত্রার উদ্দেশ্য ব্যক্ত করতে গিয়ে তিনি 'ভ্রমণ করাই ভ্রমণ করিতে যাইবার উদ্দেশ্য', 'বাহিরে যাইবার ইচ্ছাটাই মানুষের স্বভাবসিদ্ধ', তাই 'কেবলমাত্র বাহির হইয়া পড়াই আমার উদ্দেশ্য', কেননা 'দুটা চক্ষু বিরাটকে যত দিক দিয়া যত বিচিত্র করিয়া দেখিবে ততই সার্থক হইবে', ইত্যাদি অনেক কথা বলে শেষে বলেছেন, 'তীর্থযাত্রার মানস করিয়াই যদি য়ুরোপে যাইতে হয় তবে তাহা নিষ্ফল হইবে না।'

য়ুরোপ ভ্রমণকে এই যে তিনি তীর্থভ্রমণ বলেছেন, এর থেকেই পাশ্চাত্যের প্রতি তাঁর সমকালীন মুগ্ধ মনের পরিচয় স্পষ্ট হয়েছে। এই গ্রন্থে তিনি য়ুরোপের শক্তি ও ধর্মের যে ধারণা ব্যক্ত করেছেন তা অভূতপূর্ব নয়, এমনকি পরবর্তীকালে 'কালান্তরে'র

বহু প্রবন্ধেও অনুরূপ অভিমতই ধ্বনিত হয়েছে। তথাপি মাত্রাগত প্রভেদ লক্ষণীয়। এখানে য়ুরোপকে তিনি ভোগবাদী বলতে চান না। টাইটানিক জাহাজডুবির দিনে য়ুরোপীয় পুরুষগণের আত্মদানের বীরত্ব, ভগিনী নিবেদিতার ভারতের জন্য আত্মোৎসর্গ, প্রভৃতি দৃষ্টান্তে য়ুরোপীয় চরিত্রের যে আত্মত্যাগ ও বীর্যশক্তির পরিচয় আছে, ভারতীয় চরিত্রে কদাচিৎ সে পরিচয় মেলে। য়ুরোপের ধর্ম তাকে দুঃখপ্রদীপ্ত সেবা-পরায়ণ প্রেমের দীক্ষা দিয়েছে। মৃত্যুকে সে পরোয়া করে না; তার চরিত্রে ভীরুতা নেই, জড়তা নেই, তামসিকতা নেই। সে দুঃসাহসী। বিশ্বজোড়া তার অভিযান। বিশ্বপ্রকৃতির রহস্য ও অগম্যতাকে য়ুরোপ চ্যালেঞ্জ জানিয়েছে—মাভৈঃ বলে 'চরৈবেতি' মন্ত্র নিয়ে সে বিশ্বের দিকে দিকে দুঃসাহসিক অভিযানে বেরিয়েছে, জ্ঞান-বিজ্ঞানের নব নব সৃজনীপ্রতিভায় মানবসভ্যতাকে ক্রমাগ্রসরমান করেছে। ভোগবাদী বা জড়বাদী হোলে কি এমন বিরাট সৃষ্টি কখনও সম্ভব হত? য়ুরোপের এই প্রাণধর্ম, এই আত্মশক্তি, একেও আধ্যাত্মিক না বলে উপায় নেই। অপর দিকে ভারতবর্ষ ভুয়ো আধ্যাত্মিকতার শ্লাঘায় আত্মমগ্ন থেকে দাসত্বে ও দীনতায় এমনভাবে তলিয়ে গেছে যে তার জীবনে চেতনার সাড়া পাওয়া যায় না। চৈতন্যগর্বী ভারত তার সনাতনত্বের পাষাণস্তূপে জড় হয়েই রইল। আর জড়বাদী য়ুরোপ নব নব চেতনার উন্মেষ সাধন করে মানব সভ্যতাকে আকাশস্পর্শী করে তুলল।

ভারতবর্ষ দারিদ্র্য নিয়ে গৌরব করে, দারিদ্র্য নাকি তার ভূষণ। নিরাভরণ জীবন ও উচ্চ আধ্যাত্মিক চিন্তাই নাকি তার সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্য। রবীন্দ্রনাথ এই প্রসঙ্গে স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন যে, 'শিবের দারিদ্র্যই ভূষণ, অলক্ষ্মীর দারিদ্র্য কদর্য।' ঐশ্বর্য অধিকার করার শক্তি যার আছে সে যখন দারিদ্র্যকে বরণ করে, সে হয় তার ত্যাগ। ভিখারির দৈন্যে কোন মহিমা নেই। ভারতের দারিদ্র্য ভিখারির, এ নিয়ে আত্মশ্লাঘা হাস্যকর।

য়ুরোপের সঙ্গে ভারতের যে স্বার্থ-সংঘাত রয়েছে, সে-সম্বন্ধে

সচেতন রবীন্দ্রনাথ এই নিবন্ধের এক জায়গায় বলেছেন যে আমাদের পরাধীনতার জন্য আমরা নিজেরাই দায়ী। এই গ্লানি থেকে মুক্ত হতে হোলে বিদ্বেষ নয়, য়ুরোপের ধর্ম ও শিক্ষাকে সাদরে আমাদের আত্মস্থ করতে হবে। পাশ্চাত্যের কাছ থেকে শ্রদ্ধাভরে জ্ঞানবিজ্ঞান, আত্মত্যাগ, দুঃসাহস, অভিযান, কর্মোদ্দীপনা, শ্রমশীলতা, কারিগরী. কুশলতা, মৃত্যুকে গ্রহণ করার বেপরোয়া তারুণ্য এবং আত্মশক্তির শিক্ষা ভারতবাসীকে পেতে হবে—তাহলে স্বতঃই সে স্বরাজ পাবে এবং এই পদ্ধতির মধ্য দিয়ে প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের যে মিলনসূত্র রচিত হবে, তার দ্বারাই মানব-সভ্যতার পূর্ণতা অর্থাৎ বিশ্বমানবতার পরম লক্ষ্য—মানবধর্ম পরিপূর্ণ হয়ে উঠবে।

'যাত্রার পূর্বপত্রে' এই যে অভিমত কবি ব্যক্ত করেছেন, তুলনা-মূলক অন্যক'টি নিবন্ধে এই ভাবটিই অন্যতর রূপে বা রূপকে ব্যক্ত হয়েছে। যেমন 'জলস্থল' রচনাটিতে য়ুরোপকে 'জল' এবং ভারতবর্ষকে 'স্থল' রূপক দেওয়া হয়েছে। 'পৃথিবীর দুইটা ভাগ—একটা আশ্রয়, একটা অনাশ্রয়; একটা স্থির, একটা চঞ্চল; একটা শান্ত, একটা ভীষণ।' ভারতবর্ষ জীবনের আশ্রয়, স্থির ও শান্ত দিকের ছবি। য়ুরোপ জীবনের আর একদিক, অনাশ্রয়, চঞ্চল, ভীষণ। য়ুরোপের জীবন সামুদ্রিক। সামুদ্রিক চেতনায় য়ুরোপের চরিত্র উদ্বুদ্ধ। ভারতের জাতীয় জীবনে এই চেতনার অভাব। য়ুরোপ বিশ্রাম জানেনা, সমুদ্রের মতোই সে উচ্ছল, বিস্তৃত, গভীর, অবিরাম বেগবান। কিছুতে তার সন্তোষ নেই। "আরো চাই," "যাহা পাই তাহাই যথেষ্ট নয়," এই ধরণের বিক্ষোভচেতনায় সে অস্থির, উদ্বেল, ধাবমান। আর ভারতের জীবনযাত্রা শান্ত, ধীর, স্থাবর। অসন্তোষ নেই, বিক্ষোভ নেই, উদ্দীপনা নেই। 'উত্তিষ্ঠতঃ জাগ্রতঃ' যদিও ভারতের বাণী, তবু তার আপন জীবন অচলায়তনে বদ্ধ। 'চরৈবেতি' ভারতেরই মন্ত্র; অথচ সে মন্ত্র ভারতবাসী কেবল মুখে আওড়ায়। আর য়ুরোপ তারই বাণী নিয়ে অজস্র সৃষ্টির চরিতার্থতায় ছুটে চলেছে।

এই স্থাবরত্ব ভাঙতে হবে। কিন্তু ভাঙলেই হবে না। শুধু

ব্যাপ্তি ও গতি রবীন্দ্রনাথের কাম্য নয়। ব্যাপ্তি ও গতির লক্ষ্য চাই ; সমাপ্তির মধ্যে ব্যাপ্তির বিলয়ই তাঁর আদর্শ। ভারতবর্ষ সমাপ্তি নিয়ে বসে আছে, য়ুরোপ ধেয়ে চলেছে ব্যাপ্তি নিয়ে। য়ুরোপ যদি ভারতে এসে মিলিত হয়, তবেই মানব জাতির সমূহ কল্যাণ। য়ুরোপ জীবনের গতিটাকেই জানে সত্য—গতির পরিণতির কথা ভাবেনা। ভারত আবার পরিণতিটাকেই জানে ধ্রুব ; গতিহীন পরিণতি যে জড়তামাত্র, এ বোধ তার নেই। ভারত ও য়ুরোপ, উভয়ের জীবন-বোধই অসম্পূর্ণ—দুইয়ের মিলনেই সম্পূর্ণতা, যেমন জল ও স্থলের মিলনেই বিশ্বের জীবন।

য়ুরোপ ও ভারত কেউই যে স্বয়ং সম্পূর্ণ নয়, উভয়ের জীবন-বোধই যে খণ্ডিত, 'সমুদ্রপাড়ি' নিবন্ধে আরেকবার সে কথাই বলা হয়েছে। অত্যাকাঙ্ক্ষা যেমন অসুস্থতা, নিরাকাঙ্ক্ষাও তেমন সুস্থ মনোবৃত্তির পরিচায়ক হতে পারে না। য়ুরোপ লোভের অত্যাকাঙ্ক্ষায় জ্বলে মরছে। তার অন্তর্দাহ তীব্র। এই অন্তর্দাহেই তার ট্রাজেডি। আবার ভারতের নিরাসক্ত ও নিরাকাঙ্ক্ষার ভাবও প্রশংসনীয় নয়। এই বৈরাগ্য তাকে জীবনবিমুখ, অবসন্ন, অপদার্থ ও অকর্মন্য করে রেখেছে। এই পলে পলে মৃত্যুর মধ্যে ট্রাজেডির গৌরবটুকুও নেই। য়ুরোপের বিলাসী ভোগবাদ আর ভারতের নিরাসক্ত নির্বেদবাদের মিলনে একটি মধ্যপন্থার সৃজন যদি হয়, সেটিই হবে মানবজাতির পক্ষে শ্রেষ্ঠ জীবন। য়ুরোপের ভোগবাদ দেহের আরাম আর ভারতের বৈরাগ্যবাদ আত্মার আনন্দ। কিন্তু আত্মাহীন দেহ-সর্বস্বতা যদি যান্ত্রিক ফিলিস্টাইনী শয়তানী হয়, তাহলে দেহহীন আত্মা-সর্বস্বতা প্রেতের উৎপাত মাত্র। দুটোই সর্বনাশা। তাই য়ুরোপের দেহে ভারতের আত্মার প্রতিষ্ঠা হোলে যে পূর্ণ মহাজীবনের সৃষ্টি হবে, তারই প্রকাশ-রূপ মানবধর্মে মানব সভ্যতার পরম-কল্যাণ নিহিত।

রবীন্দ্রনাথের মানবধর্ম তথা প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য জীবনবোধের সমন্বয়ে বিশ্বমানবতাবোধের উজ্জীবন 'পথের সঞ্চয়ে'র সকল রচনার

কেন্দ্রীয় মর্মবাণী। রবীন্দ্রনাথ ছিলেন আমৃত্যু আশাবাদী ও আনন্দবাদী। মানব-সভ্যতার চরম সংকটেও তিনি মানুষের প্রতি বিশ্বাস হারানোকে পাপ মনে করেছেন। সব মানুষের মধ্যে অপরের সঙ্গে মিলিত হওয়ার এবং ঐক্যবোধ করার আকাঙ্ক্ষা আছে, এই ঐক্যবোধেরই নাম তিনি দিয়েছেন মানবধর্ম বা মনুষ্যত্ব। অমৃতের পুত্ররূপে মানুষের মহিমায় তাঁর প্রত্যয় আজীবন ঔপনিষদিক আদর্শবাদ-পুষ্ট হয়ে এমন আন্তরিক ও গভীর হয়েছিল যে বাইরের হাজার আঘাতেও তার ব্যত্যয় হয়নি। মানবতার প্রতি এই আশ্চর্য অক্রোধভাবের জন্য তাঁর চিত্ত সব সময় এমন এক মৈত্রীভাবে পরিপ্লুত থাকত যে তার সঙ্গে একমাত্র বুদ্ধদেবেরই তুলনা চলতে পারে। এই মৈত্রী ও করুণাভাবের জন্য স্বতঃই তাঁর চিত্ত আনন্দানুভূতির দ্বারা পরিষিক্ত থাকত। 'গীতাঞ্জলি' যুগে রচিত ভ্রমণ-সাহিত্য 'পথের সঞ্চয়ে'র মর্মবাণী কবির সর্বাত্মক বিশ্ববোধ। কবি বিশ্বভ্রমণে বেরিয়ে হৃদয়ভরে মৈত্রী সঞ্চয় করে এনেছেন: তাঁর যাত্রার উদ্দেশ্য সার্থক হয়েছে। বিশ্বসৌভ্রাত্রবোধ ও মৈত্রীভাব এই যাত্রায় তাঁর পথের সঞ্চয়। এই সঞ্চয়েই তাঁর আনন্দ, এই তাঁর অমৃতভোগ। ১৯১২ খ্রীঃ এর এই 'তীর্থভ্রমণ' রবীন্দ্র-কবিজীবনে অবিস্মরণীয়। এর আগে ও পরে আরও বহুবার তিনি বিশ্বভ্রমণে বেরিয়েছেন, কিন্তু 'পথের সঞ্চয়ে' তিনি যে আনন্দ সঞ্চয় করেছিলেন, অবশিষ্ট জীবন সেই অমৃতাস্বাদনেই কেটে গেছে। 'পথের সঞ্চয়' রবীন্দ্রনাথের শ্রেষ্ঠ সঞ্চয়। এই ভ্রমণ-সাহিত্যখানির নাম তাই সার্থক।

স্মৃতিসাহিত্য : জীবনস্মৃতি

'জীবনস্মৃতি' চরিতকথা অথবা আত্মজীবনী নয়। সন-তারিখের সালতামামিশুদ্ধ ধারাবাহিক জীবনবৃত্তান্তকে বলা যায় আত্মজীবনী। আর জীবনবৃত্তান্তের বাছাইকরা কয়েকটি অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে নিজের জীবনের বিশেষ অর্থ, তাৎপর্য ও উদ্দেশ্য উপলব্ধিকে বলা যেতে পারে আত্মপরিচয় বা আত্মচরিত। উত্তম আত্মজীবনীতে জীবনবৃত্তান্ত এবং জীবনোপলব্ধি—জীবনের ধারাবাহিক ঘটনাপুঞ্জ ও অভিজ্ঞতা এবং জগৎ ও জীবনের সঙ্গে আপনার অন্বয় সম্বন্ধে অনুভব ও উপলব্ধির সমন্বয় ঘটে। কোন-কোন আত্মজীবনীতে লেখকের ব্যক্তিত্ববিকাশের ধারাবাহিকতাই প্রাধান্য পায় এবং প্রসঙ্গত যুগধর্ম এবং যুগন্ধরগণের ইতিবৃত্তও বিস্তৃত স্থান লাভ করে।

'জীবনস্মৃতি' উপরের সংজ্ঞানুযায়ী জীবনী বা চরিতসাহিত্য নয়। রবীন্দ্রনাথের জীবনের ঘটনাপুঞ্জের বৃত্তান্ত এতে যেমন নেই, তাঁর জীবনোপলব্ধির তত্ত্ব-ভাবও তেমনি অনুপস্থিত। অভিজ্ঞতা বা আত্মোপলব্ধি—কোনটাই 'জীবনস্মৃতি'র বিষয় নয়। সমগ্র রচনার মধ্যে একবারও একটি সন-তারিখের উল্লেখ নেই এবং বিলাতের একটি অভিজ্ঞতার গল্প ছাড়া জীবনের অন্য কোন ঘটনার বর্ণনা 'জীবনস্মৃতির' মধ্যে নেই।

রবীন্দ্রনাথের আত্মোপলব্ধি বা তাঁর আধ্যাত্মিক দর্শনের অভিব্যক্তি আছে 'আত্মপরিচয়' এবং 'শান্তিনিকেতন' গ্রন্থে। 'আত্মপরিচয়' দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'আত্মচরিতে'র অনুরূপ। মহর্ষির 'আত্মচরিত' বাংলা ভাষায় ঐ জাতীয় প্রথম গ্রন্থ। কিন্তু মহর্ষির ঔপনিষদিক আত্মার ধর্ম ও সাধকজীবনের পরিচয় যেমন পরিব্রাজক জীবনের বাস্তব অভিজ্ঞতার মাধ্যমে আলোচিত হয়েছে, রবীন্দ্রনাথের 'আত্ম-পরিচয়' ও 'শান্তিনিকেতনে' তেমন পার্থিব অভিজ্ঞতার কাহিনী

নেই, রয়েছে নিছক অতিজাগতিক উপলব্ধির দার্শনিক ও তত্ত্বগত আলোচনা।

'জীবনস্মৃতি'র সাহিত্যমূল্য এর অসাধারণ সুখপাঠ্যতায়। রবীন্দ্রনাথের গদ্যরচনাসমূহের মধ্যে 'জীবনস্মৃতি'র গদ্যশৈলী সর্বাধিক প্রাঞ্জল, প্রসন্ন ও অমায়িক। রবীন্দ্রনাথের অধিকাংশ রচনাই কমবেশি ভাবুকতা অথবা তাত্ত্বিকতায় ভারাক্রান্ত। তত্ত্ব ও ভাবুকতা স্বভাবত রূপক ও প্রতীক আশ্রয় করে। এ জন্য রবীন্দ্রনাথের গদ্যের সামান্যতম লক্ষণ অলংকারবাহুল্য; পদে পদে উপমা, উৎপ্রেক্ষা, সমাসোক্তির ছড়াছড়ি। 'জীবনস্মৃতি' ও 'ছেলেবেলা'য় এমন এক নূতন গদ্যরীতি অনুসৃত হয়েছে, যার প্রধান গুণই হোল সরলতা, অমায়িকতা এবং তত্ত্ব-ভারহীনতা। রবীন্দ্রনাথের সবচেয়ে লঘু রচনাও যেখানে যাহোক-কিছু-একটা তাৎপর্য ইঙ্গিত করতে চায়, সেখানে 'জীবনস্মৃতি'ই সম্ভবত একমাত্র গদ্য রচনা যার কোন বাচ্যাতিরিক্ত তাৎপর্য নেই। 'জীবনস্মৃতি'র এ কোন অগৌরব নয়, বরঞ্চ এতেই তার অনন্যতা।

'জীবনস্মৃতি'র এই অনন্যপূর্ব গদ্যরীতির মূলে রয়েছে সমকালীন কবিমানস। ১৯১২ খ্রীঃ-এ রচিত 'জীবনস্মৃতি' 'গীতাঞ্জলি' পর্বের রচনা। 'গীতাঞ্জলি'র কবিতাগুলির রচনারীতিই 'জীবনস্মৃতি'-র গদ্যেও অনুসৃত হয়েছে। এই যুগে কবি-মানসে যে নির্বেদভাব, বিশ্বদেবতার উদ্দেশ্যে জীবনদেবতার বৈষ্ণবোচিত যে অপ্রমও আত্মনিবেদ নর ভাব, তারই ফল 'গীতাঞ্জলি' এবং 'জীবনস্মৃতি'র নিরলঙ্কার, নিরভিমান, নিরাভরণ রচনাশৈলী।

'জীবনস্মৃতি'র ভাষা কারুকর্মহীন হয়েও সুচারু। এর গদ্যরীতি কোন একটি বাগ্‌ভঙ্গিমা বা বিশেষ ঢঙএর গদ্য নয়। এতে চলিত কথ্য ঢঙ যেমন নেই, সাধুরীতির কৃত্রিম বৈভবও তেমনি নেই। চলিতরীতির 'বীরবলী' কসরৎ বা মারপ্যাঁচ অথবা 'হুতোমী' গ্রাম্যতা রবীন্দ্রনাথের গদ্যভাষায় কোনদিনই দেখা যায় নি। বরঞ্চ 'বঙ্কিমী' আর 'বিদ্যাসাগরী' সাধুরীতির প্রভাব রবীন্দ্র-গদ্যভাষায় অনেক বেশি। এক কথায়, রবীন্দ্রনাথের গদ্য স্বভাবত সালঙ্করা এবং অভিজাত্য। কিন্তু

'জীবনস্মৃতি'র গদ্য নিরলঙ্কার, যেমন একমাত্র 'গীতাঞ্জলি'র কবি-ভাষা নিরাভরণা।

'জীবনস্মৃতি'র গদ্য সাধারণ সাধু কথ্যরীতির। শব্দচয়ন তৎসম; কিন্তু প্রায় প্রত্যেকটি শব্দ ও পদই এত সুপ্রচলিত যে ওগুলি কথ্য ভাষারই অন্তর্ভুক্ত মনে হয়। বাক্যগুলির বেশিরভাগই সরল বা যৌগিক,—জটিল বাক্য নেই। যৌগিক বাক্যগুলিতেও যৌগিকতা কম। যতিগুলি এত সুপরিমিত যে যৌগিক বাক্যগুলির পর্বে বা পদে-পদে মাত্রা-সম্মিতির আভাস আছে। পদগুলি-ই সরল বাক্যের মতো পূর্ণ অর্থ প্রকাশ করছে। 'জীবনস্মৃতি'র গদ্যরীতির ব্যাকরণে যতি-সম্মিতি অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

এই গদ্যরীতির আরেকটি গুণ প্রসন্নতা। এ কিন্তু কৌতুকহাস্য বা বাগ্‌বৈদগ্ধ্য নয়। এ-দুটির একটিও 'জীবনস্মৃতি'তে নেই। এখানে যে সহজ রস রয়েছে, তার নাম স্নিগ্ধ প্রসন্নতা ছাড়া অন্য কিছু দেওয়া যায় না। বাগ্‌বৈদগ্ধ্য একটি আর্ট। প্রসন্নতা আর্ট নয়, চরিত্র। এর জন্য প্রয়াস নিষ্প্রয়োজন। মনের নির্বেদ, সৌম্য ও প্রশান্ত আনন্দভাবের যে স্নিগ্ধতা রচনায় স্বতঃই ছড়িয়ে-জড়িয়ে থাকে, তাকেই বলি প্রসন্ন রস। কোন বিশেষ শৈলীর (style) দ্বারাই রচনায় এই গুণ লভ্য নয়। 'রচনাশৈলী'তে রচয়িতার স্বাতন্ত্র্যচেতনার প্রাখর্য যে ব্যক্তিত্ব-চিহ্ন রাখতে চায়, প্রসন্নরসের তা প্রতিকূল। নিরভিমান ও নির্বেদভাব ছাড়া রচনায় এ গুণ দুর্লভ। 'গীতাঞ্জলি'-পর্বের 'জীবনস্মৃতি'তে রবীন্দ্রনাথ বিশেষ কোন একটি 'রচনাশৈলী' অনুসরণ করতে যান নি বলেই তা সবিশেষ একটি অনন্যপূর্বাপর শৈলী হয়ে উঠেছে। রবীন্দ্রমানস ছাড়া এমন নিরভিমান সহজ সুন্দর গদ্য আর কেই-বা সৃষ্টি করতে পারবে?

বাগ্‌সংযম 'জীবনস্মৃতি'র গদ্যশৈলীর অন্যতম লক্ষণ। এও 'গীতাঞ্জলি'-পর্বের কবিমানসের ফল। 'সোনার তরী-চিত্রা' পর্বের আবেগোচ্ছ্বাস 'খেয়া-গীতাঞ্জলি'র যুগে আত্মসমাহিত হয়েছিল। আত্মসমাহিতির দরুণ এই সময়ে কবির যে মৌনভাব ও মিতভাষিতা

'জীবনস্মৃতি'র গদ্যেও তা পরিস্ফুট। সাধারণত রবীন্দ্রনাথ কথা লেখায় অক্লান্ত। কিন্তু অজস্র কথার আবেগ এখানে স্তিমিত। ধীর, স্থির, অনুচ্চ, অনুদ্বিগ্ন ও অনুচ্ছ্বসিত গদ্য-ভাষায় কবি কিছু আপনকথা বলেছেন 'জীবনস্মৃতি'তে।

এবং যা বলেছেন তা কবির রচনাকালীন মনোভাব ও জীবন-কথা তো নয়ই, এমন কি নিকট অতীতের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার কথাও নয়। তিনি এখানে একযুগেরও আগের দূরাবগাহী স্মৃতিচিত্র সঞ্চয়ন করতে চেয়েছেন।

সাহিত্যের উপকরণের মধ্যে স্মৃতির স্থান প্রথম। স্মৃতি কিন্তু সংকর; বিস্মৃতির দ্বারা সে অনেকখানি বিশুদ্ধ। স্মৃতি ও বিস্মৃতির মিশ্রণেই সাহিত্যের উপকরণ! 'জীবনস্মৃতি' যে সাহিত্যমূল্য লাভ করেছে তার কারণ এর বিষয়োপকরণ প্রত্যক্ষতা ও বস্তুতন্ত্র অতিক্রম করে রচয়িতার দূরাগত কতগুলি স্মৃতি-বিস্মৃতি জড়ানো চিত্রকথাকে আশ্রয় করেছে। এই স্মৃতিচিত্রগুলির মধ্যে রচয়িতার কল্পনার ভাগ অনেকখানি। অভিজ্ঞতা ও ঘটনাকে ব্যক্তিগত উপলক্ষ্য এবং তাৎক্ষণিকতা ও প্রত্যক্ষতামুক্ত, সাধারনীকৃত ও তাৎপর্যপূর্ণ করে প্রকাশ করা সাহিত্যের ধর্ম এবং 'জীবনস্মৃতি'তে রবীন্দ্রনাথ তাঁর শৈশব ও প্রথম যৌবনের প্রধান অভিজ্ঞতাগুলিকে ব্যক্তিগত উপলক্ষ্য অতিক্রম করে দূরাগত স্মৃতিচিত্ররূপেই রচনা করেছেন। তবে কালের ব্যবধান থেকে কল্পনার দূরবীক্ষণ দিয়ে দেখা এই চিত্রগুলির মধ্যে মায়াভরা সৌন্দর্য রয়েছে বটে, কিন্তু ঠিক রোমান্টিক মুগ্ধতা নেই, কোন অতিরিক্ত বর্ণারোপও নেই।

'জীবনস্মৃতি'র মধ্যে চুয়াল্লিশটি স্মৃতিচিত্র রয়েছে। এর মধ্যে দশটি দশজন ব্যক্তির স্মৃতিচিত্র। লক্ষণীয় যে কবি এখানে নিজের চেয়ে অন্যের কথাই বেশি বলেছেন। রবীন্দ্রনাথের 'কবিজীবন' বা স্ব-ভাষায় তাঁর 'জীবনদেবতা' তথা 'বড় আমি'র ক্রমবিকাশ এবং তাঁর সৃষ্টি-প্রক্রিয়ায় 'জীবনস্মৃতি'র কোন তাৎপর্য বা উপকরণগত মূল্য যদি থেকে থাকে, তবে তা এই একটি ক্ষেত্রে যে এর থেকে

মানুষ ও প্রকৃতির মধ্যে কে কতখানি তাঁর মানসজীবন গড়ে তুলেছে, তার হদিস পাওয়া যাচ্ছে। কবি এ-সম্পর্কে স্পষ্টত একটি সংক্ষিপ্ত জবানবন্দী দিয়েছেন। 'জীবনস্মৃতি' থেকে কবির কৈশোর ও প্রথম যৌবনকালীন বাংলার সাংস্কৃতিক সমাজচিত্রটি যেমন পাওয়া যায় তেমনি ঠাকুরবাড়ির যে আশ্চর্য সাংস্কৃতিক কলারুচির প্রতিবেশ ও আবহাওয়ায় রবীন্দ্রমানস পরিপুষ্ট হয়েছিল, তার স্বচ্ছ একটি ছবিও মিলছে। 'বাড়ীর আবহাওয়া' পরিচ্ছেদে এই ছবিটি ফুটেছে। ঠাকুরবাড়ী ছিল সে সময়ের সর্বপ্রকার রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক আন্দোলনের গঙ্গোত্রী। বিহারীলাল, বঙ্কিমচন্দ্র ও অন্যান্য সমকালীন সাহিত্যিকগণের সঙ্গ, স্নেহ ও সাহচর্য কবি অল্প বয়সেই পেয়েছিলেন এবং এই সাহিত্যসঙ্গ তাঁর তরুণ কবিমনকে কিভাবে নাড়া দিয়েছিল তার স্মৃতি রয়েছে 'জীবনস্মৃতি'তে। সাহিত্যিকগণের স্নেহ-সঙ্গ ছাড়া প্রিয়নাথ সেন, লোকেন পালিত, অক্ষয় চৌধুরী, রাজনারায়ণ বসু প্রমুখ মনীষীর সঙ্গও তাঁর কবিজীবন সংগঠনে কিভাবে সহায়তা করেছে, কবি তার স্মৃতি সশ্রদ্ধভাবে উল্লেখ করেছেন। পারিবারিক স্মৃতি বেশি নেই ; কিন্তু জ্যোতিরিন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্রনাথ এবং পিতৃদেব দেবেন্দ্রনাথের স্মৃতি রবীন্দ্রনাথের জীবনে যে কতবড় প্রভাব বিস্তার করেছিল, তা এই গ্রন্থ থেকে অবহিত হওয়া যায়। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের প্রসঙ্গ অবশ্য 'ছেলেবেলা'য় যত স্থান জুড়েছে 'জীবনস্মৃতি'তে ততখানি ঠাঁই নেয় নি। পিতৃদেবের প্রসঙ্গই জীবনস্মৃতির উজ্জ্বলতম একক স্মৃতিচিত্র।

উপনিষদ আর নিসর্গ ব্যতীত মানুষের মধ্যে মহর্ষির প্রভাবই রবীন্দ্রজীবন গঠনে সবচেয়ে প্রধান শক্তির কাজ করেছে। 'জীবন-স্মৃতি' রবীন্দ্রজীবন-সংগঠনের এই আদ্যশক্তির সৌন্দর্যটি অনবদ্যরূপেই অঙ্কিত করেছে। রবীন্দ্রজীবনে জননীর প্রভাব বাহ্যত শূন্য। 'জীবন-স্মৃতি'র কোথাও বিশেষ মাতৃস্মৃতি নেই। পিতৃপ্রভাবই তাঁকে আচ্ছন্ন করেছিল। মাতৃসঙ্গের চেয়ে পিতৃসঙ্গ তিনি বেশি পেয়েছিলেন। পিতৃদেবই তাঁকে গৃহের বন্দী জীবন থেকে বৃহৎ বিশ্বপ্রকৃতির কোলে

তুলে নিয়ে আসেন। পিতার সঙ্গে উত্তর ভারত ও হিমালয় ভ্রমণের অভিজ্ঞতা রবীন্দ্রনাথের অন্যতম স্মরণীয় স্মৃতি। এই বহির্ভ্রমণের পথেই তিনি বোলপুরে কয়েকদিন যাপন করেন। বোলপুরের স্মৃতিও তাঁর জীবনের একটি স্থায়ী বিভাব। পিতার সাধনপীঠকেই তিনি তাঁর কর্ম ও মর্মজীবনের স্থায়ী তপোবন ও ব্রহ্মচর্যাশ্রমে পরিণত করেন। শান্তিনিকেতন গঠনের প্রেরণা তিনি পিতার কাছ থেকেই পান। তাঁর ধর্ম, কর্ম ও মর্মজীবনের আদি উৎস উপনিষদের দীক্ষা তিনি পিতার কাছেই পেয়েছিলেন। বিশ্বপ্রকৃতির প্রতি ঐকান্তিক আত্মীয়তা-বোধটিও পিতার অন্তর থেকেই তাঁর মধ্যে প্রবিষ্ট হয়েছিল। জ্যোতিষ্কলোক এবং আকাশের প্রতি তাকিয়ে তাঁর যে চিরকালের আগ্রহ, আনন্দ ও জিজ্ঞাসা, তার মূলেও রয়েছে মহর্ষির প্রভাব। হিমাচলে পর্বতবাসের জীবনে প্রতি গোধূলি ও ঊষাকালে পিতার কাছে তিনি যে জ্যোতিষ্ক-পরিচয় লাভ করতেন, তার স্মৃতি 'জীবনস্মৃতি'র একটি উজ্জ্বল অধ্যায় রচনা করেছে। গায়ত্রী মন্ত্রপাঠ এবং কবির মনে তার আধ্যাত্মিক প্রভাবের স্মৃতিও এই প্রসঙ্গে কবি উল্লেখ করেছেন।

দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের মহর্ষিরূপ ব্যতীত সাংসারিক একটি পরিচয়ও নিশ্চয় ছিল। দেবেন্দ্রনাথের 'আত্মচরিতে' যেমন তাঁর সাধক জীবনের পরিচয় ছাড়া অন্য পরিচয় অনুক্ত, তেমনি রবীন্দ্রনাথের পিতৃস্মৃতিতেও তাঁর মহনীয় আধ্যাত্মিক, সৌন্দর্যমুগ্ধ, ভাবুক ও পরিব্রাজক সাধক রূপেরই একমাত্র চিত্র—পিতার বৈষয়িক ও গৃহী পরিচয়ের কোন উল্লেখই নেই। এখানেও রবীন্দ্রনাথ নির্মম-ভাবে নীরব।

পিতার প্রভাবের পরেই তাঁর উপর সর্বাধিক প্রভাব বিশ্বপ্রকৃতির। 'জীবনস্মৃতি'-তে পিতৃস্মৃতির মতোই প্রকৃতির সঙ্গে পরিচয় ও প্রণয়ের স্মৃতিচিত্রগুলি উজ্জ্বলভাবে অঙ্কিত হয়েছে। এই পরিচয়ের ধারাটি সামগ্রিকভাবে কবির রচনার তাৎপর্য অনুধাবনের সহায় হতে পারে।

শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ বিশী যথার্থই বলেছেন, 'রবীন্দ্রনাথের জীবনে

ও কাব্যে সবচেয়ে বড় প্রভাব বিশ্বপ্রকৃতির।' ৺অজিত চক্রবর্ত্তী এই কথাটিই আরো সুন্দর করে বলেছেন, 'প্রকৃতির সঙ্গে যোগের এই ভাবটিকে রবীন্দ্রনাথ উত্তরকালে বিশ্ববোধ নাম দিয়াছেন।'

রবীন্দ্র রচনার সকল বৈচিত্র্য ও সীমারূপের যে-আনন্দবোধে মিলন ঘটেছে, সেই সর্বানুভূতির আধার কবির প্রকৃতিচৈতন্য। 'সমস্ত জলস্থল আকাশকে, সমস্ত মনুষ্যসমাজকে, আপনার চৈতন্যে অখণ্ড-পরিপূর্ণ করিয়া অনুভব করিবার নামই সর্বানুভূতি।' 'এই সর্বানুভূতিই কবির জীবনের ও কাব্যের মূল সুর।'

রবীন্দ্রনাথের কবি ও ব্যক্তি জীবনের সর্বাতিশায়ী নিয়ন্ত্রক এই নিসর্গলোকের সঙ্গে আপন হৃদয়ের অনবচ্ছিন্ন যোগ-সত্যটির এষণাই রবীন্দ্রনাথের আধ্যাত্মিকতা এবং এই আত্মোপলব্ধির প্রাথমিক স্তর 'জীবনস্মৃতি'র মধ্যে পাওয়া যায়। প্রমথবাবুর এ উক্তি অত্যন্ত সত্য যে, 'রবীন্দ্রনাথের বাল্যজীবনের সকলের চেয়ে বড় স্মৃতির বিষয় বিশ্বপ্রকৃতির সহিত তাঁহার যে একটি নিকট আত্মীয়তার যোগ ছিল, তাহারই আনন্দ।' অবশ্য এর সঙ্গে পিতৃদেব এবং বৌদিদি কাদম্বরী দেবীর সান্নিধ্যলাভের আনন্দ-স্মৃতিও সমমূল্য ও সমগরিমা লাভ করবে। এবং শুধু তাই নয়, বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গে যোগের আনন্দ ৺দেবেন্দ্রনাথ ও ৺কাদম্বরী দেবীর সঙ্গে যোগের আনন্দের চেয়ে অধিক ছিল না, একথাটাও লেখক বলতে পারতেন।

'জীবনস্মৃতি', 'ছেলেবেলা' ও 'ছিন্নপত্র', আত্মস্মৃতিমূলক প্রত্যেকটি গ্রন্থেরই সারমর্ম এক,—প্রকৃতির সঙ্গে কবির আবাল্য অনুরাগের পর্বে-পর্বে বিকাশ এবং পরিণয়। এ যেন এক জাতিস্মরের প্রণয়-পরিণয়-গাথা।

'জীবনস্মৃতি'তে 'ছিন্নপত্রে'র মতো মানুষ নগণ্য ও অনুপস্থিত নয়। রামমোহন রায়, দেবেন্দ্রনাথ, কাদম্বরী দেবী, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্রনাথ, শ্রীকণ্ঠবাবু, অক্ষয় চৌধুরী, রাজনারায়ণ বসু, লোকেন পালিত, প্রিয়বাবু, বিহারীলাল, বঙ্কিমচন্দ্র, আশুতোষ চৌধুরী প্রভৃতি সুধীজন ও গুনীগণের সশ্রদ্ধ স্মৃতিচিত্রনের পাশাপাশি শ্যাম প্রভৃতি

ভৃত্য, কৈলাস প্রভৃতি কর্মচারী, গৃহশিক্ষকগণ প্রভৃতি বহু সাধারণেরও সকৌতুক সরস উল্লেখ আছে। বিলাত প্রবাসের জীবনে ডাঃ স্কট পরিবার এবং জনৈকা সিবিলিয়নের বিধবা পত্নীর স্মৃতিকথা বিস্তৃত-ভাবে বলা হয়েছে। বস্তুত 'জীবনস্মৃতি'তে রবীন্দ্রনাথ নিজের বাল্য, কৈশোর ও যৌবনে যে-যে ব্যক্তি কোন-না-কোনভাবে চিহ্ন রেখে গেছেন, তাদের সকলেরই স্মৃতি গেঁথেছেন। ফলে মানুষ এখানে মোটেই নগণ্য নয়। কিন্তু তথাপি চারিটি পরিচ্ছেদে প্রকৃতির সঙ্গলাভের স্মৃতিপ্রসঙ্গে জীবন-সান্নিধ্যের চেয়ে নিসর্গ-সঙ্গ যে তাঁকে বেশি আশ্বস্ত করেছে ও আনন্দ দিয়েছে, তা ধরা পড়ে।

'জীবনস্মৃতি'র 'ঘর ও বাহির' অধ্যায়ে কবির সঙ্গে প্রকৃতির প্রথম পরিচয়ের স্মৃতি চিত্রিত হয়েছে। 'শ্যাম-ব্রজেশ্বরের' ভৃত্য-রাজকতন্ত্রে 'সাতের গণ্ডী'তে বন্দী বালকের সামনে—খোলা ছিল —কেবল একটি জানালা। জানালার বাইরে ছিল পুষ্করিণী; পুষ্করিণীর পাড়ে ছিল বড় সেই ঝুড়ি নামানো জটাবুড়ি বটগাছটা। জানালার গরাদের ফ্রেমে বাইরের বিরাট জগতের চলমান জীবনের ছায়াছবি ভেসে এসে আটকে থাকত। টেনিসনের কবিতার দ্বীপবাসিনী বন্দিনী কন্যাকে তার ঐন্দ্রজালিক দর্পণে বাতায়নপথে প্রতিবিম্বিত বিশ্বজীবনের প্রেম, সৌন্দর্য ও আনন্দের বিচিত্র চলচ্ছবি যেমন দুর্গ ত্যাগ করে বাইরে ছুটে বেরিয়ে আসার জন্য প্রলুব্ধ করত, অথচ অভিশপ্ততার দরুণ যে মুক্তি ছিল তার পক্ষে প্রাণান্তক, কিশোর রবীন্দ্রনাথের অবস্থা ছিল ঠিক তেমনি। সেই শ্যালট-কন্যার মতোই রবীন্দ্রনাথ বাতায়নের ফ্রেমে আঁটা বহির্জগতের চলচ্চিত্র দেখতেন এবং ঐ সামান্য পুঁজিকেই কল্পনার ইন্দ্রজাল দিয়ে বিচিত্র কারুকর্মে বুনে অসীম ব্যাপ্তি দিতেন। এই সময় থেকেই প্রকৃতির সঙ্গ লাভের জন্য কবির আকুলতা যে কত তীব্র, তার পরিচয় এই অধ্যায়েই আছে: বিশ্বপ্রকৃতিকে আড়াল-আবডাল হইতে দেখিতাম। বাহির বলিয়া একটা অনন্ত প্রসারিত পদার্থ ছিল যাহা আমার অতীত, অথচ যাহার রূপ-শব্দ-গন্ধ দ্বার-

জানালার নানা ফাঁকফুকর দিয়া এদিক ওদিক হইতে আমাকে চকিতে ছুঁইয়া যাইত। সে যেন গরাদের ব্যবধান দিয়া নানা ইসারায় আমার সঙ্গে খেলা করিবার নানা চেষ্টা করিত। সে ছিল মুক্ত, আমি ছিলাম বন্ধ—মিলনের উপায় ছিল না, সেইজন্য প্রণয়ের আকর্ষণ ছিল প্রবল।'

এরপর কবির প্রকৃতির সঙ্গে প্রত্যক্ষ যোগ ঘটে পেনেটির বাগান-বাড়িতে। গঙ্গার কূলে কবির কৈশোরের ক'টি দিন যে কি আনন্দে কেটেছিল, তার স্মৃতি আছে 'বাহিরে যাত্রা' অধ্যায়টিতে: এই প্রথম বাহিরে গেলাম! গঙ্গার তীরভূমি যেন কোন পূর্বজন্মের পরিচয়ে আমাকে কোলে করিয়া লইল।'

বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গে কবির কৈশোরে তৃতীয়বার সাক্ষাৎ ঘটল পিতৃদেবের সাথে হিমালয় যাত্রায়। এই সাক্ষাতেই প্রকৃতপক্ষে যথার্থ অনুরাগের সুরু। এই যাত্রাপথে বোলপুরে কয়েকদিন তাঁকে পিতার সান্নিধ্যে থাকতে হয়। বোলপুর ও খোয়াইএর রাঙ্গামাটি, শাল-বীথি ও কালো-মানুষ সাঁওতাল মেয়েদের বন্য সৌন্দর্যের সঙ্গে তাঁর যে পরবর্তী হৃদয়যোগ, এই কৈশোরক স্মৃতিই তার ভিত্তি। প্রকৃতির আদিম বন্য রূপ এবং অসীম ভূমা রূপ, দুইএরই সঙ্গে এই যাত্রায় তাঁর ঘনিষ্ঠ যোগ হয়েছিল। 'জীবনস্মৃতি'তে বোলপুরবাসের দিনগুলির স্মৃতিচিত্রটি অপূর্ব। কবিপ্রাণ একটি বালকের প্রকৃতির রোমান্টিক সৌন্দর্যলোভী কৌতূহলীমনের লীলাচপলতায় এই চিত্রটি মন ভরিয়ে দেয়। এই দৃশ্যে ওয়ার্ডসওয়ার্থের কথা স্বতঃই মনে পড়ে। ওয়ার্ডসওয়ার্থ প্রকৃতির সঙ্গে তাঁর অন্তরঙ্গতার ভাবটিকে যে তিনটি পর্বে ভাগ করেছেন তার প্রথম পর্বের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের প্রকৃতি-প্রেমের এই কৈশোরক পর্বটির বেশ মিল রয়েছে। প্রকৃতি এই সময়ে কবির খেলার সঙ্গিনী, কবির কৌতূহল ও কল্পনার লীলা-নিকেতন-বাসিনী। ওয়ার্ডসওয়ার্থ যেমন উপত্যকা-অধিত্যকায় ছুটাছুটি করে প্রকৃতির সঙ্গে খেলে বেড়িয়েছেন, রবীন্দ্রনাথও হিমালয় যাত্রায় বোলপুরের প্রান্তরে আর হিমাচলের চড়াই-উৎরাইএ তেমনি

প্রকৃতির সঙ্গে খেলে বেড়িয়েছেন। কিন্তু ওয়ার্ডসওয়ার্থের কাছে বাল্যকালে প্রকৃতি জড়-ই ছিল এবং হরিণশিশুর মতো তাঁর উপত্যকা অধিত্যকাভূমিতে খেলা জৈবিকতা অর্থাৎ পুষ্ট হয়ে ওঠার প্রাবৃত্তিক তাড়নার অতিরিক্ত কোন অনুভূতি ছিল না। রবীন্দ্রনাথের কাছে কিন্তু প্রথমাবধিই প্রকৃতি চৈতন্যময়ী, সৌন্দর্য, প্রেম ও আনন্দরূপিনী। তবে প্রথম যৌবনের পূর্বে প্রকৃতি সম্বন্ধে এই অনুভব কবির কাছেও একেবারে প্রত্যক্ষ হয়ে ওঠেনি। তাই বোলপুর ও হিমাচলে প্রকৃতির সংস্পর্শে কবির বালসুলভ খেলার আনন্দই দেখতে পাই। এই আনন্দস্মৃতি-ই 'জীবনস্মৃতি'র রসমূল্য বাড়িয়েছে।

হিমালয় ভ্রমণের পর প্রকৃতির অন্যতর রূপের সঙ্গ কবি পেলেন বয়ঃসন্ধিপর্বে, সতের বছর বয়সে, বিলাত ভ্রমণ উপলক্ষ্যে, আমেদাবাদে। শাহীবাগে মেজদাদার সঙ্গে যে নবাবমহলে তিনি থাকতেন, সেটি ছিল মধ্যযুগীয় একটি বাদশাহী প্রমোদভবন। সামনে সুবর্ণবতী নদী বিস্তীর্ণ বালুশয্যায় এলায়িত ; চারিদিক ধূধূ নির্জন। বিপুল প্রাসাদের বিজনতা আর সুবর্ণবতীর ধূসরস্তনী বালুচর কিশোরকবির কল্পনাকে সঞ্জীবিত করেছিল। 'ক্ষুধিত পাষাণ' এই কল্পনারই ফসল। এরপর কবি য়ুরোপে গেলেন এবং সেখানে প্রকৃতির প্রতীচ্যরূপের সঙ্গলাভ করলেন। কিন্তু বিস্ময়ের বিষয় যে রবীন্দ্রনাথ বিলাতভ্রমণে প্রকৃতির কথা বিশেষ বলেন নি। য়ুরোপে যতবার তিনি গেছেন প্রকৃতি নয়, মানুষই তাঁকে অধিক আকর্ষণ করেছে এবং য়ুরোপের প্রকৃতি সম্বন্ধে তিনি সামান্যই বর্ণনা করেছেন। প্রতীচ্য-প্রকৃতি কেন তাঁকে মুগ্ধ করল না, সে প্রশ্নটি স্বতন্ত্র। য়ুরোপে প্রকৃতির চেয়ে মানুষই প্রকট. কেননা সেখানে নগর ও শিল্পসভ্যতা প্রকৃতিকে উদ্বাস্তু করেছে এবং মানুষের বিজ্ঞানবুদ্ধি সেখানে এমন বিশ্বকর্মার কর্মযজ্ঞ শুরু করেছে যে তাতেই দৃষ্টি আচ্ছন্ন হয়ে যায়। প্রাচ্যদেশেই নিসর্গ বিরাট ও গভীর ভাবে মানবজীবনকে আবৃত করে রেখেছে। তাই 'জীবন-স্মৃতিতে' দেখা যায় যে 'বিলাত' অধ্যায়ে ডাঃ স্কট পরিবার, লাটিন-শিক্ষক, পালিতমহাশয়, সিবিলিয়নের বিধবা রমণী প্রভৃতির স্মৃতি-

কথায় প্রায় সমস্ত পরিচ্ছেদটি জুড়ে রয়েছে। অবশ্য অধ্যায়ের সূচনাতেই বিলাতে প্রবাসী ভারতীয়ের চোখে প্রকৃতির যে দৃশ্যটি মুগ্ধতা রচনা করে, সেই তুষারপাতের বর্ণনা যথাবিধি আছে : চিরদিন পৃথিবীর যে মূর্তি দেখিয়াছি, এ সে মূর্তি নয়—এ যেন একটা স্বপ্ন, যেন আর কিছু—সমস্ত কাছের জিনিস যেন দূরে গিয়া পড়িয়াছে, শুভ্রকায় নিশ্চল তপস্বী যেন গভীর ধ্যানের আবরণে আবৃত। অকস্মাৎ ঘরের বাহির হইয়াই এমন আশ্চর্য সৌন্দর্য আর কখনো দেখি নাই'।

লক্ষণীয় যে প্রতীচ্য প্রকৃতির এই বর্ণনায় কবি যে উপমা ব্যবহার করেছেন তা ভারতীয় এবং হিমালয়ের রূপেরই প্রতিভাস। প্রতীচ্য প্রকৃতির বৃহৎ রূপটি পর্বত ও প্রান্তরে নয়, আকাশ ও অরণ্যেও নয়—সে রূপ রয়েছে সমুদ্রে এবং মানবজীবনে, যেমন ভারতীয় নিসর্গের মহত্তম রূপ আকাশ ও অরণ্যে। এই অধ্যায়ের একটি অনুচ্ছেদে সমুদ্র দৃশ্যের বর্ণনা আছে। সমুদ্রের অভিমুখে উন্মুখ একখণ্ড শিলাতল ; ফেন রেখাঙ্কিত সমুদ্র সৈকতের নীলিমার দোলার উপর আকাশের হাস্যোদ্ভাস ; পিছনে সারিবাঁধা পাইণের বিস্তৃত অঞ্চল ; —সবই আছে। তথাপি এই দৃশ্যে প্রকৃতির স্মৃতি কবির কাছে বড় হয়নি ; তার চেয়ে প্রধান হয়েছে, ঐ শিলাতলে বসে কবি যে কবিতা রচনা করেছিলেন, তারই স্মৃতি।

'জীবনস্মৃতি'র পঁচিশ বৎসর বয়সের স্মৃতিচারণায়, বিলাতের তুষারপাত ও সমুদ্র-দৃশ্যের পর প্রকৃতির সঙ্গলাভের পরবর্তী উল্লেখ পাই চন্দননগরে জ্যোতিদাদার সঙ্গে গঙ্গায় নৌকাবাসের দিনগুলির স্মৃতিকথায়। 'ছেলেবেলা'য় চন্দননগরে নৌকাবাসের দিনগুলির স্মৃতি আরো উজ্জ্বলভাবে বলা হয়েছে। কাদম্বরী দেবী এবং গঙ্গা—মানসী ও প্রকৃতিকে একত্রে কবি এই প্রথম পেলেন—সুতরাং এই গঙ্গা-বাসের দিনগুলির মতো আনন্দভরা দিন তিনি হয়ত শিলাইদহের পদ্মাবাসের সময়েও পাননি। রবীন্দ্রনাথের প্রকৃতি-প্রেমে প্রকৃতির পঞ্চরূপের মধ্যে অপ্-রূপের প্রতিই অধিকতর আসক্তির হেতু—

ইতিপূর্বেই বলা হয়েছে, আবার বলা যাক—সম্ভবত এই যে, প্রথমত নদীর মধ্যে বেগ আছে, দ্বিতীয়ত, নদীর সঙ্গে নারীর সৌন্দর্য ও স্বভাবের মিল আছে। নদী ও নারী রবীন্দ্রনাথের কাছে প্রায়শই এক হয়ে গেছে। কাদম্বরী দেবীর সঙ্গে তাঁর চন্দননগরে নদীবাসের সঙ্গীতমুখর দিনগুলির আনন্দময় স্মৃতি 'জীবনস্মৃতি'কে কিভাবে সাহিত্য করে তুলেছে তারই একটু পরিচয় উদ্ধৃত করা যাক: 'আমার গঙ্গাতীরের সেই দিনগুলি গঙ্গার জলে উৎসর্গ করা পূর্ণবিকশিত পদ্মফুলের মতো একটি একটি করিয়া ভাসিয়া যাইতে লাগিল।...

আমরা যখন বাগানের ঘাটে ফিরিয়া আসিয়া নদীতীরের ছাদটার উপরে বিছানা করিয়া বসিতাম তখন জলেস্থলে শুভ্র শান্তি; নদীতে নৌকা প্রায় নাই, তীরের বনরেখা অন্ধকারে নিবিড়, নদীর তরঙ্গহীন প্রবাহের উপর আলো ঝিকঝিক করিতেছে।'

রবীন্দ্রনাথ 'জীবনস্মৃতি' রচনার সময় প্রখরভাবে আত্মসচেতন ছিলেন। আত্মসচেতনতা রবীন্দ্রব্যক্তিত্বের নিয়ত প্রখর একটি লক্ষণ। কবি কখনোই আত্মবিস্মৃত হতেন না। আত্মবিস্মৃত হয়ে সৃষ্টি না করলে রচয়িতার যথার্থ জীবনদর্শনের পরিচয় পাওয়া যায় না। কেননা শিল্পী যে আদর্শবাদ প্রচার করেন তার সঙ্গে তাঁর স্বভাবের সায় নাও থাকতে পারে। রবীন্দ্রনাথের সদাজাগ্রত, অতিপ্রখর আত্ম-সচেতনতা তাঁকে রচনার মধ্যে সদা সযত্ন ও সতর্ক করেছে, অসতর্ক একটি কথাও বেরুতে পারেনি। দৃষ্টান্ত হিসাবে 'গঙ্গাতীর' অধ্যায়টিই যথেষ্ট। এই গঙ্গাবাসের দিনগুলি যে তার জীবনে অবিস্মরণীয় তা তিনি 'জীবনস্মৃতি'তে বলেছেন, কিন্তু গঙ্গা ছাড়া আর যাঁর স্নেহসান্নিধ্যে এই দিনগুলি এমন আনন্দময় ও অবিস্মরণীয় হয়ে উঠেছিল, সেই কাদম্বরী দেবীর উল্লেখ একবারও করলেন না। অথচ 'জীবনস্মৃতি'র বহুপরে লেখা 'ছেলেবেলা'য় তাঁর উল্লেখে তিনি বাধা বোধ করেন নি। 'জীবনস্মৃতি'র 'মৃত্যুশোক' পরিচ্ছেদে চব্বিশ বছর বয়সের যে শোক-স্মৃতি আছে, সে-যে কার মৃত্যুর জন্য শোক, সেকথাও তিনি স্পষ্ট নামোল্লেখ করে বলেন নি।

এই আত্মসচেতনতা বৈষয়িক মানুষের কল্যাণ করলেও শিল্পীর পক্ষে সর্বদা সুন্দর এবং অভিপ্রেত নয়। কবির পক্ষে কিছুটা আপনভোলা আত্মবিস্মৃত স্বভাবই সুন্দর ও সঙ্গত। অন্তত তাতে কবির প্রকৃতি ও নিরাভরণ অন্তরের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। 'জীবন-স্মৃতি'তে পদে পদে রচয়িতার সতর্কতা স্মৃতিচিত্রগুলির অনবদ্য রম্যতা সত্ত্বেও ভোলা যায় না।

যাই হোক, 'গঙ্গাতীর' অধ্যায়ের রবীন্দ্রনাথের একটি উক্তি 'জীবনস্মৃতি'র মূল সূত্র বলে গণ্য করা যায়। সেটি নিসর্গ-স্মৃতিরই একটি জবানবন্দী: 'আমার পক্ষে বাংলাদেশের এই আকাশভরা আলো, এই দক্ষিণের বাতাস, এই গঙ্গার প্রবাহ, এই রাজকীয় আলস্য, এই আকাশের নীল ও পৃথিবীর সবুজের মাঝখানকার দিগন্তপ্রসারিত উদার অবকাশের মধ্যে সমস্ত শরীর মন ছাড়িয়া দিয়া আত্মসমর্পণ—তৃষ্ণার জল ও ক্ষুধার খাদ্যের মতোই অত্যাবশ্যক ছিল।'

এই জবানবন্দী অবশ্য 'জীবনস্মৃতি'র একচেটিয়া নয়, 'ছিন্নপত্র' ও অন্যান্য পত্রাবলীতেও অনুরূপ উক্তি আছে। তথাপি এটিই 'জীবন-স্মৃতি'র মর্মবাণী। কোন্ মানুষ কতখানি এবং বিশ্বপ্রকৃতি কখন কিভাবে তাঁর কবি ও ব্যক্তিজীবনকে গড়ে তুলেছে, স্মৃতিচিত্রের দ্বারা তারই আভাস তিনি এগ্রন্থে দিয়েছেন। প্রকৃতির সঙ্গে আত্মপরিচয়ের আরো কিছু স্মৃতিচিত্র 'জীবনস্মৃতি'র 'কারোয়ার' ও 'বর্ষা ও শরৎ' অধ্যায়ে রয়েছে। চব্বিশ বছর বয়সে কবি যে দুর্বিষহ ও মর্মান্তিক শোক পেয়েছিলেন, কেমন করে বর্ষা ও শরৎ প্রকৃতির স্নিগ্ধ প্রলেপে সেই আঘাত থেকে শান্তিলাভ করলেন, তারই স্মৃতি রয়েছে শেষের পরিচ্ছেদটিতে। চব্বিশ বছরের প্রথম শোক কবিকে বিভ্রান্ত করেছিল, কিছু দিনের জন্য জীবনবিমুখও করেছিল। তারপর ক্রমে তিনি প্রকৃতির সান্নিধ্যে শান্তি পেলেন, আবার বাঁচার অর্থ খুঁজে পেলেন, সুন্দর ভুবনকে ভালবাসতে পারলেন। বিশ্বজীবনের কাছে ক্ষুদ্র ব্যক্তিজীবনের আত্মনিবেদনকে বৃহৎ কল্যাণের জন্য প্রয়োজন বলে জানলেন। এইভাবে প্রকৃতি তাঁর মধ্যে আধ্যাত্মিকতা রচনা করল—

প্রকৃতি আর জীবনের প্রতিবেশ ও সৌন্দর্যের আধারমাত্র হয়ে রইল না, জীবনের সঙ্গে অনবচ্ছিন্ন বিশ্ববোধরূপে আত্মপ্রকাশ করল। 'জীবনস্মৃতি' এই বিশ্ববোধ জাগৃতির মুখোমুখি এসে সমাপ্ত হয়েছে। ভালোই হয়েছে যে, এই তাত্ত্বিকতা ও দার্শনিকতা শেষ পর্যন্ত অনুপ্রবেশ ঘটিয়ে রবীন্দ্ররচনাসাহিত্যে 'জীবনস্মৃতি'র অনন্য সুখপাঠ্যতা ও প্রসন্ন সরসতা ক্ষুণ্ণ করেনি।

পঞ্চম উদ্যোগ

॥ রবীন্দ্রনাথের গদ্যশৈলী ॥

শৈলীর সংজ্ঞা

শীল থেকে শৈলী। শীল অর্থ চরিত্র, স্বভাব, রীতিনীতি। এর থেকে সাহিত্যের শৈলী বলতে বোঝাচ্ছে রচনার স্বভাব ও রীতিনীতি। কোন একটি রচনায় শিল্প-স্বভাবের যে বিশিষ্ট চরিত্রটি পরিস্ফুট হয়, তারই নাম শৈলী।

প্রাচীন আলংকারিকগণের মধ্যে বামনাচার্য ছিলেন রীতিরাত্মা-বাদী। ধ্বনি ও রসবাদে পৌঁছানোর পূর্বে কাব্য জিজ্ঞাসার একটি পর্বে রীতি বা শৈলীকেই রস সৃষ্টির আদি কারণরূপে নির্দেশ করা হয়েছে। বামন রীতি বা শৈলীকেই বলেছেন কাব্যের আত্মা। শৈলী বলতে তিনি বুঝেছিলেন একটি বিশিষ্ট পদবিন্যাসকৌশল—'বিশিষ্টা পদরচনা রীতিঃ'। এমনভাবে শব্দ ও অর্থের সন্নিবেশ করতে হবে যাতে শ্লেষ, প্রসাদ, সমতা, মাধুর্য, সৌকুমার্য, অর্থব্যক্তি, উদারতা, ওজ, কান্তি, এবং সমাধি—এই দশটি গুণ স্পষ্টভাবে ফুটে ওঠে। যদিও বামনাচার্যের এই রীতিরাত্মাবাদ শিল্পের বহিরঙ্গ কলা চর্চা বলে মনে হয়, কিন্তু আসলে এ মতবাদটিও শিল্পের অন্তরঙ্গ গুণের কথাই বলছে। যে দশটি গুণের কথা বলা হয়েছে তার কতগুলি শব্দালঙ্কার, কয়েকটি অর্থালঙ্কার এবং কয়েকটি অলঙ্কার নিরপেক্ষ ধ্বনি ও রসের ব্যঞ্জনা-ই দিচ্ছে। অর্থাৎ বামনাচার্যের 'রীতি'-ও বস্তুত শিল্পের অন্তর্নিহিত গুণগত সত্তা বৈ নয়। তবে বামনাচার্য রীতি বা শৈলীর সঙ্গে স্রষ্টার সম্পর্কের কথা ভাবেন নি। স্রষ্টার আত্মা বা স্বভাবের বিশিষ্টতা-ই যে সৃষ্টির শৈলী, এ ধারণা সাম্প্রতিক।

ভারতীয় অলংকারশাস্ত্রে প্রকরণ ও আঙ্গিক নিয়ে বিস্ময়কর

বিদগ্ধ আলোচনা হয়েছে ; কিন্তু স্টাইল বা শৈলীর ধারণা প্রধানত প্রতীচ্য। শিল্পসৃষ্টিতে স্রষ্টার ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের স্বীকৃতি য়ুরোপে যেমন মর্যাদা পেয়েছে, এদেশে তেমন পায়নি। ভারতে রচনা রীতিতে বড়জোর আঞ্চলিক স্বাতন্ত্র্য স্বীকৃতি পেয়েছে, যেমন বৈদর্ভী, গৌড়ীয় এবং পাঞ্চালী শৈলী। কোন্ অঞ্চলের রচনায় কোন্ রস কতটা মুখ্য হয়, বিভাব-অনুভাবগুলির সমাবেশ কোথায় কি বাগ্-ভনিতির আশ্রয় পায়, ইত্যাদি কতগুলি প্রথা ও সাধারণ প্রকরণের ভিত্তিতে এই রীতি-স্বাতন্ত্র্য স্বীকৃত। এর সঙ্গে স্টাইলের ধারণার কিছুমাত্র সম্পর্ক নেই। স্টাইল বা শৈলী স্রষ্টার স্বভাবের স্বকীয়তা, বিশিষ্টতা, বা স্বতন্ত্রতার উপর নির্ভরশীল। স্রষ্টার অনন্যতাই তাঁর স্টাইল।

'যাঁর প্রতিভা নেই, প্রতিভার স্বাতন্ত্র্য নেই—তিনি লেখক হিসাবে কারো দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারেন না।.....এই সাহিত্যিক ব্যক্তিত্ব বা স্বাতন্ত্র্য বা মর্যাদাকে স্টাইল বলা হয়ে থাকে।...তাই সাহিত্যিক খ্যাতির অন্যতম ভিত্তি যে স্টাইল তার মূল কথা হচ্ছে স্বাতন্ত্র্য। Middleton Murry বলেছেন,—"idiosyncracy is essential to style." স্বাতন্ত্র্য স্টাইলের মূলধর্ম সন্দেহ নেই, কিন্তু সেই স্বাতন্ত্র্য কৃত্রিম বা মিথ্যা হলে চলে না, খাঁটি হওয়া চাই। ....স্টাইল একান্তভাবে ব্যক্তিগত হলেও তাকে নৈর্ব্যক্তিক নাহলে চলে না।... ...নিছক ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য যদি লেখার গুণে সার্বিকতার অনুকূল না হয়ে ওঠে, তবে তাকে পাঠক অস্বীকার করে।.. —তাই স্টাইল একান্ত-ভাবে ব্যক্তিগত ভাবব্যঞ্জনার প্রকাশ হয়েও কমবেশি নৈর্ব্যক্তিক বা সার্বিক। Murry বলছেন—"highest style is that wherein the two current meanings of the word blend ; it is a combination of the maximum of personality with the minimum of impersonality. On the one hand,it is a concentration of peculier and personal emotion, on the other it is a complete projection of this personal

emotion into the created thing" [ডঃ জীবেন্দ্র সিংহ রায়ঃ প্রমথ চৌধুরী।]

Bonamy Dobree বলেছেন, শৈলী হোল শিল্পীর আত্মার নিঃশ্বাস। কোন গ্রন্থ ভাল লাগার অর্থ গ্রন্থকারের ব্যক্তিত্বের দ্বারা সেই ভালো-লাগার মুহূর্তগুলিতে আচ্ছন্নতা। এই যে লেখক কিছুক্ষণের জন্য পাঠককে তাঁর ব্যক্তিত্ব দিয়ে আচ্ছন্ন ও মুগ্ধ করে রাখলেন, এরই নাম স্টাইল। যখনই আমরা কোন গ্রন্থ পাঠ করি, আমরা তার মধ্য থেকে গ্রন্থকারের কণ্ঠস্বরটি শুনতে পাই এবং তিনি আমাদের মনের মধ্যে ক্রিয়া করতে থাকেন। রচনায় রচয়িতার এই যে স্বকীয় স্বর, স্বতন্ত্র সত্তা, বোনামি ডব্‌রীর মতে এই হোল তাঁর স্টাইল। "Whenever we read a book···we are aware of a voice. It is as though someone had been speaking to us, telling us something, or working upon our feeling. It is this voice which we roughly call style, and however a writer may ignore his personality, even seek to conceal it, he cannot disguise his voice, his style"·····

শৈলী ও প্রকরণ

শৈলী, রীতি ও আঙ্গিক একার্থক নয়। আঙ্গিক রচনার আধার এবং রীতি হোল রচনার প্রকরণ; রচনার বহিরঙ্গ প্রসাধনকলা-র নামান্তর রীতি এবং যে বিশেষ রূপাধারের মধ্যে রচনাবিশেষের আত্মপ্রকাশ, আঙ্গিক বলি তাকেই। আঙ্গিক এবং রীতি স্টাইল বা শৈলীর অঙ্গবিশেষ। গদ্য-শিল্পীর সঙ্গে কবির প্রথম প্রভেদ আঙ্গিকগত —কিন্তু উভয়ের শৈলীতে প্রভেদ না-থাকতেও পারে। দৃষ্টান্ত-স্বরূপ প্রমথ চৌধুরী স্মরণীয়। তিনি গদ্য-শিল্পী। আবার সনেটও লিখেছেন। সনেটের আঙ্গিক নিশ্চয় প্রবন্ধের চেয়ে স্বতন্ত্র। কিন্তু কি সনেট, কি গদ্যরচনা—উভয়ত্রই বীরবলী শৈলী বা ব্যক্তিত্ব সমভাবে

উপস্থিত। আঙ্গিক আর শৈলী যেমন এক নয়, তেমনি রীতি আর শৈলীও স্বতন্ত্র। রীতি (Diction) হোল আঙ্গিকের (Form) অংশ। সাহিত্যের কতগুলি মৌলিক ও চিরকালীন রীতিনীতি আছে। সাহিত্যের ঐতিহ্যের উপরই এই রীতিনীতিগুলি নির্ভর করে। ভারতীয় সাহিত্যের যেমন কতগুলি সাহিত্যগত রীতিনীতি গড়ে উঠেছে, য়ুরোপীয় সাহিত্যেরও তেমনি কতগুলি রীতিনীতি আছে। জাতীয় সংস্কৃতি থেকেই প্রত্যেক সাহিত্য রীতিনীতির উত্তরাধিকার লাভ করে। অর্থাৎ রীতি হোল সাহিত্যের ঐতিহ্য যা একটি ভাষাগোষ্ঠীর সকল সাহিত্যিকের সাধারণ সম্পদ। সাহিত্যিক-গণ কেমন ভাবে কোন রীতিনীতি কতটুকু গ্রহণ বর্জন করেন, তার মধ্যেও তাঁর শৈলী পরিস্ফুট হয়। অর্থাৎ রীতি (Diction) এবং আঙ্গিক (Form) শৈলীর (Style এর) বহিরঙ্গ আবরণমাত্র হোলেও স্টাইল বুঝতে হোলে রচনাকারের রীতি ও আঙ্গিকেরও অনুধাবন চাই। রচনাকার যে কৌশলে বা উপায়ে রীতি ও আঙ্গিকের মাধ্যমে স্বীয় শৈলী প্রকাশ করেন তারই নাম প্রকরণ (Technique)।

শৈলী ও শিল্পী

Bonamy Dobree র ভাষায়, 'It is by his stvle we recognize a writer'—আমরা শিল্পী চিনি শেলী দেখে। উপকরণ নয়, প্রকরণের সাহায্যেই রচনা শিল্প হয়ে ওঠে। 'কি-বলা-হয়েছে' নয়, 'কেমন-করে-বলা-হয়েছে',—এর উপরই নির্ভর করে রচনার শিল্পত্ব। Bonamy Dobree-র কথাই আবার নেওয়া যাক,—'In the end it is the style of a book which gives us pleasure, for even the best material can be spoiled by bad writing.' এহেন যে রচনাশৈলী, বলা বাহুল্য, তা রচনাকারের সার্বিক সত্তাটিই পরিস্ফুট করে থাকে। তাই শৈলীরও একাধিক দিক আছে। ডঃ জীবেন্দ্র সিংহ রায়ের প্রাসঙ্গিক আলোচনাটুকু উদ্ধৃত করছি: 'L. B. Burrows বলেছেন, "The idea of

style is essentially and immutably manner, the whole manner in which ideas are conceived and brought into the world as written words, manner of thinking, manner of feeling and manner of expression." অর্থাৎ স্টাইলের তিনটি দিক আছে—বিষয়, চিন্তানুভূতি ও প্রকাশভঙ্গি .....সহজেই অনুমান করা যায় যে বিষয়ের রূপ ও প্রকৃতির ওপর রচনার বৈশিষ্ট্য তথা স্টাইল অনেকখানি নির্ভর করে। তবে লেখকের ব্যক্তিগত অনুভূতি ও চিন্তার—এককথায় তাঁর অন্তর্সত্তার গুরুত্বই সর্বাধিক। তাই 'style is the man.' প্রত্যেক লেখকের অন্তর্জগতে একটা পক্ষপাতমূলক ভাবাবেগ (emotional bias) এবং বিশেষ ধরনের সংস্কার (mode of experience) থাকে। তারই প্রভাবে বিষয়বস্তু সেখানে একটা নির্দিষ্ট রূপলাভ করে।..... অন্যদিকে বিষয়বস্তু যেভাবে লেখকের মনে এসে জমা হয়, ঠিক সেই ভাবে সেই ক্রমে তিনি শব্দ চয়ন ও ব্যবহার করে থাকেন, রচনার আঙ্গিকের সঙ্গে তাই লেখকের অন্তরঙ্গ স্বভাবের একটা অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধ না থেকে পারে না। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, যথাথ স্টাইলে উপযুক্ত আঙ্গিক,—রুষ্যকের ভাষায় 'রসানুকূল বর্ণ রচনা' এবং Pater-এর ভাষায়..."language faithful to the colouring of spirit" লক্ষ্য করা যাবেই।'

গদ্যের প্রকারভেদ ও গদ্যশৈলী

শৈলী শিল্পীর আত্মার স্বর হলেও সেই স্বরের ধ্বনি ও রূপ অপরিবর্তনীয় নয়। "Men do not always speak with the same voice.....we may expect a man's style to vary when the object in writing is different." বোনামি ডবরীর এই উক্তির নির্গলিতার্থ হোল এই যে, লেখার উপকরণ অনুযায়ী প্রকরণের বদল হয়, বিষয় অনুযায়ীই হয় রচনার শৈলী। গদ্যের বিষয় তিন রকমের হতে পারে —(ক) বর্ণনাত্মক ; (খ) ব্যাখ্যাত্মক ;

এবং (গ) ভাবাত্মক। চরিত্র, ঘটনা এবং দৃশ্যের রূপায়ণ বা বিবৃতি বর্ণনাত্মক; বিজ্ঞান, আইন, দর্শন, নীতি, ন্যায়, তত্ত্ব, রাষ্ট্রনীতি, অর্থনীতি, ইতিহাস, সাহিত্য-সমালোচনা ব্যাখ্যাত্মক এবং রচয়িতার ব্যক্তিত্ব ও আবেগের দ্বারা পাঠকের আবেগ ও ভাবোদ্রেক করা যে গদ্যরচনার ফল, তাকে ভাবাত্মক (Emotive) গদ্য বলা হয়। নাটক-গল্প-উপন্যাস-ভ্রমণকাহিনী প্রভৃতি কথাসাহিত্যের গদ্যশৈলী সাধারণভাবে বর্ণনাত্মক (Narrative)। প্রবন্ধের গদ্যশৈলী ব্যাখ্যাত্মক (Explanatory) এবং ব্যক্তিগত নিবন্ধ বা রচনাশিল্পের গদ্যশৈলী ভাবাত্মক হয়ে থাকে। আবার উদ্দেশ্যের দিক দিয়ে গদ্য পাঁচ রকমের হতে পারে। (১) গল্প বলাই যেখানে লক্ষ্য, সেখানে যে গদ্যশৈলী তা বর্ণনামূলক। (২) যুক্তি ও বুদ্ধি বিস্তার করে কিছু একটা বুঝিয়ে দেওয়া যে রচনার লক্ষ্য তার গদ্য মননমূলক (Argumentative); (৩) নাটকের সংলাপের গদ্যরীতি নাটকীয় (Dramatic); (৪) ব্যাখ্যা না করে কোন কিছু কেবল জ্ঞাপন বা জ্ঞানদান করা যে রচনার লক্ষ্য তাকে বিবৃতিমূলক (Informative) এবং পাঠকচিত্তকে কোন দার্শনিক, ধর্মীয়, রাজনৈতিক বা ভাবকল্পনার আবেগ দ্বারা আচ্ছন্ন করে দেওয়া যে রচনার উদ্দেশ্য, তাকে ভাবাত্মক গদ্য (Contemplative বা Emotive) বলা যেতে পারে।

রবীন্দ্রনাথের স্টাইল

রবীন্দ্রনাথের গল্প, উপন্যাস ও নাটকের গদ্যশৈলী বর্তমান গ্রন্থে আমরা আলোচনার বাইরে রেখেছি। কথাসাহিত্যের বর্ণনামূলক গদ্যশৈলী বাদ দিলে রবীন্দ্রনাথের অন্য গদ্যরচনার শৈলী সাধারণভাবে ভাবাত্মক।

ইতিপূর্বে রবীন্দ্র গদ্যরচনার যে ছটি যুগ বিভাগের কথা বলা হয়েছে, তার মধ্যে প্রথম যুগের রচনায় রবীন্দ্রনাথের নিজস্ব রচনারীতি পরিস্ফুট হয় নি। ১৮৭৬-৮৫ খ্রীঃ এর মধ্যে রচিত গদ্য নিবন্ধগুলি

মোটামুটি মননমূলক গদ্যশৈলীতে লিখিত হয়েছে। 'বিবিধ প্রসঙ্গ', 'আলোচনা' প্রভৃতির ব্যক্তিগত রচনাগুলি ততটা ভাবাত্মক নয়, যতটা মননাত্মক। 'য়ুরোপপ্রবাসীর পত্র' বর্ণনামূলক শৈলীতে লেখা। মোটকথা এ-সময় পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথ স্ব-রূপের সন্ধান পেয়ে ওঠেন নি।

১৮৮৬ খ্রীঃ থেকে অর্থাৎ দ্বিতীয়যুগের গোড়া থেকে রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিত্ব তাঁর রচনায় নিজস্ব চিহ্ন এঁকে দিতে আরম্ভ করেছিল। এই যুগে লেখা 'পঞ্চভূত,' 'সাহিত্য', 'আধুনিক সাহিত্য', 'প্রাচীন-সাহিত্য,' 'লোকসাহিত্য' 'ছিন্নপত্র' প্রভৃতি গদ্যসাহিত্যে রবীন্দ্রনাথের শিল্পশৈলীর অনন্যতা অনস্বীকার্য। এখান থেকেই তাঁর গদ্য-শিল্পের জয়যাত্রা।

রবীন্দ্রনাথের রচনাশিল্পের গদ্যশৈলীর প্রধানতম বৈশিষ্ট্য ছন্দস্পন্দ। এই প্রসঙ্গে সংক্ষেপে গদ্যছন্দ কিভাবে সৃষ্টি হয় একটু বুঝে নেওয়া যাক ঃ

গদ্যছন্দ

গদ্যছন্দের মূলসূত্র পদ্যছন্দেরই অনুরূপ। চরণের পর্ব-বহুত্ব, পর্ব-সংহতি এবং পর্ব-সঙ্গতি গদ্যছন্দেরও মূলসূত্র। তবে গদ্যছন্দের চরণ অর্থপ্রধান এবং অপরিমিত বলে পদ্যচরণের মতো ধ্বনিসর্বস্ব নয়। বাক্যগুলি খুব ছোট বা সরল হোলে পর্ব-বহুত্ব না থাকায় ছন্দস্পন্দ জাগে না। এমন কি দীর্ঘ বাক্যগুলিও অনাড়ম্বর ও সরল হোলে স্পষ্টত পর্বত্ববোধ না হওয়ায় ছন্দস্পন্দ আসে না। দীর্ঘ সমাসশূন্য, শব্দবাহুল্যহীন অর্থপ্রধান ভাষা অনাড়ম্বর এবং সমাসযুক্ত অভিনব শব্দবহুল ভাবাবেগপ্রধান ভাষা সাড়ম্বর গদ্য বলা যেতে পারে। সাড়ম্বর গদ্যে দীর্ঘ সরল বা জটিল বাক্যে পর্বগুলি সুস্পষ্টভাবে অনুভূত হয় বলে ছন্দস্পন্দও অনুরণিত হয়। পর্বের সুস্পষ্টতা যৌগিকতাসাপেক্ষ। যৌগিকতা বাক্যগত ও শব্দগত উভয়বিধ হতে পারে। দুটির বেশি শব্দের যৌগিকতা হোলেই পর্বত্ব সুস্পষ্ট হয়। একই বিভক্তি পর পর কতগুলি শব্দে ব্যবহার করে

পর্বে পর্বে যৌগিকতা সৃষ্টি করা যায়। এই যৌগিকতা ক্রিয়াপদ, বিশেষ্য বা বিশেষণ পদের এবং সানুপ্রাস বা অনুপ্রাসমুক্ত হতে পারে। সানুপ্রাস বিশেষণের যৌগিকতা সৃষ্টি করে গদ্যছন্দ রচনার দৃষ্টান্ত 'কেকাধ্বনি' থেকে নেওয়া যাক: 'এইরূপ জ্যোতিহীন, গতিহীন, কর্মহীন, বৈচিত্র্যহীন কালিমালিপ্ত অন্ধকারের দিনে ব্যাঙের ডাক ঠিক সুরটি লাগাইয়া দেয়।'

গদ্যছন্দে পর্ব-স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখে পর্ব-সংহতি সৃষ্টির পাঁচ প্রকার কৌশল আছে—সংযোজক অব্যয়ের লোপসাধন, পর্ব-স্বরূপ বাক্যগুলির প্রতিটির মধ্যে যে কোন স্থানে—আদি, মধ্য বা অন্তে একই বিশিষ্ট শব্দের প্রয়োগ, কোন অনুক্ত উত্তরের অপেক্ষা করে জিজ্ঞাসার ভঙ্গিতে পর পর বিভিন্ন পর্বস্বরূপ বাক্য ব্যবহার, কোন আবেগের প্রকাশের জন্য বিস্ময়ের ভঙ্গী ব্যবহার এবং বাক্যকে জোরালো করার জন্য বিধেয়কে উদ্দেশ্যের আগে বসিয়ে বাক্যগঠনের ক্রমবিপর্যয় ঘটান। পদবিন্যাসে এই বিপর্যয় বাক্যটিকে গুরুত্ব ও অসাধারণত্ব দেয়, শ্বাসাঘাত প্রদান করে ধ্বনিসৃষ্টি করে।

তৃতীয়ত, গদ্যছন্দে থাকে পর্ব-সঙ্গতি। পদ্যে থাকে পর্ব-সম্মিতি। পদ্যের চরণে সমসংখ্যক পর্ব থাকে, গদ্যে যত খুশি পর্ব থাকতে পারে এবং পর্বগুলির মাত্রা বা অক্ষরের সংখ্যাও সমান না হতে পারে। কিন্তু সম্মিতি না থাকুক, সঙ্গতি থাকা চাই। এই সঙ্গতি সরল ও জটিল হতে পারে। সরল ও জটিল সঙ্গতি আবার পর্বের সংখ্যার দিক দিয়ে তুলা, তরঙ্গ ও সোপান—তিনরকম হতে পারে। দ্বিপর্বিক পর্ব-শৃঙ্খলার নাম—তুলাসঙ্গতি। এটি আবার সমদীর্ঘ, ক্রমদীর্ঘ বা ক্রমহ্রস্ব হতে পারে। 'কেকাধ্বনি' থেকে ক্রমদীর্ঘ তুলাসঙ্গতির একটি দৃষ্টান্ত নেওয়া যাক: 'পূর্ণিমার কোটাল ইহাকে স্ফীত করে—সন্ধ্যাভ্রের রক্তিমা ইহাকে লজ্জামণ্ডিত বধূবেশ পরাইয়া দেয়।' ত্রি-পর্বিক ধ্বনিপ্রবাহে প্রথম থেকে দ্বিতীয় পর্বে কণ্ঠধ্বনির উত্থান ও দ্বিতীয় থেকে তৃতীয় পর্বে কণ্ঠধ্বনির পতন অনুভূত হলে তার নাম 'তরঙ্গ-সঙ্গতি' এবং ত্রি-পর্বের অধিক

পর্ব-বহুল বাক্যে যে ছন্দ তার নাম 'সোপান-সঙ্গতি'। পর্বগুলি সমানদৈর্ঘ্যের হোলে সমদীর্ঘ, ছোট থেকে বড় হতে থাকলে ক্রমদীর্ঘ এবং বড় থেকে পর্ব ছোট হতে থাকলে ক্রমহ্রস্ব সঙ্গতি বলা হবে। পর্বের দীর্ঘ-হ্রস্বতার আরোহণ-অবরোহণের দরুণ ছন্দস্পন্দ (rhythem) বোধ হয়।

রবীন্দ্রনাথের গদ্যরচনায় ছন্দ

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে গদ্যছন্দ-ই রবীন্দ্র গদ্যরচনার প্রথম ও প্রধান শৈলী। 'বিচিত্র প্রবন্ধ' এবং 'লিপিকা' থেকে এই গদ্যছন্দের দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত করা হোল ঃ

বিচিত্র প্রবন্ধ

ক। তবে এ-গৃহ রুদ্ধ রাখিয়ো না, | দ্বার খুলিয়া দাও। | * সূর্যের আলো দেখিয়া, | মানুষের সাড়া পাইয়া, | চকিত হইয়া | ভয় প্রস্থান করিবে। | * ['রুদ্ধগৃহ'—] অসমাপিকা ক্রিয়া পর পর তিনটি পর্বে প্রয়োগ করার দরুণ এখানে ছন্দস্পন্দ অনুভূত হচ্ছে।

খ। আমি পথের ধারে বসিয়া লিখি, | তাই কি লিখি ভাবিয়া পাই না। | * ছায়াময় পথ। | প্রান্তে আমার ক্ষুদ্র গৃহ। | তাহার বাতায়ন উন্মুক্ত। | * ভোরের বেলার সূর্যের প্রথম কিরণ | অশোক-শাখার কম্পমান ছায়ার সঙ্গে, | আমার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়ায়। | * আমাকে দেখে | আমার কোলের উপর পড়িয়া খেলা করে | আমার লেখার উপর আসিয়া পড়ে | এবং যখন চলিয়া যায় | তখন লেখার উপর খানিকটা সোনালি রঙ রাখিয়া দিয়া যায়, | আমার লেখার উপরে তাহার ক্ষণকচুম্বনের চিহ্ন রাখিয়া যায়। | * ['পথপ্রান্তে']

'বিচিত্র-প্রবন্ধে'র গদ্যশৈলীর অন্যতম লক্ষণ হোল দীর্ঘ যৌগিক বাক্য। এক একটি ছোট্ট সরল বাক্যের পর একটি বহুপর্বিক দীর্ঘ যৌগিক বাক্য এবং পর্বগুলি সমাপিকাক্রিয়াসহ প্রত্যেকটি প্রায় সম্পূর্ণ,

পরস্পর নিরপেক্ষ। 'লিপিকা'র গদ্যশৈলীও অনুরূপ, কেবল গল্প-ঢঙে লেখা বলে বাক্যগুলি আরো বেশি কথ্য ও অনাড়ম্বর। বর্তমান উদ্ধৃতির প্রথম চরণটিতে রয়েছে সমদীর্ঘ তুলাসঙ্গতি; উভয় পর্বেই বারটি মাত্রা বা অক্ষর রয়েছে। তাছাড়া উভয় পর্বে 'লিখি' শব্দটি ধ্বনিসৃষ্টি করতে সাহায্য করেছে। দ্বিতীয় চরণ ক্রমদীর্ঘ তরঙ্গসঙ্গতি-র দৃষ্টান্ত (৬ঃ ৯ঃ ১০ অক্ষর)। তৃতীয় পংক্তিটি দৃষ্টান্ত সোপান-সঙ্গতির।

গ। বিদ্যুৎকে মানুষ লোহার তার দিয়া বাঁধিয়াছে, | কিন্তু কে জানিত মানুষ শব্দকে | নিঃশব্দের মধ্যে বাঁধিতে পারিবে! | * কে জানিত সঙ্গীতকে, | হৃদয়ের আশাকে, | জাগ্রত আত্মার আনন্দ-ধ্বনিকে, | আকাশের দৈববাণীকে | সে কাগজে মুড়িয়া রাখিবে! | * ['লাইব্রেরী'] এখানে পবে পর্বে দ্বিতীয়া বিভক্তি 'কে' ব্যবহারের মধ্য দিয়ে ছন্দস্পন্দ সৃষ্টি করা হয়েছে।

ঘ। 'আকাশের নীল আজ | বিরহিণীর চোখদুটির মতো | স্বপ্নাবিষ্ট, | * পাতার সবুজ আজ | তরুণীর কপোলের মতো | নবীন, | * বসন্তের বাতাস আজ | মিলনের আগ্রহের মতো | চঞ্চল, | * তবু তোর পাখাদুটি আজ বন্ধ, | তবু তোর পায়ে আজ | কর্মের শিকল ঝন্‌ঝন্ করিয়া বাজিতেছে | * - -এই কি মানবজন্ম! | * ['বসন্তযাপন']

গদ্যছন্দ সৃষ্টির কৌশলের একটি সার্থক দৃষ্টান্ত এই উদ্ধৃতিটি। সুদীর্ঘ যৌগিক বাক্যটির অন্তর্গত চারটি পদ; প্রতিটি পদ স্বয়ংসম্পূর্ণ এবং সংযোজক অব্যয় উহ্য রেখে পদসংহতি রচনা করা হয়েছে। প্রতিটি পদে তিনটি করে পর্ব আছে, এবং শেষ পদটি বাদে প্রত্যেক পদে (clause-এ) পর্ব (phrase)-গুলি মোটামুটি ৮ঃ ১০ঃ ৪ বা ৮ঃ ১০ঃ ৩ অক্ষরের তরঙ্গসঙ্গতি সৃষ্টি করেছে। তাছাড়া পদগুলির প্রথম পর্বের অন্তে 'আজ', দ্বিতীয় পর্বের অন্তে 'মতো' এবং প্রত্যেক পদের শেষে একটি ভাঙ্গা-পর্ব ব্যবহার করার ফলে সমস্ত ধ্বনিপ্রবাহটির মধ্যে অনবদ্য ছন্দস্পন্দের সৃষ্টি হয়েছে।

'বিচিত্র প্রবন্ধে'র রচনাগুলি কবির একসময়ের লেখা নয়; তথাপি কালের দীর্ঘ ব্যবধান সত্ত্বেও লেখাগুলিকে যে অনবচ্ছিন্ন মনে হয় তার কারণ একই ভাবাবস্থা (mood) নিয়ে সবকটি রচনা লিখিত হয়েছে, ফলে রচনাশৈলীটিও হয়েছে এক। এ ধরনের রচনাশিল্প বিষয়গৌরবী না হয়ে আত্মগৌরবী হওয়ায় স্বতঃই শৈলীপ্রধান হয়ে থাকে। উপরের উদ্ধৃতিগুলি থেকে কেবল যে গদ্যছন্দের সন্ধান মিলেছে তা নয়, এ গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথের গদ্যশৈলীর অন্য প্রকরণসমূহের স্বাক্ষরও মিলেছে। 'বিচিত্র প্রবন্ধ' এবং 'লিপিকা' উভয় গ্রন্থেই বাক্য-পদ-পর্ব এবং শব্দ-চিত্র-অলঙ্কার ব্যবহারের একই কৌশল অবলম্বিত হয়েছে। বাক্যগুলি বেশির ভাগই দীর্ঘ যৌগিক, কিন্তু জটিল নয়। দীর্ঘ যৌগিক বাক্যেব মাঝেমধ্যে একআধটি নাতিদীর্ঘ সরল সংক্ষিপ্ত বাক্যও মিশিয়ে দেওয়া হয়েছে। ['খ' দৃষ্টান্ত দ্রষ্টব্য] এক একটি পর্বকেই বাক্যের মর্যাদা দেওয়া হয়েছে। দীর্ঘ যৌগিক বাক্যগুলির অন্তর্গত পদগুলি স্বয়ংসম্পূর্ণ, সংযোজক অব্যয় উহ্য রাখা হয়েছে। দ্বিতীয়ত, ভাষায় আবেগোচ্ছলতা আছে, কিন্তু আড়ম্বর নেই। শব্দগুলি সমাসবহুল নয়, সাড়ম্বরও নয়, কিন্তু অধিকাংশই তৎসম এবং সানুপ্রাসিক। বিশেষণের বহুল ব্যবহার চতুর্থ লক্ষণ। যেমনঃ গৌরীশংকরের তুষারবেষ্টিত দুর্গমতা, | মহাসমুদ্রের তরঙ্গচঞ্চল দুস্তরতা | আপনাদের সজাতিত্ব জ্ঞাপন করিতেছে। ['পাগল'—বি, প্র]। উভয় গ্রন্থের অন্যতম শৈলীবৈশিষ্ট্য হোল প্রথমপুরুষের প্রয়োগ এবং মধ্যমপুরুষের সম্বোধন। কখনো আপনাকে, কখনো পাঠককে, কখনো বিশ্বপ্রকৃতির অন্তঃসত্তাকে সম্বোধন 'বিচিত্র প্রবন্ধে'র গদ্যশৈলীর উল্লেখযোগ্য লক্ষণঃ 'নৃত্য করো, হে উন্মাদ, নৃত্য করো' ('পাগল'); 'হায়রে সমাজদাঁড়ের পাখি,—···এই কি মানবজন্ম!' ('বসন্তযাপন') 'বিচিত্র প্রবন্ধে'র গদ্যশৈলী ভাবাত্মক (Emotive) বলে স্বতঃই তা চিত্রকল্পী, অলঙ্কারবহুল ও শব্দডম্বর না হয়ে স্বচ্ছ ও ছন্দস্পন্দিত হয়েছে। কিন্তু এর একটি রচনা—'ছোটোনাগপুর'—চিত্রপ্রধান ও

বর্ণনামূলক শৈলীতে লেখা হয়েছে। ছোটোনাগপুরের দিগন্তবিস্তৃত পার্বত্যপ্রান্তর পাথরের চাঁই বুকে পড়ে রয়েছে—'পৃথিবীর কঙ্কালের মতো', 'এক একটা মুণ্ডের মতো'; শুকনো লম্বা ঘাসগুলো 'পাকা চুলের মতো'। নিসর্গদৃশ্যের মধ্যে আত্মচৈতন্যের আরোপ রবীন্দ্ররচনাশৈলীর অন্যতম সাধারণ স্বভাব এবং 'বিচিত্র প্রবন্ধ' ও 'লিপিকা'র সর্বত্র তা কমবেশি দেখা যাবে। এই ষষ্ঠ স্বরূপলক্ষণটি 'ছোটোনাগপুরে' বিশেষভাবে রয়েছে। তাই দেখা যাচ্ছে একটা ভাঙ্গা কুটীরের দেয়াল 'নিজের ছায়ার দিকে' তাকিয়ে আছে; 'ছায়াহীন সুদীর্ঘ পথ রৌদ্রে শুইয়া আছে'; বিস্তীর্ণ বালুকাশয্যায় শীর্ণা নদীটি গা এলিয়ে দিয়েছে। এরকম চিত্রকল্প রবীন্দ্রগদ্যশৈলীর সাধারণ সম্পদ।

॥ লিপিকা ॥

ক। এই তো পায়ে চলার পথ।।

এসেছে বনের মধ্যে দিয়ে মাঠে,। মাঠের মধ্যে দিয়ে নদীর ধারে,। খেয়া-ঘাটের পাশে বটগাছ-তলায়;। তার পরে ও-পারের ভাঙ্গা ঘাট থেকে। বেঁকে চলে গেছে গ্রামের মধ্যে।। তার পরে: তিসির খেতের ধার দিয়ে,। আমবাগানের ছায়া দিয়ে,। পদ্মদিঘির পাড় দিয়ে,। কোন্ গাঁয়ে গিয়ে। পৌঁছেচে জানিনে।। * ('পায়ে-চলার-পথ')। ঠিক 'বিচিত্র প্রবন্ধের' অনুরূপ শৈলী এখানেও, তবে ছন্দস্পন্দ আরো সুন্দর, আরো সার্থক, আরো স্পষ্ট। একটি ছোট সরল বাক্যের পরই বহু-পবযুক্ত তরঙ্গায়িত একটি অনাড়ম্বর দীর্ঘ যৌগিক বাক্য এখানেও. এবং কোথাও দুটি পর্বের মধ্যে 'মধ্যে দিয়ে', কোথাও শুধু 'দিয়ে', এই অধিকরণমূলক তৃতীয়া বিভক্তিটিকে ধ্রুবপদরূপে রেখে ছন্দের ধ্বনি তোলা হয়েছে।

খ। এখানে নামল সন্ধ্যা।।

সূর্যদেব, কোন দেশে,। কোন্ সমুদ্রপারে। তোমার প্রভাত হল।। *

অন্ধকারে এখানে | কেঁপে উঠছে রজনীগন্ধা,
বাসরঘরের দ্বারের কাছে | অবগুণ্ঠিতা নববধূর মতো ;
কোন্‌খানে ফুটল | ভোরবেলাকার কনকচাঁপা। | *
জাগল কে। নিবিয়ে দিল | সন্ধ্যায়-জ্বালানো দীপ,
ফেলে দিল রাত্রে গাঁথা | সেঁউতিফুলের মালা। | *

[সন্ধ্যা ও প্রভাত]

স্তবকসজ্জা গ্রন্থকারের। এ কথিকাটির ছন্দ এত অপূর্ব যে একে কবিতা না বলে উপায় নেই, কেননা এখানে পর্বগুলিতে মাত্রাসম্মিতি পর্যন্ত রয়েছে। অধিকাংশ পর্ব আটমাত্রার ; চতুর্থ ও পঞ্চম চরণে কেবল ছন্দোলিপি করা যায় না। দ্বিতীয়ত, জিজ্ঞাসার যে ভাবটি এখানে রয়েছে সেটি 'লিপিকা'র গদ্যশৈলীর একটি বিশেষ লক্ষণ। নীচের দৃষ্টান্তটিতেও এই জিজ্ঞাসার ভাবভঙ্গিটি রয়েছে।

গ। বনের ছায়াতে | যে পথটি ছিল | সে আজ ঘাসে | ঢাকা।
সেই নির্জনে | হঠাৎ পিছন থেকে | কে বলে উঠল, |
'আমাকে চিনতে | পারো না ?'
আমি ফিরে তার | মুখের দিকে তাকালেম | বললেম,
'মনে পড়ছে | কিন্তু ঠিক নাম | করতে পারছিনে।'
সে বললে, 'আমি | তোমার সেই | অনেক কালের, |
সেই পঁচিশ বছর | বয়সের শোক।' [প্রথম শোক]

এখানেও পর্বগুলি অধিকাংশ চরণেই ছমাত্রার, দু-একক্ষেত্রে দু-একমাত্রা কমবেশি আছে। অধিকাংশ পর্বে 'এ' ধ্বনি থাকার দরুন ছন্দস্পন্দ সৃষ্টিতে সুবিধা হয়েছে।

ঘ। আমি তার | সতেরো বছরের | জানা।
কত আসা যাওয়া | কত দেখাদেখি | কত বলাবলি ;
তারই আশেপাশে | কত স্বপ্ন | কত অনুমান | কত ইশারা ; |
তারই সঙ্গে সঙ্গে | কখনো বা | ভোরের ভাঙ্গাঘুমে |
শুকতারার আলো | কখনো বা | আষাঢ়ের ভরসন্ধ্যায়

. চামেলিফুলের গন্ধ, | কখনো বা | বসন্তের শেষপ্রহরে
ক্লান্ত নহবতের | পিলু-বাঁরোয়া ; |
সতেরো বছর ধরে | এই সব গাঁথা পড়েছিল | তার মনে।
[সতেরো বছর]

লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে এখানে তরঙ্গসঙ্গতি কি আশ্চর্য কৌশলে রচনা করা হয়েছে। প্রথম চরণে চারমাত্রা থেকে ছমাত্রায় উঠে দুমাত্রায় ধ্বনিপ্রবাহ নেমে এল। দ্বিতীয় চরণে তিনটি পর্বেই ছমাত্রার সমতা প্রায় রক্ষিত হয়েছে ; তৃতীয় থেকে ষষ্ঠ পর্যন্ত প্রতি চরণের মাঝের পর্বটি চারমাত্রার—প্রথম পর্ব থেকে দ্বিতীয়তে ধ্বনি-তরঙ্গ নেমে এসে তৃতীয় পর্বে আবার উঠে গেছে। দ্বিতীয়ত, 'কত' শব্দটিকে পর্বের মধ্যে ধ্রুবপদরূপে রেখে ছন্দটি আরো সুন্দর করা হয়েছে।

ঙ। এক যে ছিল পাখি। | সে ছিল মূর্খ। | * সে গান গাহিত | শাস্ত্র পড়িত না | * লাফাইত, উড়িত | জানিত না কায়দাকানুন কাকে বলে। | * রাজা বলিলেন | এমন পাখি তো কাজে লাগে না। | * [তোতাকাহিনী]

এখানে 'ত' ধ্বনিটি ছন্দসৃষ্টি করেছে। কিন্তু ছন্দের চেয়েও এখানে লক্ষণীয় হোল রূপকথার বাগ্‌ভঙ্গিমার প্রয়োগ। 'লিপিকা' কথিকা-সাহিত্য এবং রূপকথার বিশিষ্ট বাগ্‌ধারা এখানে কোথাও কোথাও ব্যবহার করা হয়েছে। রূপকথার বাগ্‌ধারা বা গল্পবলার ভঙ্গি 'লিপিকা'র গদ্যশৈলীর একটি বৈশিষ্ট্য।

॥ প্রাচীন সাহিত্য ॥

'প্রাচীন সাহিত্যে'র গদ্যশৈলী 'বিচিত্র-প্রবন্ধ' এবং 'লিপিকা'র মতো ছন্দস্পন্দিত, অথচ নিরলঙ্কৃত নয়। 'বিচিত্র প্রবন্ধ' ও 'লিপিকা'র ভাষাশৈলীতে আলঙ্কারিকতার চেয়ে ব্যঞ্জনা বেশি। গদ্যছন্দ এবং নিবিড় অনুভূতি ও সুগভীর ব্যঞ্জনা উভয় গ্রন্থের প্রধানতম শৈলী।

'প্রাচীন সাহিত্যে'র শৈলী তেমন নিগূঢ় ও ব্যঞ্জনাপ্রধান নয়। তাছাড়া এর বিষয় ভারতের ক্লাসিক সাহিত্য, বিশেষত কালিদাস এর অবলম্বন; স্বভাবত কালিদাসের শৈলীর দ্বারা রবীন্দ্রনাথ এখানে আচ্ছন্ন। কালিদাসের কাব্যের আলোচনায় কালিদাস-বিমুগ্ধ রবীন্দ্রনাথ কালিদাসের মতো বর্ণ-বিলাস ও শব্দসম্ভোগ দিয়েই তাঁর সমালোচনা-শিল্প রচনা করেছেন। 'প্রাচীন সাহিত্যে'র শৈলী সাড়ম্বর ও সানুপ্রাসিক। দীর্ঘ সমাসবদ্ধ পদ, কালিদাস ও ভবভূতি প্রভৃতি ক্লাসিক কবিগণের কাব্যের নানা চূর্ণ-বিচূর্ণ পংক্তির মিশ্রণ, এক একটি শব্দে প্রাচীন ভারতের রোমান্টিক প্রেম ও সৌন্দর্যের এক একটি চিত্রকল্প এবং বহুবর্ণরঞ্জিত অতীতচারী ও অভিসারী কল্পচিত্রের প্রাধান্য 'প্রাচীন সাহিত্যে'র গদ্যশৈলীর স্বরূপলক্ষণ। কালিদাসের কাব্যশৈলীর চিত্রধর্মিতা ও উপমাসৌন্দর্য 'প্রাচীন-সাহিত্যে'র 'মেঘদূত', 'কুমারসম্ভব', 'কাদম্বরী' প্রভৃতি রচনায় অনুরূপ ঐশ্বর্য রচনা করেছে। 'প্রাচীন সাহিত্যে' রবীন্দ্রনাথ 'কল্পনা' কাব্যের অনুরূপ প্রাচীন ভারতীয় সৌন্দর্যলোকে প্রয়াণ করেছেন এবং স্বতঃই এখানে রোমান্টিক সৌন্দর্যচিত্ররচনা তাঁর শৈলী হয়েছে। 'প্রাচীন সাহিত্যে'র গদ্যশৈলী কত রোমান্টিক, কত কল্পনাপ্রবণ, কত রূপমুগ্ধ, তারই দৃষ্টান্ত নীচের কটি উদ্ধৃতি ঃ

ক। অকালবসন্তের রক্তবর্ণ অশোককুঞ্জে মদনমথনের দীপ্ত দেবরোষাগ্নিচ্ছটায় নতমুখী লজ্জারুণা গিরিরাজকন্যা তাঁহার সমস্ত ব্যর্থ পুষ্পাভরণ বহিয়া পাঠকের ব্যথিত হৃদয়ের করুণ রক্তপদ্মের উপর আসিয়া দাঁড়াইতেন—অকৃতার্থ প্রেমের বেদনা তাঁহাকে চিরকালের জন্য ঘেরিয়া থাকিত। [কুমারসম্ভব ও শকুন্তলা]

খ। নাটকের আরম্ভেই শান্তিসৌন্দর্যসংবলিত এমন একটি সম্পূর্ণ জীবন নিভৃত পুষ্পপল্লবের মাঝখানে প্রাত্যহিক আশ্রমধর্ম, অতিথিসেবা, সখীস্নেহ ও বিশ্ববাৎসল্য লইয়া আমাদের সম্মুখে দেখা দিল। [শকুন্তলা]

গ। সলজ্জ নবপ্রেমে আমোদিত বিকাশোন্মুখ হৃদয়মুকুলটি

লইয়া স্বামীর সহিত যখন প্রথমতম মধুরতম পরিচয়ের আরম্ভসময় সেই মুহূর্তে লক্ষ্মণ সীতাদেবীর রক্তচরণক্ষেপের প্রতি নতদৃষ্টি রাখিয়া বনে গমন করিলেন; যখন ফিরিলেন তখন নববধূর সুচির প্রণয়ালোকবঞ্চিত হৃদয়ে আর কি সেই নবীনতা ছিল! [কাব্যের উপেক্ষিতা]

'কাদম্বরীচিত্র' থেকে উদ্ধৃতি দিলাম না, কারণ ওখানে বানভট্টের উপন্যাসের বর্ণনাচ্ছটার দৃষ্টান্ত দিতে গিয়ে অনেকটা তিনি অনুবাদ করে দেখিয়েছেন। কিন্তু যে তিনটি দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত করা হয়েছে তার থেকে 'প্রাচীন সাহিত্যে'র গদ্যশৈলীর চেহারাটি বুঝতে অসুবিধা হবে না। প্রথমত, এর বাক্যগুলি জটিল, কিন্তু পর্ব-বহুত্ব নেই বলে ছন্দস্পন্দ নেই। দীর্ঘ জটিল বাক্যগুলির মধ্যে যতির অভাব; পর্ব ও পদ ভাগ নেই; ফলে—ধ্বনিপ্রবাহে কোন রূপ তরঙ্গ বা ভাবাবেগের তাল লয় থাকছে না। তৃতীয়ত, ভাষা অত্যন্ত সংস্কৃতঘেঁষা এবং শব্দৈশ্বর্যময়; সমাসবহুল বড় বড় শব্দ মূল কবির অনুসরণে এখানেও দৃশ্য রচনা করেছে, এই কথাচিত্র রচনা বা কথা দিয়ে ছবি আঁকা, এর শৈলীর চতুর্থ লক্ষণ।

'প্রাচীন সাহিত্যে'র গদ্যশৈলী বর্ণনামূলক এবং চিত্রধর্মী। ক্লাসিক সাহিত্যের আলোচনা বলে, এখানে রবীন্দ্রনাথের গদ্যশৈলীও ধ্রুপদী রীতি অনুসরণ করেছে। 'প্রাচীন সাহিত্যে'র নিবন্ধগুলি গ্রন্থ-সমালোচনা নয়, মৌলিক রচনা। ভাব যেমন, ভাষাও তেমনি সম্ভ্রান্ত। রাজসিক ভাবের সঙ্গে রাজ্ঞীর মতো ভাষার মিলনে 'প্রাচীন সাহিত্যে'র শৈলী রবীন্দ্রনাথের সমালোচনা-শিল্পে শ্রেষ্ঠ স্থান লাভ করেছে।

॥ পঞ্চভূত ॥

"পঞ্চভূত" রবীন্দ্রনাথের একখানি .অসাধারণ গদ্য-গ্রন্থ। আর কোথাও ঠিক এজাতীয় গ্রন্থ আর একখানি আছে বলে জানি না। এর বিষয়টা সাহিত্য ও শিল্পতত্ত্ব। সৌন্দর্য, কাব্যের তাৎপর্য, গদ্য ও পদ্য, প্রাঞ্জলতা, অখণ্ডতা, হাস্যরস প্রভৃতি শিল্পতত্ত্ব এবং তদ্‌সন্নিহিত নর ও নারীর স্বভাব ও মনের রস ও রহস্য নিয়ে এ গ্রন্থখানি—বিশ্বসাহিত্যে অনন্যসাধারণ। 'পঞ্চভূতে'র এই অনন্যতা বিষয়গত নয়, সম্পূর্ণতই তা শৈলীগত। 'পঞ্চভূতে' সৌন্দর্য ও শিল্পতত্ত্বের যে আলোচনা আছে তা এমন কিছু অভিনব ও বিস্ময়কর নয়,—এমন কি 'সাহিত্য', 'সাহিত্যের স্বরূপ' ও 'সাহিত্যের পথে' গ্রন্থত্রয়ীতে রবীন্দ্রনাথই ইতিপূর্বে সাহিত্যতত্ত্বের যে আলোচনা করেছেন, 'পঞ্চভূতে'র আলোচনা তার থেকে মতামত ও ভাবধারণার দিক দিয়ে স্বতন্ত্র ও নূতন কিছু নয়। তথাপি 'পঞ্চভূত' যে রবীন্দ্রনাথের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সুখপাঠ্য রমণীয় গদ্যগ্রন্থ, তার কারণ এর অনন্যপূর্ব রচনাশৈলী।

বিশ্বজীবন ও বিশ্বপ্রকৃতি যে পাঁচটি মৌলিক উপাদান নিয়ে নির্মিত সেই ক্ষিতি, অপ্, মরু, তেজ ও ব্যোম-কে পাঁচটি শরীরী চরিত্র দিয়ে কথাসাহিত্যের ঢঙে এই গ্রন্থের নিবন্ধগুলি রচিত হয়েছে। ছোটো-গল্পের ঢঙে প্রবন্ধ রচনার শৈলী অবশ্য অদৃষ্টপূর্ব বা অভিনব নয়। কিন্তু বিশ্বসৃষ্টির মূলীভূত পঞ্চ-উপাদানকে পাঁচটি অনবদ্য চরিত্র দিয়ে, শিল্পসৃষ্টির ক্ষেত্রে যাবতীয় বিতর্কমূলক প্রশ্নের নানাদিক চুলচেরা বিচার করে, রবীন্দ্রনাথ যে আশ্চর্য কৌশলে নিজের অভিমতগুলি সুপ্রতিষ্ঠিত করেছেন, তার চমৎকারিত্বে মুগ্ধ না হয়ে পারা যায় না। পাঁচটি উপাদানের মধ্যে অপ্ ও তেজ-কে তিনি নারীচরিত্র দিয়েছেন এবং নাম রেখেছেন 'স্রোতস্বিনী' ও 'দীপ্তি'। অপর তিনটি উপাদান পুরুষ-চরিত্র পেয়েছে, নাম পেয়েছে ক্ষিতি, ব্যোম ও সমীর (বায়ু বা মরু)। বিশ্বপ্রকৃতি ও বিশ্বজীবন

যেমন এই পাঁচটি মৌলিক ভৌতিক উপাদানের দ্বারা নির্মিত, তেমনি সাহিত্যশিল্পেরও অনুরূপ পাঁচটি উপাদান আছে—বস্তুতন্ত্র বা ভৌমচেতনা (ক্ষিতি), আধ্যাত্মিক দার্শনিকতা বা ভূমাবোধ (ব্যোম), রোমান্টিকতা (সমীর), প্রেম ও সৌন্দর্যবোধ (স্রোতস্বিনী ও দীপ্তি)। বাস্তবতা বা ভৌমচেতনা, আধ্যাত্মিকতা বা ভূমা ও অসীমতাবোধ, কল্পনাপ্রবণতা বা রোমান্টিকতা, প্রেম ও সৌন্দর্য-চেতনা—এই পাঁচটি ভৌতিক ও দিব্য উপাদানে সাহিত্যজগতের নিসর্গ ও মানবলোক নির্মিত। এই তত্ত্বটিই 'পঞ্চভূতে'র পাঁচটি চরিত্রের রূপক তাৎপর্য। বস্তুত 'পঞ্চভূতে'র রচনাশৈলীর যাবতীয় অভিনবত্ব এই পঞ্চ-চরিত্রের মধ্যেই পরিস্ফুট হয়েছে। তিনটি তরুণ ও দুটি তরুণী—সকলেই আধুনিক বা আধুনিকা, শিক্ষিত বা শিক্ষিতা এবং সমাজ, সংস্কৃতি, ধর্ম, দর্শন, সাহিত্য, শিল্প প্রভৃতি ব্যাপারে বিদগ্ধ, উৎসুক ও রসিক। পাঁচটি চরিত্রের মধ্যে স্বাতন্ত্র্য-ও রয়েছে এবং প্রত্যেকেই স্ব স্ব ভৌতিক স্বভাবের দ্বারা জগৎ ও জীবনকে উপলব্ধি করতে চাইছে। স্রোতস্বিনী নদীর মতোই চঞ্চলা ও চপলা, হাসিখুশিভরা উচ্ছল, নৃত্যগীতময়ী সুন্দরী; দীপ্তি তেজস্বিনী, অতি-আধুনিকা। সমীর স্রোতস্বিনীর অনুগ্রাহী, ভাবপ্রবণ ও রোমান্টিক। ক্ষিতি স্থূল; তার বুদ্ধি বৈজ্ঞানিকের ও বৈষয়িকের—বাস্তব ছাড়া সে অন্য কিছু বোঝে না। ব্যোম রহস্যময়, আধ্যাত্মিক, দার্শনিক ও গুরুগম্ভীর। সংলাপের মধ্য দিয়ে এই পাঁচভূতের চরিত্রগুলি যেমন ফোটানো হয়েছে, তেমনি কৌতুকরসের মধ্য দিয়ে সাহিত্যের নানা বিষয়ের আলোচনা প্রবন্ধের কাজ করে দিয়েছে।

'পঞ্চভূতে'র গদ্যশৈলীর প্রথম বৈশিষ্ট্য বিশেষ একটি রীতির বদলে মিশ্ররীতির ব্যবহার। সংলাপ আছে, কিন্তু কথ্য নয়। শিল্পী সাহিত্যের গুরুগম্ভীর তত্ত্বগুলিকে হালকাভাবে পরিহাস ও কৌতুকরস দিয়ে জারিয়ে পরিবেশন করতে চেয়েছেন। সাধুশৈলীর সংলাপ এই কৌতুকরসের অনুকূল হয়েছে। 'পঞ্চভূতে' ক্ষিতি ও ব্যোমের

তর্কবিতর্কে শিল্পতত্ত্বের অনেক বিষয়েই যুক্তিপূর্ণ জ্ঞানালোচনা আছে, কিন্তু সর্বোপরি আছে স্রোতস্বিনী ও দীপ্তির কলকণ্ঠে হাসির ফোয়ারা। এই দুই উচ্ছল তরুণীর প্রগল্‌ভতা এবং অকারণ ও অবারণ আনন্দের প্রস্রবণই এর স্থায়ী রস। রবীন্দ্রনাথ যেন বলতে চেয়েছেন, যুক্তি-বুদ্ধি-বাস্তব-দর্শন-তত্ত্বাদি নিয়ে যত গবেষণাই করা যাক না, সবই অর্থহীন, সবই ভাসাভাসা;—শাশ্বত সত্য কেবল ঐ স্রোতস্বিনী ও দীপ্তির সৌন্দর্য ও আনন্দ। এর কোন কারণ নেই, উদ্দেশ্য নেই। কেন ঐ মেয়ে দুটি হেসে গড়িয়ে পড়ে, কেঁদে ভাসিয়ে দেয়, সে রহস্যের সমাধান হাজার তর্কেও হবে না। সাহিত্য-শিল্পও স্রোতস্বিনী ও দীপ্তির মতো—ব্যোম, সমীর ও ক্ষিতিকে তাদের সঙ্গী না হোলে নয়, কেন না ঐ পুরুষ বন্ধু তিনটি ছাড়া তাদের আনন্দের প্রস্রবণ বার করবে কারা? আবার পুরুষ তিন জনের যে এত তত্ত্বালোচনা, সেও ঐ নারী দুটির মুখ চেয়ে,—ঐ আনন্দ ও সৌন্দর্যের জন্য। ম্যাটেরিয়ালিজম, রিয়ালিজম, আধ্যাত্মিকতা, রোমান্টিসিজম ইত্যাদি সবই চাই, কিন্তু সে ঐ স্রোতস্বিনী ও দীপ্তির জন্য—আনন্দ ও সৌন্দর্যের জন্য—শিল্পের জন্য। এইটি হোল 'পঞ্চভূতে'র ভাব-শৈলী। এটিকে যে আঙ্গিকে রূপ দেওয়া হয়েছে তার শিল্পত্বের তুলনা নেই। এক একটি গল্পের আকারে পরস্পর সংলাপের মধ্য দিয়ে এই যে নিবন্ধ রচনা, এর স্টাইলের প্রশংসা করে শেষ করা যায় না। 'পঞ্চভূতে'র শৈলী 'প্রাচীন সাহিত্য' বা 'লিপিকা'র বিপরীত। এর গদ্য ভাবাত্মক নয়। এর শৈলী মননাত্মক; তবে অভিনবত্ব হোল, মননমূলক (Argumentative) ও নাটকীয় (Dramatic) শৈলীর মধ্যে নিরবচ্ছিন্নভাবে কৌতুকরসের সঞ্চার। ভাষা সাধু, কিন্তু মননমূলক বলে নিরলঙ্কার, বিশেষণহীন এবং ছন্দস্পন্দরহিত। বিতর্কমূলক আলোচনা বলে, ভাষা কখনো ভাবমার্গে ওঠেনি, তূরীয় না হয়ে সর্বদা জ্ঞানমার্গে ভূমিসংলগ্ন থেকেছে। চিত্রকল্প, রূপকল্প, কথাচিত্র বা উপমাদি প্রায় নেই, বাক্যগুলি সালঙ্কারা ও সানুপ্রাসিক যেমন নয়, শব্দগুলিও তেমনি ব্যঞ্জনাহীন, প্রত্যক্ষ ও অভিধার্থমূলক।

তথাপি বাগ্‌বৈদগ্ধ্য (wit) এবং পাঁচটি চরিত্রের বাচন ও আচরণের নাটকীয় ভাবভঙ্গি এবং কৌতুকপ্রদ ও বুদ্ধিদীপ্ত সংলাপের জন্য 'পঞ্চভূতে'র শৈলী রবীন্দ্র-গদ্য-শিল্পে একটি অনন্য মর্যাদা নিয়ে বিরাজ করছে।

॥ ফলশ্রুতি ॥

আচার্য বামন বলেছেন, 'গদ্যং কবীনাং নিকষং বদন্তি',—'গদ্য কবিদের কষ্টিপাথর।' কেন? কারণ,—পদ্যের চেয়ে গদ্য রচনা অধিকতর শিল্প-নৈপুণ্যের অপেক্ষা রাখে। "Prose……is more difficult to study critically than poetry, because the techniques are less definable and the concentration less intense." মারজোরি বোল্টনের এ উক্তির আসল অর্থ, গদ্য পাঠ-মাত্র নয়, গদ্য রচনাও পদ্য অপেক্ষা শক্ত। গদ্য দেখতে সহজ, কেননা বাইরে থেকে পদ্যের মতো তার একটা নির্দিষ্ট আকৃতি (form) থাকে না। এর দরুনই, 'it usually takes us some time to realize that there are different prose styles.' [Prof. M. Boulton]

রবীন্দ্রনাথের গদ্য-শৈলী আংশিকভাবে এ গ্রন্থে আলোচিত হয়েছে। প্রবন্ধ রচনায় তার গদ্য-শৈলী তেমন সার্থক হয় নি এবং কেন হয়নি তা যথাস্থানে আলোচনা করা হয়েছে। কিন্তু সমালোচনা শিল্পে এবং রচনা শিল্পে রবীন্দ্রনাথের গদ্য-শৈলী অপূর্ব, অনবদ্য এবং অতুলনীয়। ভাবাত্মক (Emotive) গদ্য-শৈলীতে তিনি সার্থক। সর্বোপরি তিনি কবি। তাঁর গদ্য তাই স্থানে স্থানে কাব্য হয়েছে। গদ্যের ওজোগুণ এর দ্বারা কিছু হ্রাস পেয়ে থাকলেও মাধুর্যগুণ বেড়েছে। গদ্য মানুষের মুখের ভাষা বলে সর্বদা ব্যবহারের দ্বারা এর শব্দগুলির অর্থ জীর্ণ, রুগ্ন ও তাৎপর্য-শক্তিহীন হয়ে যায়। এই আটপৌরে ভাষাকে শিল্পোত্তীর্ণ করতে হোলে এর পদবিন্যাসে, পর্ব-সজ্জায়, ছন্দ

স্পন্দনে এবং শব্দের মধ্যে অভিনব অর্থ ও ব্যঞ্জনা সঞ্চারের দুরূহ প্রতিভা প্রয়োজন। রবীন্দ্রনাথের প্রতিভা গদ্য-রচনায় কবিতার চেয়ে কিছুমাত্র কম পারদর্শিতা ও সৃজনশীলতা প্রদর্শন করে নি। তাঁর হাতে বাংলা গদ্য শিল্প হয়ে উঠেছে। গদ্য যদি কবিদের কষ্টিপাথর হয়, তাহলে তিনি ভারতের চিরকালের সর্বশ্রেষ্ঠ গদ্য-শিল্পী।